বঙ্কিম মানস

এম-এ, ডি-ফিল (কলিকাতা)

ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড

২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
ইণ্ডিয়ানা লিমিটেডের পক্ষে
নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত
২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৫৮ জুলাই, ১৯৫১ ;
দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন, ১৯৫৫ ; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

মুদ্রাকর :
শ্রীহেমন্তকুমার পোদ্দার
পোদ্দার প্রিণ্টার্স
৯এ, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

পাঁচ টাকা

নতুন সমাজ ও
সংস্কৃতি নির্মাণের
কাজে নিয়োজিত
কর্মীবন্ধুদের
করকমলে—

অরবিন্দ পোদ্দারের অন্যান্য গ্রন্থ

শিল্পদৃষ্টি

মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক

সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বঙ্কিম-মানস' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করিয়া যে তর্কবিতর্ক ও কলরব চলিয়া আসিতেছে, তাহার জন্য যে কোন গ্রন্থকারই গর্ব অনুভব করিতে পারেন। যাঁহারা ইহার দৃষ্টিভঙ্গী অনুমোদন করিতে পারিয়াছেন, তেমন অসংখ্য সাহিত্যরসিক, সমাজ-ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিত, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক কর্মী, শুভার্থী বন্ধু অথবা গুণগ্রাহী বান্ধব ব্যক্তিগত আলোচনায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পত্রযোগে তাঁহাদের অভিনন্দন পাঠাইয়াছেন। যাঁহারা ইহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই তাঁহারা প্রাচীনপন্থী অথবা নবীনপন্থী যাহাই হোন, তাঁহাদের সাহিত্য-আড্ডায়ও বারবার এই গ্রন্থের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে এবং হয়,—এই ঘটনাই সম্ভবত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়ের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক। যাহাই হোক, বঙ্কিম-মানস যাঁহাদের কলরবের বিষয়বস্তু হইতে পারিয়াছে, তাঁহাদের সকলকে এ সুযোগে ধন্যবাদ জানাই।

গত ক'বছরের মধ্যে অনেকেই সম্পূর্ণ নূতন মন ও চোখ লইয়া উনবিংশ শতাব্দী তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পানে তাকাইতে অভ্যস্ত হইতেছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কারণ, দৃষ্টিভঙ্গীর এই রূপান্তর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষত, আমাদের দেশে যেখানে মনের ও জিজ্ঞাসার পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; যেখানে সমাজপ্রবাহের বোধ আমাদের কর্ম, চিন্তা ও সাহিত্য-বোধকে পরিচালিত করে না; এবং যেখানে এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পার হয়েও প্রখ্যাত অধ্যপকবৃন্দ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না সাহিত্যের সঙ্গে সমাজপ্রবাহের কি সম্পর্ক। এমনি এক মানসিক পরিবেশে সমাজপ্রবাহের চেতনার উন্মেষ এবং ইতিহাসের বোধ জাগ্রত হওয়া অত্যন্ত আনন্দের কথা।

ইতিহাসের বোধ যাহার নাই, সাহিত্যের বোধও তাহার কাঁচা। লক্ষ্য করিতেছি, এ কথাও ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া অনেক গবেষক বাংলার সমাজ-ইতিহাসের গতিধারা নির্ধারণ করিয়া বিশেষ কালের বাংলা সাহিত্যকে উপলব্ধি করার কার্যে ব্রতী হইয়াছে।

আশা করা যায়, বাংলা সাহিত্যের সত্যিকার ইতিহাসও একদিন না একদিন লিখিত হইবে।

কোনরকম অতিশয়োক্তি না করিয়া এবং কোনপ্রকার আত্মাভিমানের বশবর্তী না হইয়া সম্ভবত একথা বলা যায় যে, 'বঙ্কিম-মানস' এই চেতনার উদ্বোধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে; আর তাহা যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলেও একথা স্বীকার করা যায় যে, গ্রন্থকার তাহার প্রাপ্য মর্যাদা লাভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত হইয়াছে। শুধুমাত্র এই অর্থে যে, কোন কোন স্থানে দুই একটি লাইন অথবা দুই একটি শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, লেখকের বক্তব্যকে অধিকতর স্পষ্ট ও পরিস্ফুট করার জন্য। মূল যুক্তি বিন্যাসের কাঠামো বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় নাই, পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া। কোথাও কোথাও এই গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনা যাহা হইয়াছে, তাহা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু আমার দৃষ্টিমার্গ পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন অনুভব করি নাই। কোনরূপ পরিবর্তন না করার আরও একটি গৌণ কারণ এই যে, ইহা 'থিসিস' রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং যে রূপে ইহা স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে, সেরূপ অবিকৃত রাখাই বাঞ্ছনীয়)

প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ-প্রমাদ এবার অনেকটা সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি, নির্ভুল করা বোধ হয় সম্ভব হয় নাই। সেজন্য সহৃদয় পাঠকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

কলিকাতা
১লা জুন, ১৯৫৫

অরবিন্দ পোদ্দার

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীমান্ অরবিন্দ পোদ্দারের 'বঙ্কিম-মানস' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ইহা যখন গবেষণা-নিবন্ধরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উপস্থাপিত করা হয়, তখন অন্যতম পরীক্ষক হিসাবে ইহা পড়িবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। তখনই নিবন্ধটির মৌলিক, বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও যুক্তিশৃঙ্খলার পারিপাট্যে আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। এরূপ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ যে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

লেখক এই গ্রন্থে মার্কসীয় সমালোচনা-রীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ করিয়া বাংলা সমালোচনা ক্ষেত্রে এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করিয়াছেন। সমসাময়িক সমাজ-প্রতিবেশের প্রভাব ও সাহিত্যিকের মানস ভঙ্গিমার বিশ্লেষণ ও ইহাদের উপর প্রাধান্য আরোপ এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস রচনা করেন তখন শিল্পীর সৌন্দর্য-সৃষ্টিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। এই সৌন্দর্য-সৃষ্টি, ঘটনা-সন্নিবেশ ও যাহা ঘটিয়াছে তাহার তাৎপর্য-বিশ্লেষণের পিছনে যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লেখকের নিগূঢ় ভাবাভিপ্রায় কতক সচেতন কতক বা প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে এই বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের প্রেরণাটী শ্রীমান্ পোদ্দারের গ্রন্থে দীপ্ত মনীষার সহিত আলোচিত হইয়াছে। লেখক যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন, যেরূপভাবে ঘটনার পরিণতি প্রদর্শন করেন তাহা তথ্যগতভাবে হয়ত বাস্তব ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়াও লেখকের মনোগত নিগূঢ় অভিপ্রায়, সমকালীন সমাজ প্রভাবে গঠিত তাঁহার জীবনাদর্শ তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে, কল্পনার স্বাচ্ছন্দ্যলীলার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। অতীত সংঘটনকে আশ্রয় করিয়া অতি-সজীব বর্তমানই আপনার দাবী জানায়। জগৎসিংহ-ওসমান্ মানসিং-কতলু খাঁর দ্বন্দ্ব বঙ্কিম-যুগের সমাজ-চিত্রপটে প্রতিবিম্বিত হইয়া এক নূতন তাৎপর্যমণ্ডিত হয় ও এক বলিষ্ঠ, ক্ষাত্রধর্মভূয়িষ্ঠ সমাজ-চেতনার উদ্বোধনের উপায় স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। লোকচিত্তের উপরিভাগ যখন কুহেলিকামণ্ডিত,

অর্ধ-বিস্মৃত অতীতের মধ্যে স্বপ্ন সঞ্চরণ করে, যখন কালপ্রবাহে অবলুপ্ত ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চে অতীতের নায়ক-নায়িকার পুনরাবির্ভাব ঘটায়, তখন তাহার গভীরতর স্তরে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অলক্ষিত প্রভাবই এই পুনরুজ্জীবনের প্রেরণা যোগায় ও লেখকের বিশেষ আদর্শই এই সমস্ত মৃত-রাজ্য হইতে পুনরামন্ত্রিত নর-নারীর শুষ্ক কঙ্কালে প্রাণসঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতায় বর্তমানের মুখর কর্মচাপল্যের মধ্যে অতীতের গোপনচারী প্রভাবের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু যে অতীতের সাহিত্যে পুনর্জন্ম হয়, তাহার সম্বন্ধে বিপরীতটাও সত্য। বর্তমান অতীতে অনুপ্রবেশ করিয়া ইহার মূল প্রকৃতি অবিকৃত রাখিয়াও ইহার মধ্যে নূতন রং ও সুর সংযোজন করে, ইহার ঘটনাস্রোতকে এক নূতন আদর্শের লক্ষ্যাভিমুখী করে, ও ইহার জীবনের তাৎপর্যকে এক নূতন অর্থে উদ্ভাসিত করিয়া দেখায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সংঘটনের মধ্যে এই বর্তমান প্রভাবের আরও সুপরিস্ফুট হইবার বেশী সুযোগ ও সম্ভাবনা।

অবশ্য এই সমালোচনা-রীতির চমকপ্রদ মৌলিকতার মধ্যে কিছুটা বিপদের বীজ নিহিত আছে। লেখকের শিল্পসৃষ্টিকে একটি বিশেষ ভাব-প্রভাবিত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখার অভ্যাস করিলে হয়ত একটা তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। বিশেষতঃ কবি-মনের রহস্যোদ্ভেদ অতি দুরবগাহ ব্যাপার—যে সাধারণ মানসিক প্রক্রিয়ার সহিত আমরা পরিচিত তাহার মানদণ্ডে ইহার বিচার চলে না। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—'খুঁজো না আমায় আমার গানে ও গীতে'। সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে সমকালীন ঘটনা ও স্রষ্টার বিশেষ চিত্তপ্রবণতার প্রভাব অনস্বীকার্য, কিন্তু বিশ্লেষণ সাহায্যে তাহাদিগকে খুঁজিতে গেলে তাহারা ধরা দেয় না। ব্রাউনিং-এর ভাষায় বহির্জগৎ হইতে তিনটী শব্দ মিলিয়া যাহা সৃষ্ট হয় তাহা চতুর্থ শব্দ নহে, তারকা দীপ্তি। কবি-মনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাহির হইতে আহরিত উপাদানসমূহ ও স্রষ্টার বিশেষ মানস প্রবণতা উভয়ে মিলিয়া এক নূতন রহস্যময় সত্তার উদ্ভব হয়। ঘটনাপুঞ্জের বাস্তব স্থূলতা নয়, ইহার নিগূঢ় দীপ্তি-বিচ্ছুরণ, লেখকের মতবাদের সুনির্দিষ্টতা নয় ইহার সাঙ্কেতিক আভা—প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর আকাশের অবর্ণনীয় বর্ণসুষমার ন্যায়—সৃষ্ট সাহিত্যের উপর পরিব্যাপ্ত হয়। আমরা যদি রচনার বস্তুগত উপাদানের উপর বেশী জোর দিই, তবে যে সামঞ্জস্য সাহিত্যের প্রাণ তাহা বিচলিত হইবার আশঙ্কা আছে। লেখকের অন্তর-

চেতনাকে যদি আমরা সাহিত্য রূপায়ণের মধ্যে দৃঢ়মুষ্টিতে আঁকড়িয়া ধরিতে চাই, তবে উহা তরল পারদরেণুর মত আমাদের হাতের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। বাস্তবের ও কবিমনের ছায়া সাহিত্যে আছে বলিয়াই যদি আমরা উহাদের কায়াকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করি, তবে ময়দানব।নর্মিত •স্ফটিক সভাগৃহে দুর্যোধনের যেরূপ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছিল, আমদেরও সেইরূপ ঘটিতে পারে। বাস্তবের সূক্ষ্ম তন্তু ও কবিমনের বয়নশিল্পের যুগপৎ সহযোগিতায় কাব্যের মায়া-পরিচ্ছদ তৈয়ারী হয় ইহা সত্য, কিন্তু কবি-কল্পনা শেলীর মেঘের ন্যায় মুহুর্মুহু রূপ পরিবর্তনের দ্বারা, উদ্ভব-বিলয়ের নানা স্তরের মধ্যে দ্রুত সঞ্চরণের অন্তরালে সৃষ্টিরহস্যকে আমাদের নিকট হইতে গোপন রাখে। এ সম্বন্ধে অতি-কৌতূহল অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যর্থতা বরণ করে।)

শ্রীমান্ অরবিন্দের বিচার-পদ্ধতিতে এই বিপদ যে মাঝে মধ্যে দেখা না দিয়াছে তাহা বলা যায় না। নূতন আবিষ্কারের মাদকতা হয়ত সময় সময় তাঁহার তীক্ষ্ণ শাশ্বত সাহিত্যবোধকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিবে। হয়ত অনেক স্থলে বাইরের জগৎ ও উপন্যাসের সৃষ্টির মধ্যে সম্বন্ধের অন্তরঙ্গতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই—বাহির কেবল সুদূর নির্লিপ্ত দিগ্‌বলয় রেখার মত উপন্যাসের চারিদিকে একটি শিথিল বেষ্টনী রচনা করিয়াছে মাত্র। তথাপি এই ধরণের আলোচনার যে বিশেষ সার্থকতা আছে, ইহাতে কবি-মনকে বুঝিতে ও ইহার সৃষ্টির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে যে নূতন আলোকপাত হইয়াছে তাহা সর্বথা স্বীকার্য। শ্রীমান্ অরবিন্দ গতানুগতিক আলোচনা ধারার অনুবর্তন না করিয়া যে সম্পূর্ণ নূতন দিক হইতে বঙ্কিম-প্রতিভার স্বরূপ নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন তাহাতে অনেক অভিনব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ও যুগের প্রয়োজন ও বঙ্কিমের অন্তর-প্রেরণার সহিত মিলাইয়া আমরা বঙ্কিম-সাহিত্যের নূতন পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়াছি। সুতরাং এই প্রচেষ্টা যে সত্যই অভিনন্দনযোগ্য তাহা নিঃসন্দেহ। মণিকার হীরকখণ্ডকে নানাদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, ইহার সঞ্চরণশীল আলোকরশ্মির বিচিত্র খেলা নানা দিক হইতে নিরীক্ষণ করিয়া ইহার যথার্থ মূল্য অবধারণ করে। শ্রীমান্ অরবিন্দের হাতে বঙ্কিমসাহিত্যেরও সেইরূপ নূতন মূল্য নির্ণয়ের পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার এখনও বয়সে নবীন ; পরিণত বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার অনুসৃত প্রণালীর অপূর্ণতা ও একপেশেমি সম্বন্ধে আরও সচেতন হইবেন ও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে পূর্ণতর সংশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ করিতে পারিবেন। তাঁহার বর্তমান গ্রন্থে

তিনি যে মৌলিক রীতির প্রবর্তন করিয়াছেন এই দিক দিয়া তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা-ক্ষেত্রে এই নবীন পথিকৃৎকে সাদরে বরণ করিয়া লইতেছি।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আশুতোষ বিল্ডিং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ;
১৬ই জুলাই, ১৯৫১।

লেখকের কথা

সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মের ফাঁকে ফাঁকে বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে অল্পবিস্তর অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সেই অধ্যয়নই ১৯৪৯ সালের প্রথম দু'তিন মাসে 'বঙ্কিম-মানস' রূপে কাগজের পাতায় ফুটিয়া উঠে।

সাহিত্যজিজ্ঞাসায় যাঁহারা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন প্রয়োগ করেন, তাঁহাদের প্রয়োগটা অনেক সময়ই হয় যান্ত্রিক। তাঁহাদের অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের দেহে প্রগতিশীল অথবা প্রতিক্রিয়াশীল লেবেল আঁটিয়া তাঁহাকে বিচার করেন, আসলে দ্বন্দ্বের, বিরোধের ভিতর দিয়া বিবর্তনের রূপটা তাঁহাদের কাছে ধরা পড়ে না। আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে সমকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ, সংস্কৃতি ও সম্পর্কের মধ্যে স্থাপন করিয়া, কি ভাবে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও সনাতন হিন্দু চিন্তাধারার বিরোধের মধ্য দিয়া তাঁহার মন ও শিল্প বিবর্তিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার এ প্রচেষ্টা কতদূর সার্থক হইয়াছে তাহার বিচার করিবেন সুধীসমাজ।

তবে, আমার দৃষ্টিকোণ ও সিদ্ধান্তের সহিত সব সময় একমত হইতে না পারিয়াও আমার থিসিসের অন্যতম পরীক্ষকদ্বয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত যেভাবে আমার রচনার প্রশংসা করিয়াছেন ও আমাকে ডি-ফিল উপাধি দানের সুপারিশ করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আর 'বঙ্কিম-মানসের' ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রতি যে স্নেহ দেখাইয়াছেন, তাহাও আমার কাছে অমূল্য।

তৃতীয় ও অন্যতম পরীক্ষক এবং থিসিসের প্রমোটার ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের নিকট আমার ঋণ অপরিসীম। 'বঙ্কিম-মানসের' পরিকল্পনা হইতে সুরু করিয়া সমাপ্তি পর্যন্ত তিনি নানাভাবে ছিলেন আমার পথপ্রদর্শক। সামান্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রতি আমার ঋণ শোধ করা যাইবে না বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আর এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার পিতৃদেব শ্রীরাধাগোবিন্দ পোদ্দারের কথা, তাঁহার শাসন ও উৎসাহ না পাইলে সম্ভবত কোন কালেই আমার কোন কিছু করা

কাল সেই প্রবাহ ও ভাবতরঙ্গের ক্রমপরিণতি মাত্র। সুতরাং বঙ্কিম-যুগের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্য তাঁহার পূর্বগামী কালের পরিচয় আবশ্যক।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বগামী কালে গভীর এক সামাজিক-বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়। ভারতে বৃটিশ বিজয়ে এই বিক্ষোভের সূত্রপাত, এবং সনাতন ভাবধারা ও নূতন চিন্তাধারার সংঘাতের মধ্যে এই বিক্ষোভের বিকাশ। এই বিক্ষোভের মধ্যে, অলক্ষ্যে, রূপান্তরের কাজ চলিয়াছিল; ভারতে নূতন ব্যক্তি-সত্তা ও সংস্কৃতির আবির্ভাব হইতেছিল। পরবর্তীকালে এই ব্যক্তি-সত্তাই প্রয়োজন ও সুবিধা মত নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং এই সংস্কৃতি ও রূপান্তরধর্মী ব্যক্তি-সত্তার স্বরূপের মধ্যে বঙ্কিম-যুগের বৈশিষ্ট্য নিহিত রহিয়াছে।

দুই

ভারতে বৃটিশ বিজয়ের ফলে ভারতীয় সমাজ কাঠামোয় মৌলিক রূপান্তর সাধিত হয়। এই সমাজ-সঙ্কটের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের তিরোধান এবং নূতন এক যুগের আবির্ভাব হইতেছিল। প্রাচীন সমাজের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজের কর্ষক, ধারক এবং বিধায়ক বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও চিন্তা-মানসেরও তিরোভাব হয়। আর সেই তিরোভাবের অন্তরালে নূতন সামাজিক শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে, যাহারা ভারতে নব সংস্কৃতির পত্তন করে। কিন্তু এইসব নূতন সামাজিক শ্রেণীর ভাবাদর্শ ও মানস প্রকরণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার আগে ইহাদের আবির্ভাব ও জন্মগত বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথম পর্যায়ের বৃটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে সহজেই একটা দ্বৈতরূপ ধরা পড়ে; তাহা একদিকে না-ধর্মী এবং অপর দিকে হাঁ-ধর্মী। ব্যবহারিক রাজনীতি বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহা ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোকে ধ্বংস করিয়াছে, সেই কাঠামো উপযোগী দৃষ্টিকোণকে এবং গ্রামীণ বিচ্ছন্নতাকে বিনষ্ট করিয়াছে, আঘাত করিয়াছে সেই সমাজের চিন্তাধারাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজে যা ছিল কল্যাণধর্মী, যা ছিল শ্রেয়, তাহাকেও নির্মমভাবে বিনষ্ট করিয়াছে। কিন্তু, অপর পক্ষে, নূতনকে সে সৃষ্টিও করিয়াছে, ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছে; বিচ্ছিন্নতা দূর করিয়া রাজনৈতিক দিক হইতে

ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে; পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে, আর যতই অনিচ্ছাসত্ত্বে হউক না কেন, ভারতে নব ভাবধারায় পুষ্ট, রাষ্ট্র পরিচালনায় সমর্থ নূতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে। বলা বাহুল্য, বৃটিশ বণিকতন্ত্রের বাণিজ্যিক স্বার্থানুকূল্যেই এই সব রূপান্তর সাধিত হয়।

ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠার সহিত ভারতের নিদারুণ অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাস জড়িত। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগেই ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। আবার ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে ইংল্যাণ্ডের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশ্ব বিজয়ের সম্ভাবনা লইয়া স্পর্ধিত অহঙ্কারে গর্জিয়া ওঠে। সুতরাং বৃটিশ শিল্পের স্বার্থে ভারতের শিল্প বাণিজ্যের ধ্বংস জরুরী ও অনিবার্য ছিল। ১৮১৩ সালের আগে ভারতবর্ষ বহির্বাণিজ্যে প্রধানত রপ্তানীকারক দেশ ছিল। ১৮১৩ সালের পর হইতে ভারত আমদানীকারক দেশে পরিণত হয়। তৎকালীন ইংরেজ শিল্পপতিদের একমাত্র এবং আশু লক্ষ্য ছিল, ভারতকে বৃটিশ কারখানা ও ফ্যাক্টরীর ইন্ধন যোগানোর অফুরন্ত ভাণ্ডারে পরিণত করা। বস্তুত, সে সময়ে ভারতে নীল, তুলা, চা, কফি ইত্যাদি চাষ অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার একমাত্র অর্থ ইহাই যে, ভারতবর্ষ রাতারাতি বৃটিশ কলকারখানার জন্য কাঁচামাল সরবরাহের এক সংরক্ষিত বাগিচায় রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। দুই-একটি দৃষ্টান্ত হইতেই এই রূপান্তরের তীব্রতা উপলব্ধি করা যাইবে। ১৮২৩ সালের পূর্বে বৃটিশ মুদ্রায় ভারতীয় টাকার মূল্য ছিল ২ শিলিং ৬ পেন্স; ১৮২৩ সালে তাহা ২ শিলিং-এ নামিয়া যায়; ১৮২৪ সালে ভারতে প্রেরিত বিলাতী মসলিনের পরিমাণ আনুমানিক ৬০ লক্ষ গজ, ১৮৩৭ সালে তাহা ৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজের উপরে ওঠে; এবং এই সময়ের মধ্যে মসলিন ও তাঁত শিল্পের কেন্দ্র ঢাকার জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার হইতে কমিয়া মাত্র ২০ হাজারে দাঁড়ায়; ১৭৮০ সালে ভারতে বৃটিশ রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মোট রপ্তানীর ৩২ ভাগের এক ভাগ, ১৮৫০ সালে তাহা ৮ ভাগের এক ভাগে দাঁড়ায়। (১) আর সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানীর রাজত্বের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে প্রচুর খাদ্যশস্য রপ্তানী করিতে দেখা যায়। তথ্য পরিবেশন করিয়া ইহাতে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি দেখানো সম্ভব হইলেও, প্রতিটি শস্যকণার সহিত অনুচ্চারিত এই কথাটিও দেশবিদেশের

(১) Karl Marx : Articles on India.

ঘাটে পৌঁছাইতেছিল, ভারতের পরাধীন জনসাধারণ তাহাদের মুখের গ্রাসও বিদেশী বন্দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে।

অর্থনৈতিক শোষণের এই পরিবেশে ভারতে নূতন ভূস্বামী ও বণিক শ্রেণী এবং তাহাদেরই অন্তর্গত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাব হইতেছিল। সংক্ষেপে তাহাদের আবির্ভাবের কাহিনী নিম্নরূপ।

ইংরেজ আমলেই ভারতে সর্বপ্রথম জমির নগদ অর্থ মূল্য ও তাহার ব্যক্তিগত স্বত্বস্বামিত্বের আধুনিক চেতনা দেখা দেয়। কারণ, কৃষিনির্ভর গ্রাম্য জীবন বৃহত্তর পৃথিবীর অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে নগদ টাকায় বেচাকেনার ব্যাপক প্রচলন এই সময় হইতেই শুরু হয়, জমির দাম বাড়িতে থাকে। জমির অর্থমূল্য ও জমির মালিকানা স্বত্ব লোকের চোখে নূতনভাবে নূতন অর্থে প্রতিভাত হইতে আরম্ভ করে।

প্রাক্-বৃটিশ আমলে এইরূপটি ছিল না। সর্বশেষ সিদ্ধান্তে সমগ্র ভূসম্পত্তি রাষ্ট্রের মালিকানা-ভুক্ত থাকিলেও জমির প্রকৃত মালিক ছিল যাহারা জমি চাষ করিত সেই গ্রাম্য কৃষক-গোষ্ঠী; সেটা গ্রাম্য-সমাজ, কিম্বা কোন কোন ক্ষেত্রে জাতিগত ভিত্তিতে কৃষক-গোষ্ঠীর বিশেষ কোন অংশ। এই গ্রাম্য সমাজ অথবা কৃষকগোষ্ঠী সমবেতভাবে গ্রাম্যপ্রধান বা গোষ্ঠীপতিদের তদারকে নিজ নিজ এলাকার চাষের জমিজমা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিত। প্রতিটি কৃষক পরিবার গোষ্ঠীর অধীনে থাকিয়া বংশানুক্রমিকভাবে সেই জমিজমা চাষাবাদ করিত এবং তাহার ফল ভোগ করিত। মোটামুটিভাবে হিন্দু আমল হইতে মুসলমান আমল পর্যন্ত গ্রাম্য সমাজের সমবেত গোষ্ঠীজীবনই ছিল প্রধান। গ্রাম্য কৃষকগোষ্ঠী ও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-শক্তির মধ্যে জমির নিব্যূ্ঢ় স্বত্ব স্বামিত্বের অধিকারসম্পন্ন মধ্যবর্তী কোন জমিদারশ্রেণীর অস্তিত্ব মোগল আমলেও ছিল না। জমিদার অথবা জায়গীরদার বলিয়া যাহারা অভিহিত হইত, তাহারা মোগল সম্রাটের কর আদায়ের কর্মচারী ছিল মাত্র। তবে অনেক ক্ষেত্রে বংশানুক্রমে জায়গীর অথবা জমিদারীর কাজ করিয়া গ্রাম্য সমাজে তাহাদের একটি স্থায়ী আসন দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, এবং বেতন-ভোগী খাজনা আদায়কারী কর্মচারী ও সামন্ত ভূস্বামীর মাঝামাঝি একটা মধ্যম বর্গীয় আভিজাত্যের অধিকার তাহারা ভোগ করিত। স্মরণযোগ্য, হিন্দু আমলে তো বটেই, মুসলমান আমলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব মধ্যম বর্গীয়েরা ছিল হিন্দু।

কিন্তু ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমিসংস্কার-ব্যবস্থায় এই পুরাতন প্রথা ভাঙিয়া যায়। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে এই নব রূপায়ণের সূত্রপাত, এবং কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তাহার পরিণতি। ইংরেজ রাজপুরুষদের নিকট কোম্পানীর রাজস্ববৃদ্ধি ও শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য একটি তাঁবেদার শ্রেণী-সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা ছিল জরুরী। সুতরাং হেষ্টিংস চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী উৎপাদিত শস্যের পরিমাণের অনুপাতে কর নির্ধারণ-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ যদৃচ্ছ-ভাবে উৎপাদন-নিরপেক্ষ কর ধার্য করিতে থাকেন। যাহারা এই নব নির্ধারিত কর দানে ব্যর্থ হইত তাহাদের অধীনস্থ এলাকা নীলামে বিক্রয় হইত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তাভজা একান্ত বংশবদ ব্যবসায়ী ও কর্মচারিগণ বিরাট ভূখণ্ড পারিতোষিক লাভ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কাশিমবাজার স্টেটের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ছিলেন সাধারণ সিল্ক ব্যবসায়ী ; ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট হইতে তিনি ভূসম্পত্তি লাভ করেন ; শোভাবাজার স্টেটের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মুন্সী ছিলেন। এইভাবে এক অভিনব ভূস্বামী শ্রেণীর আবির্ভাব হইতে থাকে, কর্ণওয়ালিশের ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থায় এই শ্রেণীই ধনধান্যে গরিমায় স্থায়ী মর্যাদা লাভ করে।

কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে সামাজিক ভিত্তিহীন এই নবীন ভূস্বামী শ্রেণীকে অভিজাত সামন্ত শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া কঠিন। কারণ, এই তাঁবেদার শ্রেণীর কোন ধারবাহিক সামাজিক দায়িত্ব ছিল না, এবং এমন কি, যাহারা পূর্বতন রাজা বা নবাবদের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন, তাহাদেরও কার্যত সর্বপ্রকার দায়মুক্ত করা হয়। প্রাক্-বৃটিশ আমলের সামন্ত শ্রেণীর স্বত্বস্বামিত্ব না থাকিলেও সম্রাটের প্রতি তাহাদের সামরিক দায়িত্ব ছিল, কিন্তু উক্ত শ্রেণীর বৃটিশ সংস্করণে তাহাও রহিত হয়। বরং, যেন দায়মুক্ত হওয়ার ক্ষতিপূরণ বাবদই তাহাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব স্বীকৃত হইতে থাকে। আর দেশজ ভৌমিক প্রথায় এই নবীন শ্রেণীর কোনরূপ স্বকৃতি না থাকায় এবং বিদেশী স্বার্থানুকুল্যে সৃষ্ট বলিয়া এই শ্রেণীর অস্তিত্বও একান্ত কোম্পানীরাজ নির্ভর ছিল। ফলে, এই শ্রেণীর সামাজিক আচরণ নানাভাবে বিকৃত, পঙ্গু। দেশজ ভূস্বামী শ্রেণীর সামাজিক ন্যায়-অন্যায় আচরণের মধ্যে যে বলিষ্ঠতা ও একনিষ্ঠতার ছাপ পূর্বে দেখা গিয়াছে এই শ্রেণীর মধ্যে সেই গুণ অথবা বৈশিষ্ট্যের একান্ত অভাব ; যেন নিজেদের বর্ণসঙ্কর জন্মের জন্য ইহারা আপনা হইতেই লজ্জিত।

তারপর বণিক শ্রেণী। সমাজ বিবর্তনের আদিকাল হইতেই ভারতে

নগর-সভ্যতার পত্তন হয় এবং সমাজ বিন্যাসে একটি বিশিষ্ট বণিকশ্রেণীর অস্তিত্ব দেখা যায়। এই শ্রেণীকেই ভারতের আদি বণিক পুঁজির প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা চলে। তাহারা সমগ্র বাজার পরিস্থিতির পূর্বাভাষ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করিত; নগর ও গ্রাম্য জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের তাহারাই ছিল একমাত্র বাহন; তাহারাই আবার অজানা অচেনা অমথিত সমুদ্রের দুর্জয় যাত্রাপথে পণ্যের জাহাজ লইয়া নব নব অভিযানে যাত্রা করিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের শেষদিকে ইউরোপের নূতন বাণিজ্য পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের কল্যাণে এই শ্রেণী প্রভূত অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করে। তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া নূতন নূতন সহর বন্দর ইত্যাদির পত্তন হইতে থাকে। বাংলার জগৎ শেঠ এবং সুরাটের অর্জুনজী নাথজী এই বণিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। তাঁহাদেরই অর্থে রাজারাজড়ার সামরিক অভিযান, বণিক সম্প্রদায়ের বহির্বাণিজ্যের সমুদ্র অভিযান, নগর-শিল্প ইত্যাদি পরিচালিত হইত।

মোগল আমলের শেষ দিক হইতে এই বিত্তশালী শ্রেণী সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বার্থসমৃদ্ধি ও আত্মপরায়ণতার প্রেরণায়ই ইংরেজ বণিকদের সহিত তাহাদের বন্ধুতা। কিন্তু ইংরেজপক্ষ হইতে সমৃদ্ধির আলোক-বৃষ্টি হইল না। কারণ, ইংরেজ বণিকদের নিকট দেশী বণিকতন্ত্রের স্বার্থ কোনকালেই অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত পারে না এবং হয়ও নাই। তাই বিরাট শুল্ক প্রাচীর গড়িয়া ইংল্যাণ্ড হইতে এদেশে যন্ত্রপাতি আমদানী নিষিদ্ধ হইল এবং দেশী কুটির শিল্প ও বাণিজ্য বিনষ্ট হওয়ার ফলে দেশী মহাজনদেরও আর শিল্প প্রচেষ্টায় মূলধন লগ্নী করার স্থান রহিল না। সুতরাং শিল্পী এবং কারিগরদের মত তাহারাও বেকার ও কর্মচ্যুত হইয়া পড়ে।

তাহাদের ধ্বংসাবশেষের উপর সংগোপনে ভারতে নূতন বণিকশ্রেণীর অভ্যুদয় হইতেছিল। তাহাদের অভ্যুদয়ও বিচিত্র। বাংলা মুসলিম রাজত্বের প্রান্তীয় দেশ ছিল বলিয়া এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত দুর্বল ছিল বলিয়া বাংলার জগৎ শেঠরা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের চেয়ে রাজস্ব সংগ্রহের প্রতি যত্নবান ছিলেন বেশী; সুতরাং রাজস্ব সংগ্রহের দায়মুক্ত হওয়ায় একদিকে তাহাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যেমন অপসৃত হইল, তেমনি হৃত প্রতিষ্ঠা পুনরর্জনের অবকাশও তাহাদের ছিল না। পক্ষান্তরে, নবাবের সহিত যখন 'দস্তকের' বিশ্লেষণ

লইয়া কোম্পানীর মতবিরোধ দেখা দেয়, তখন কোম্পানী তাহাদের কর্মস্থল হুগলী হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করে ; এবং কলিকাতা হইতে এক শ্রেণীর দেশীয় ভাগ্যান্বেষীর সহায়তায় কোম্পানী নিশ্চিন্তে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য চালাইয়া স্বর্ণ সঞ্চয় করিতে থাকে। এই ভারতীয় মাধ্যম হইল নূতন মুৎসদ্দী শ্রেণী, যাহাদিগকে চীনের Compradore-দের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ভারতীয় সমাজে তাহাদেরও কোন কৌলীন্য ছিল না ; তাহাদের কুলশীল সন্দেহের আবরণে আচ্ছন্ন। তাহাদের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি ঐতিহ্যহীন। আরও উল্লেখযোগ্য, তাহারা সকলেই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দরিদ্র।

পূর্বোল্লেখিত নূতন ভূস্বামী শ্রেণীর ন্যায় এই নূতন বণিকশ্রেণীও ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সহ-নির্মাতারূপে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তাহাদের সম্পর্কে প্রাচীন 'বঙ্গদূত' পত্রের মন্তব্য স্মরণীয়। 'বঙ্গদূত' লিখিতেছেন, "পূর্ব্ব ত্রিশ বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপে অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট, এমতে ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যে সকল লোক পূর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।"

"এই মধ্যবিত্তদিগের উদয়ের পূর্ব্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক। এই নূতন শ্রেণী হইতে যে সকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং ঐ অসংখ্যোপকার কেবল গৌড়দেশস্থ প্রজার প্রতিই এমত নহে কিন্তু ইংলণ্ডপতির এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও স্থৈর্য্য প্রতিও বটে। অতএব যেহেতুক লোকদিগের যখন এ প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক।" (১৩ই জুন, ১৮২৯) (২)

পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাসের নির্মাতা এই উভয় শ্রেণীই নিরঙ্কুশ বৃটিশ প্রয়োজন-জাত ; এবং ঠিক সেই পরিমাণেই তাহারা ভারতীয় সমাজের

২) সংবাদপত্রে সেকালের কথা ; প্রথমখণ্ড, পৃঃ ৩৯৮

সংস্পর্শমুক্ত। আর কোন্ গ্রন্থিসূত্র হইতে তাহাদের আবির্ভাব, জন্মের প্রথম প্রত্যুষেই সেকথা তাহাদের জানার বাকী ছিল না; সুতরাং এই শ্রেণীর আচরণকেও সে পরিমাণে পূর্বনির্দিষ্ট বলা চলে। কিন্তু প্রকৃত দেশজ জলবায়ু এবং অস্থি ও পেশীতে গড়া সামন্তশাহী ও বণিকতন্ত্রের ধ্বংস, এবং কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট নূতন মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণী ও ভূস্বামী শ্রেণীর মধ্যে একটা অনিবার্য সামাজিক ফাঁক থাকিয়া গেল। সেই যুগের চিন্তাধারায় তাহার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

তিন

কিন্তু নবসংস্কৃতি প্রবর্তকদের ভাবাদর্শের পরিচয় দেওয়ার আগে যে পুরাতন সমাজ-মানস পুরাতন সামাজিক শ্রেণীগুলির ন্যায় নূতনের আঘাত অনুভব করিয়াছিল, তাহার কিছুটা পরিচয় দরকার।

প্রাক্-বৃটিশ যুগের সমাজ-সংস্থায় ব্যক্তির স্থান ছিল গৌণ। সামাজিক রীতি-নীতি বিধির প্রকরণ ছিল সামাজিক। এক একটি পরিবারকে সমাজ-কাঠামোর সর্বনিম্ন অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইত, এবং সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ সর্বাংশে পরিবার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। আর স্বয়ং-সম্পূর্ণ অন্য-নিরপেক্ষ সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক, লেনদেন ইত্যাদির জন্য ছিল সমাজের সুনির্দিষ্ট বিধান। সর্বোপরি ছিল বর্ণপ্রথার অনুশাসন। বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ, বিভিন্ন বর্ণের জন্য স্বতন্ত্র সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বিধি, বর্ণ এবং গ্রাম্য গোষ্ঠি-সমাজ বা পঞ্চায়েতের বিধানের সহিত পূর্ণ সঙ্গতি স্থাপন করিয়াই ব্যক্তির মানস পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিত। সেখানে স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি ছিল অচল।

পক্ষান্তরে, স্বয়ং সম্পূর্ণতা গোষ্ঠী সমাজের অর্থনৈতিক বিন্যাসের প্রধান পরি-মাপক হওয়ায়, এবং উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রমের উৎপাদন শক্তি কম ছিল বলিয়া, সেই সমাজের অর্থনৈতিক জীবন ছিল অনিশ্চিত, বিঘ্নসঙ্কুল, ও নিরাপত্তাবোধহীন। এই অসহায় পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিকট মানুষের পরাভব সহজ ও স্বাভাবিক। পরিবেশকে জয় করার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হওয়ার চেতনা এখানে অনুপস্থিত। পরিবর্তে রহিয়াছে পরাভবের নিঃসঙ্কোচ

স্বীকৃতি। কোন বিরাট শক্তি যেন লীলাচ্ছলে নিজেকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। তাহার নিকট পরাভবে কোন লজ্জা বা অবমাননা নাই। পরাভবই সেই লীলার সঙ্গে ব্যক্তির কর্মের সার্থক সঙ্গতি স্থাপন। নৈসর্গিক বৈচিত্র্যকে মনে হয় অমোঘ; দেখা দেয় নৈরাশ্য, অবসাদ, আর যা আছে তাহাকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকার প্রাণহীন মনোবৃত্তি। অর্থাৎ, সর্বদিক থেকেই তৎকালীন সমাজ-মানস ছিল আচ্ছন্ন ও আত্মগ্লানিতে অপহত। কুসংস্কার, নিরন্তর পরাভব চেতনা, প্রাকৃতিক শক্তির নিকট অশ্রদ্ধ আত্মসমর্পণ, এবং যুগযুগান্তর বিস্তৃত বিধিব্যবস্থার নিকট প্রশ্নহীন আত্মবিক্রয় ব্যক্তি-মানসকে সর্বপ্রকার আত্মচেতনা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। এই পরিবেশে স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব স্বাভাবিক, আর স্বৈরাচার শুধু রাষ্ট্রিক শাসন ব্যবস্থার নয়, ভাবাদর্শেরও। সুতরাং, সমাজ-মানস ছিল সর্বপ্রকার গতিশীল সৃষ্টধর্মী গুণবর্জিত; কার্যকারণ সম্পর্কের চেতনাহীন, irrational.

এই বিচ্ছিন্ন, বাহির বিশ্বের সহিত সংযোগশূন্য, ধ্বংসমুখীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সমস্ত অগ্রগতি ও উন্নতির পথ স্বভাবতই অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তদানীন্তন অবস্থায় জাতীয়বোধের বিকাশ, অথবা সমগ্র দেশকে একটি কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার মধ্যে সন্নিবিষ্ট বা সুসংহত করাও সম্ভব ছিল না; সুতরাং জাতীয় বা সামগ্রিক ঐক্যবোধের বিকাশও এখানে কল্পনাতীত। সমস্ত দিক হইতে অগ্রগমনের সম্ভাবনা মুক্ত হইয়া সমকালীন ভারতীয় সমাজ বহুবিধ সামাজিক ব্যাভিচার বুকে লইয়া আত্মক্ষয় করিয়া চলিয়াছিল। বৃটিশ আমলের প্রথম পর্বে এই সমাজের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পরিচয়ঃ "তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরস্ত্রীগমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকতে' প্রায় সকল আমলা, উকীল, বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহীত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্বে গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিতসকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্ব্বোপলক্ষে সেথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন

বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।.........সে সময়ের যশোহর নগরের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি যে আদালতের আমলা, মুক্তিয়ার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে—"ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন," এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মান সম্ভ্রমের কারণ ছিল। কেবল কি যশোহরেই? দেশের সর্ব্বত্রই এ সম্বন্ধে নীতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল।" (৩) সুগঠিত দৃঢ় নৈতিক চরিত্র অপেক্ষা শ্লথ চারিত্রিক বিহারকেই সামাজিক পদমর্যাদা অর্জনের মাপকাঠি বলিয়া গণ্য করা হইত।

তৎকালীন সমাজের পারমার্থিক কল্যাণের বিধায়ক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও দুর্নীতির প্রসার ছিল ব্যাপক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "এইক্ষণে যে ২ মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য করা যায়......তাঁহাদিগকে নির্গুণ চূড়ামণি বলা যাইতে পারে কোন ২ স্থানে এমত ঘটিয়াছে যে কোন ২ কুলীন জামাতা আপন ২ পত্নীর সহ শয়নে থাকিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে আপন নিদ্রিত পত্নীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বস্ত্র অতি সাবধান পূর্ব্বক খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছেন.........কুলীন মহাশয়েরা আপন আপন স্ত্রীপুত্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্ম্ম জানেন যে তাঁহারদিগের পীড়িতাবস্থাতেও তাঁহারদিগের চিকিৎসাবিষয়ে কোন চেষ্টা করেন না এবং এতদ্রূপ চেষ্টাকে আপন কৌলীন্যের হানিকারক জানেন।" (৪) অথচ, 'জ্ঞানান্বেষণ,' পত্রের জনৈক সংবাদদাতার অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে দেখা যায়, "ধোপা, নাপিত, বৈষ্ণব, মালি, কামার, কপালির কন্যা", এমন কি মুসলমান কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করাতেও কুলীনদের কৌলীন্য অথবা জাতি ভ্রষ্ট হয় নাই। (৫) সামন্তসমাজের ধ্বংস ও নিঃশেষ অবলুপ্তির মুখে সমাজের বিধানদাতাদের পক্ষে এইরূপ ব্যাভিচারে লিপ্ত হইতে বাধে নাই।

(৩) শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ, ৪১

(৪) সংবাদপত্রে সেকালের কথা; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ, ১৭৮-৯

(৫) ঐ; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ, ১৮৫-৬

ধর্মবোধ, পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপ, আচার অনুষ্ঠানের রুচি ও পদ্ধতি কিরূপ বিকৃত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও আত্মনিগ্রহপরায়ণ ছিল, নিম্নোক্ত কয়েকটি চিত্র তাহার পরিচায়ক।

সহমরণ : "নরবলি, গঙ্গাজলে মনুষ্যবালক জীবদ্দান করণ ও রথের চাকার নীচে গাত্র চালান পূর্ব্বে ছিল তাহা হইতে ভয়ানক সহমরণ অনুমরণ ভদ্রলোকের দর্শনে বোধ হয় কারণ, অবলা অনভিজ্ঞা স্ত্রীলোককে শাস্ত্রোপদেশদ্বারা ভ্রম জন্মাইয়া এরূপ উৎকট কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাণ সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ঘূর্ণপাকে ৭ সাতবার ঘুরাইয়া শীঘ্র চিতারোহণ করাইয়া শবের সহিত দৃঢ়বন্ধন পুরঃসরে জলদগ্নিতে দগ্ধ করণ ও বংশদ্বয় দ্বারা শবের সহিত তাহার শরীর দাবিয়া রাখন ও তাহার কথা কেহ না শুনিতে পায় এ নিমিত্তে গোলমাল ধ্বনি করন অতি দুরাচার নির্দ্দায়িক মনুষ্যের কর্ম্ম……।" (৬)

অন্তর্জলি : "গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া রোগি ব্যক্তিকে যা ইচ্ছা তাই একটা খড়ুয়া ঘরে রাখে তাহাতে দিবার রৌদ্র ও রজনীর শিশির কিছু নিবারণ হইতে পারে না। এক স্থানে দুই এক দিবস পর্য্যন্ত থাকিতে হয়……পরে তাহাকে ঐরূপ ঘর হইতে উঠাইয়া প্রবাহসমীপে লইয়া অর্দ্ধ শরীর জলমগ্ন করিয়া অর্দ্ধ রৌদ্রের তাপে আর্দ্রভূমিতে রাখে অনন্তর দুই একজন আত্মীয় স্বজন তাহার পাদাঙ্গুষ্ঠ মৃত্তিকাতে ঠেলিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার বক্ষস্থলে মৃত্তিকা লেপন করিয়া হরিবোল ২ বলত কিঞ্চিৎ ২ গঙ্গাজল মুখে দেয়……রোগির চীৎকারে কেহই মনযোগ করে না এবং তাহার গলায় অনবরত জল ঢালিতে থাকে…… যখন জোয়ার আসিয়া রোগির কোমর পর্য্যন্ত জল উঠে তখন ডেঙ্গায় কিঞ্চিৎ টানিয়া লইতে থাকে এইরূপ টানাটানি করাতে কখন কখন তাহার শরীরের কোন স্থানে আঘাত হয়……কখন ২ তাদৃশ যাতনা না দিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া রাখে…পুনর্ব্বার লইয়া গিয়া জলে ফেলে পরে পরিচারকেরা বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহার অতি শীঘ্র মৃত্যুর চেষ্টা পায় অর্থাৎ অনবরত জল গিলিয়া দিতে থাকে পরিশেষে অধিক জল গিলিতে না পারাতেই মরিয়া যায়।" (৭)

নরবলি : "অতি নিকটবর্ত্তী বর্দ্ধমান জিলাতে মধ্যে মধ্যে নরবলি হওনবিষয়ক জনশ্রুতি দেশময় প্রচার হইয়াছে…সর্ব্বসাধারণের মনে এই অনুভব হইয়াছে যে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার বর্দ্ধমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং ঐ বংশের

(৬) ঐ ; প্রথম খণ্ড ; পৃ. ২৮৮

(৭) ঐ ; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃ. ৩৮৭-৮৮

মধ্যে যখন কোন ভারি অস্বাস্থ্য উপস্থিত হয় তখন নরবলিদানের আবশ্যক বোধ করেন। সম্প্রতি ঐ বংশের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির হইতে পারে যুবরাজের বসন্ত রোগ হওয়াতে নরবলিদান হইয়াছিল এমত জনশ্রুতি আছে।" (৮)

ধর্ম্মাচরণে বিকৃতি: "যদ্যপি নীচ কুলোদ্ভব ব্যক্তি বৈষ্ণব হয় তবে তাহাকে বিষ্ণুপরায়ণ বলিয়া তাহার চরণামৃত অধরামৃত চরণরজ ইত্যাদি গ্রহণ ও ধারণ করেন। কিবা প্রভুর আশ্চর্য্য লীলা যে ইহাতেও চিত্তবিকার জন্মে না। যদ্যপি কোন ব্যক্তি অদ্য মদ্যপানাভিভূত ধূল্যবলুন্ঠিত থাকে আর কল্য প্রভুর দ্বারে ১।০ পাঁচ সিকা নিঃক্ষেপ করত ভেকাশ্রমী হইলে অতিশয় মান্য হন।"(৯)

চার

নব সংস্কৃতির বিধায়কগণ এইরূপ অচল সামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন।

কিন্তু পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, বৃটেনের সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনেই তাহাদের সৃষ্টি, এবং সেই অনুপাতেই তাহারা ভারতীয় সমাজের বৃন্তচ্যুত। মেকলে সাহেব তাঁহার বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন, We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect (লক্ষ লক্ষ লোক যাহাদের আমরা শাসন করি, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করার জন্য একটি মাধ্যম সৃষ্টি করার প্রতি আমাদের সবিশেষ যত্নবান হইতে হইবে; তাহারা হইবে এমন এক শ্রেণীর লোক যাহারা শুধু রং আর রক্তের পরিচয়ে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিজ্ঞান এবং বুদ্ধিতে যাহারা হইবে ইংরেজ) এই মনোভাব-সম্মত মাধ্যম সৃষ্টির কাজ বহুদিন পূর্বেই অঘোষিতভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। দেশীয় জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় বোধশক্তি যত অপরিণত এবং যত সঙ্কীর্ণ ই হউক না কেন প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, দেশীয় রাজারাজড়া, অমীর-ওমরাহের দিন গত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ আর তাঁহাদের শ্লথ ঔদার্যে নির্মিত হইবে না; বুঝিয়াছিল, ইংরেজরাই এদেশের ভবিষ্যৎ,

(৮) ঐ; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ, ৩৮৬
(৯) ঐ; প্রথম খণ্ড; পৃ, ১২৪

এবং ইংরেজ আচরিত সামাজিকআদর্শ ও চালচলন রীতিনীতিই ভাবী কালে মানুষকে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিবে। এই ব্যবহারিক জ্ঞানই নূতন ভূস্বামী, ও বণিক শ্রেণীকে ইংরেজের কাছে টানিয়াছে এবং ভারতীয় জনসাধারণ হইতে তাহাদিগকে অতি দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। আর, এদেশে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইংরেজ রাজপুরুষদের পক্ষ হইতে গণ-মানসে ইংরেজ-চেতনা উদ্বোধনের চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়, এবং তাহার ফলও প্রত্যক্ষ। ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তৎকালীন ধনী মানী ব্যক্তিদের মধ্যে পূজাপার্বণে ও ইংরেজদের খানাপিনার ব্যাপারে কে কত বেশী অর্থব্যয় ও জাঁকজমক করিতে পারেন তাহা লইয়া প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না।

সে কালে ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের মধ্যে দুর্নীতি ছিল ব্যাপক ও অবিমিশ্র। অনুকরণপ্রয়াসী নূতন ভারতীয় শ্রেণী এই জাতীয় হীনচরিত্র ইংরেজকেই আদর্শ হিসাবে সম্মুখে রাখিয়াছে। সুতরাং, "তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিলনা। বরং কোনও সুহৃদগোষ্ঠিতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত।......এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে "বাবু" নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগ সুখেই দিন কাটাইত।......... মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিন্‌ফিনে কালোপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপ চুনট করা উড়ানী, ও পায়ে পুরু বগ্‌লস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীন প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত; এবং খড়দহের ও ঘোষপাড়ার মেলা, ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।" (১০) আর, "বাক্য বিন্যাস যেখানে বলিতে হইবেক

১০) শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ; পৃ, ৫৫-৫৬

অমুক বড় কৌতুক করিয়াছে সেখানে কহেন কি হদ্দ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও তাহার স্থানে লিএজা চুচুঁড়া চুঁড়া ফারাশডাঙ্গা ফড্ডাঙ্গা কামড়িয়াছে কেমড়েছে টাকার নাম ট্যাকা মুখের নাম বাঁৎ করো নাম কড়ো। পরিহাস বাক্য খাঁইস শাশুড়ে বৌও ইত্যাদি বাক্য যিনি অধিক কহিতে পারেন তিনি সুবক্তা।" (১১)এই ভাবেই নব-উদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেকে জনবুলের ভারতীয় সংস্করণরূপে সৃষ্টি করিতেছিল।

কিন্তু, ইংরেজের সামাজিক আচরণ অনুকরণের প্রত্যক্ষ অর্থ দেশীয় সমাজের ধর্ম ও বিধান অস্বীকার ও বর্জন। অবশ্য বর্জন ও অস্বীকার যে অসংগত, তাহা নয়। পূর্বতন সমাজ ও সামাজিক ক্রিয়াপ্রকরণ সৃষ্টিশীল মানসের সম্মুখে যে বিরাট অচলায়তন সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল' এবং যাহাতে সমাজের গতিবেগ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহার অস্বীকৃতির মধ্যে নিঃসন্দেহে যুক্তি, বলিষ্ঠতা এবং সৃষ্টিধর্মী প্রেরণা রহিয়াছে; কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনস্বীকার্য যে, সামাজিক ব্যবহার ও আচরণে নূতন শ্রেণী ও নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কোনরূপ সুস্থ, যুক্তিসম্মত, সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনাচরণের সবল নিদর্শন স্থাপন করিতে পারে নাই। শুধুমাত্র অস্বীকৃতিতেই তাহার গৌরব, প্রতিষ্ঠায় আশ্চর্যরকম দুর্বল। নূতন সংস্কৃতিও সৃষ্টির আবর্তে ব্যক্তি-সত্তার উদ্বোধন হইয়াছে; তাহার আত্মবোধ, তাহার মানবতার চেতনা, তাহার স্বাতন্ত্র্য-বোধ, তাহাকে ভবিষ্যতের দিকে পদক্ষেপের জন্য চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে; অচলায়তনের বন্ধন ভেদ করিয়া ও বিধিনিষেধের সীমানা লঙ্ঘন করিয়া সে নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য, তাহার মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, জাগরণের অস্থিরতায় ও কলকোলাহলে সে দিক্‌ভ্রান্ত। অসুস্থ যৌনজীবনের কলুষ এবং স্পর্ধাশীল মদ্যপানের মধ্যে সে শত শত বৎসরের অচেতনা ও বন্ধন হইতে মুক্তির আস্বাদ খুঁজিতে লাগিল। এই নেতিধর্মী জীবনাচরণের ফলে ব্যক্তিক জীবনে দেখা দিয়াছে নিদারুণ বিপর্যয়, দেখা গিয়াছে নিঃশেষে ক্ষয় পাওয়ার উদ্দাম বিলাস, আর সর্বাপেক্ষা গুরুতর সামাজিক প্রতিক্রিয়া এই হইয়াছে যে, এদেশের জনসাধারণের সহিত নূতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও চিন্তানায়কদের ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যে অচেনা, অনাত্মীয়, বিদেশী শক্তি ভারতীয় সমাজের সর্ববিধ কৌলীন্য উপেক্ষা করিয়া ইহাকে

(১১) সংবাদপত্রে সেকালের কথা; প্রথম খণ্ড, পৃ, ১২৪

নির্মমভাবে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে, পুরাতন সমাজের ভাবাদর্শ ও সর্ববিধ মূল্যকে অস্বীকার করিয়াছে, তাঁহারা সেই শক্তিরই আত্মপ্রতিষ্ঠার বাহক বা উপকরণে পরিণত হন। সুতরাং এই ব্যবধান। রামমোহন রায়ের বুদ্ধিগত বিদ্রোহ হইতে যাত্রা করিয়া, বিদ্যাসাগরের আমলে এই বিদ্রোহের বিস্তৃতি ও গভীরতা অতিক্রম করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের যুগেও এই ব্যবধান অব্যাহত থাকে। সে কথা পরে আলোচ্য।

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এই ব্যবধানকে দৃঢ়তর করে। এই শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ কি, তাহা মেকলের পূর্বোক্ত উক্তিতেই স্ব-অভিব্যক্ত। সুতরাং ভারতীয় জনসাধারণের বৃহত্তর জীবনের সহিত, অথবা সামগ্রিক-ভাবে ভারতীয় সামাজিক ও জীবনাচরণের স্বাভাবিক ধারার সহিত এই ব্যবস্থার সামঞ্জস্য ও সংযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। বস্তুত, ইহা জনশিক্ষা ছিল না; সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে যে নূতন শ্রেণী সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা শাসক ও শোষিতের মধ্যবর্তী নির্ভরযোগ্য মাধ্যম, তাহাদের এবং তাহাদের সন্তানদের জন্যই এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। ইহার ফলে, বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাগত জাতিভেদ দেখা দেয়; শিক্ষা একটা বিলাসের সামগ্রীতে পরিণত হয়। অপরপক্ষে, শিক্ষিত ভারতীয়েরা নিজদিগকে শাসক সম্প্রদায়ের সহিত একীভূত করিয়া ভাবিতে থাকেন, দেশীয় জনসাধারণের শাসন ও শোষণে তাঁহারাও যেন বিদেশীয়দের ন্যায্য অংশীদার—এমনি একটা চেতনা তাঁহাদের মধ্যে বিকাশলাভ করিতে থাকে।

কিন্তু, ইহাই তাঁহাদের সামাজিক আচরণের সব দিক নয়। দেশীয় সামাজিক রীতিনীতির নির্মোহ অস্বীকারের অন্তরালে কোথায় যেন একটা বেদনা লুকানো ছিল; সে বেদনা দেশীয় সমাজে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া পরিগণিত হওয়ার নির্মম চেতনা হইতে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহাদের সামাজিক ভিত্তি পিচ্ছিল, ধিক্কারে জর্জরিত; অথচ দেশীয় সমাজে স্বীকৃত না হইলে, দৃঢ়ভিত্তির উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে এই অশ্রদ্ধা কোনকালেই বিদূরিত হইবে না, যে ফাঁকির উপর তাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাও কোনকালে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রথম হইতেই তাঁহারা আন্দোলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, এই নূতন শ্রেণীর সমাজ-ধর্ম মুখ্যত নেতি-ধর্মী ছিল: সেজন্য এই অন্তর্দ্বন্দ্বের

মীমাংসার প্রচেষ্টার মধ্যেও অনুরূপ বিকৃতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। স্বাভাবিক স্বীকৃতির অভাবে যেন জোর করিয়া সামাজিক স্থিতিলাভ ও তাঁহাদের আবির্ভাবের সামাজিক ফাঁক ভরাটের চেষ্টা তাঁহাদের মধ্যে দেখা দেয়। যেমন, "সুপুরুষ হইতে মহাসাধ মনে ভাবেন বড় মানুষের ঘরে জন্মাইয়াছি যদি সৌন্দর্য্য না দেখাই তবে লোক ছোট লোক কহিবেক ইহাতে করিয়া স্বর্ণ মুক্তা হীরা প্রভৃতির আভরণ অর্থাৎ দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার বাজুবন্দ উপলক্ষে ইষ্টকবচ গোট চাবির শিকলি ইত্যাদি গহনা। ও কালাপেড়ে্য রাঙ্গাপেড়ে্য শালপেড়ে্য কাঁকড়াপেড়ে্য লিখক কহে ইচ্ছা হয় ছাইপেড়ে্য ধুতি পরিধান করেন এসকল স্ত্রীলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে ইহাতে তোমাকে সুন্দর কোন প্রকারে দেখায় না বড়লোক কহা যায় না বরং ছোটলোক বিলক্ষণ সাবুদ হয়...।"(১২) মামলা মোকদ্দমা দ্বারা সামাজিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা ও ইহার বিজ্ঞাপন দেওয়ার চেষ্টাও হইত। এই রূপ উপায়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া তাঁহারা পরস্পরের সহিত জাতে-ওঠা লইয়া প্রতিযোগিতা করিতেন। সনাতন নিষ্ঠাবান হিন্দুদের মধ্যে জাত খোয়ানোর ভয়ে অনেককে এক অদ্ভুত রীতি অনুসরণ ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে দেখা যায়। তাঁহারা ম্লেচ্ছ ইংরেজের অধীনে বিষয়কর্ম করিয়া অপরাহ্নে অফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া স্বদেশীয়দের মধ্যে ব্রাহ্মণের গৌরব ও আধিপত্য সংরক্ষণের জন্য স্নানাহ্নিক করিতেন, এবং এইভাবে গ্লানি ও পাপমুক্ত হইয়া "দিবসের অষ্টমভাগে" আহার করিতেন। (১৩) রামমোহন রায়ের মধ্যেও এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ইহার সমাধান প্রচেষ্টার করুণ অভিব্যক্তি দেখা যায়; "তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে তিনি প্রাতে দেশীয় প্রথা অনুসারে আসন বা পিঁড়িতে বসিয়া মাছ ভাত খাইতেন; রাত্রে বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে টেবিলে বসিয়া ইংরাজী রীতিতে খানা খাইতেন।" (১৪)

বলা বাহুল্য, এই অন্তর্বিরোধের সমাধান এতটা সহজ ছিল না, এবং সমাধান হয়ও নাই। এই অমীমাংসিত সমস্যার নিরন্তর বেদনাদায়ক চেতনা নূতন চিন্তানায়কদের মধ্যে অল্পবিস্তর বর্তমান ছিল, এবং প্রথম উচ্ছ্বাস কাটিয়া যাওয়ার পর বঙ্কিমযুগের প্রারম্ভে তাহা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে।

(১২) ঐ প্রথম খণ্ড ; পৃ, ১২৩-৪
(১৩) নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়— রামমোহন রায়ের জীবনচরিত
(১৪) শিবনাথ শাস্ত্রী— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃ ৯২

সামাজিক আচরণের এই অন্তর্বিরোধ তাঁহাদের রাজনৈতিক আচরণের মধ্যে দেখা যায়। তৎকালীন শিক্ষিত ভারতীয়ের আদর্শ পুরুষ ছিল ইংরেজ, এবং সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের ইংরেজ শাসনযন্ত্রের অপরিহার্য অংশরূপে কল্পনা করিতে শিখিয়াছিল। আর, বিষয়গত ব্যবহারিক দিক হইতে ইংরেজ-বিজয় যে সমাজ-বিপ্লব সার্থক করিয়া চলিয়াছিল, বাস্তববুদ্ধি ও বস্তুনিষ্ঠার মানদণ্ডে নূতন চিন্তানায়কগণ তাহা অনুভব ও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতপ্রবাসী ইংরেজ তখন বুদ্ধিগত ও সামাজিক ন্যায়বিচার আদর্শের বার্তাবহ। অপ্রাকৃত সংস্কারের নিকট মানুষের স্বেচ্ছাকৃত দাসত্বের নিগড় ভাঙ্গিয়া ইউরোপের নূতন মানুষ তখন সবে জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে; শিল্পবিপ্লব তাহাকে সেই মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে. আর ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে তাহার মানবতার আকৃতি, মানুষের অপরাজেয় মহিমার কথা ঘোষিত হইয়াছে। আর, প্রত্যেক সামাজিক ক্রিয়ার ন্যায়, সেই আকৃতি দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যত অসম্পূর্ণ এবং যত অপরিণতই হউক না কেন, তৎকালীন ইংরেজের কণ্ঠে ছিল সেই আকৃতি, সেই আদর্শবাদের সুর। কেরী, মার্শমান, ডেভিড হেয়ারের নিঃস্বার্থ পরার্থপরতার মধ্যে, ডিরোজিও, রিচার্ডসনের শিক্ষার মধ্যে, বেণ্টিঙ্কের সংস্কারের মধ্যে ভারতের শিক্ষিত সমাজ সেই সুরের স্পর্শই অনুভব করিয়াছিল। সুতরাং ইংরেজের প্রতি তখন ছিল একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা; এবং, সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশিয়াছিল নিখুঁত ব্যবহারিক জ্ঞান। যাহা ইংরেজের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আচরণ কর্তৃক অনুমোদিত, তাহাই শুভ ও আচরণীয়; যাহা ইংরেজ কর্তৃক অনুমোদিত নয়, তাহা সুস্থ সমাজধর্মের বহির্ভূত। ভারতে ইংরেজের সর্ববিধ কার্যকে এই দৃষ্টিতে দেখার একটা ঝোঁক তৎকালীন শিক্ষিতদের মধ্যে বর্তমান ছিল।

এই প্রবণতার ফলে ইংরেজের অসঙ্গত আচরণও সামাজিক ন্যায়-বিচারের ছাড়পত্র লাভ করিয়া অনুমোদিত ও স্বীকৃত হইতে থাকে। কিন্তু আদর্শ ও আচরণের মধ্যে যে অসঙ্গতি থাকিয়া যাইতেছে, বিশুদ্ধ আদর্শ ও ইংরেজের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ যে একীভূত হইয়া যাইতেছে, তাহা বিচার ও উপলব্ধি করার মত মন ও অবকাশ সম্ভবত কোনটাই সেযুগে ছিল না। সুতরাং, শিক্ষিত সমাজের রাজনৈতিক আচরণে স্ব-বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রাজা রামমোহন রায় স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদে

কলিকাতা টাউন হলে একটি সাধারণ ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন ; তিনি নেপল্‌সের নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেন্টের পতন হওয়ায় মর্ম্মাহত হইয়া বাকিংহামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার বাতিল করিয়াছিলেন ; তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরাচারের মিত্ররা পরিণামে কোনকালেই জয়লাভ করিতে পারে নাই, এবং কখনও করিবে না ; অথচ তিনিই অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের পক্ষাবলম্বন করিয়া জনসভায় বক্তৃতা করেন, 'নীলকর সাহেবেরা কোথায়ও কোথায়ও অল্পবিস্তর অন্যায় করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু, সর্বাঙ্গীণ-ভাবে, অন্যান্য ইউরোপীয়ের অপেক্ষা তাহারাই এদেশীয় জনসাধারণের অধিকতর উপকার সাধন করিয়াছেন'। (১৫) দ্বারকানাথ ঠাকুর একটি জনসভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এদেশীয় জনসাধারণের সমস্ত কিছুই হরণ করিয়াছেন. তাহাদের জীবন, তাহাদের স্বাধীনতা, তাহাদের সম্পত্তি সমস্তই আজ গভর্ণমেণ্টের করুণার সামগ্রী ; আবার তিনিই ইউরোপীয় সমাজের সমর্থনে ইংরেজ কর্মচারীর বিচারে ভারতীয় বিচারপতির অধিকারের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। (১৬) এই স্ব-বিরোধী আচরণ যে বিশুদ্ধ ব্যবহারিক জ্ঞান-প্রণোদিত তাহা বলাই বাহুল্য।

ইংরেজের সর্ববিধ কার্যকে নিঃসঙ্কোচে সমর্থন করা ছাড়া আর কোন কার্যক্রম শিক্ষিত সমাজের পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা, তাহা আজ নির্ণয় করা কঠিন। বৃটিশ বণিকতন্ত্রের আঘাতে ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হওয়ায় এবং ভারতবর্ষ মূলতঃ কাঁচামাল সরবাহকারী উপনিবেশে পরিণত হওয়ায়, নূতন ভূস্বামী পরিবার-সমূহের শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে (ভূস্বামী পরিবারের সন্তানরাই সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে) শিল্প-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ ছিল না ; অতএব কোম্পানীর অধীনে দায়িত্বসম্পন্ন চাকুরী গ্রহণই তাহাদের পক্ষে একমাত্র লোভনীয় বৃত্তি ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রথমে উচ্চ সরকারী পদ হইতে ভারতীয়দের বঞ্চিত রাখার নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে, ১৮৩৩ সালের সনদে, নিয়োগ ব্যাপারে জাতি ও ধর্মবৈষম্য দূর করা হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ডেপুটি কালেক্টরের পদে ভারতীয়দের নিয়োগ আরম্ভ করেন. ১৮৪৩ সাল হইতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে ভারতীয় নিয়োগের নীতি প্রবর্তিত হয়, এবং আরও পরে উচ্চ পদে নিয়োগপ্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার

(15) Asiatic Journal; June, 1830

(16) B. Mazumder —History of Political Thought ; P.;175

প্রচলন হয়। উচ্চ পদে ভারতীয় নিয়োগের পশ্চাতে ব্যয়-সঙ্কোচের সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক চেতনা বর্তমান থাকিলেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষের এই নীতিতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত বৃটিশ বণিকতন্ত্রের ঐক্যসূত্র দৃঢ়তর হয়। সেযুগের বহু যশস্বী ব্যক্তি উচ্চ সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন; তন্মধ্যে ১৮৩৩ সালের সনদের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক বক্তৃতার খ্যাতিসম্পন্ন রসিককৃষ্ণ মল্লিক অন্যতম।

বস্তুত, গভর্ণমেণ্টের সহিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কোনরূপ মৌলিক বিরোধ ছিল না। তাঁহারা রাষ্ট্র শাসন কার্যে যথার্থ অংশ গ্রহণ এবং তাঁহাদের সহিত গভর্ণমেণ্টের অধিকতর সহযোগিতা দাবী করিয়াছিলেন মাত্র। ১৮৩৭ সালে জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জমিদার সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮৪৩ সালে শিক্ষিত সম্প্রদায় 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ১৮৫১ সালে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করিয়া 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ঔদার্য ও আদর্শগত প্রগতি সম্পর্কে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখনও, এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ অতিক্রম করিয়া বিগত শতাব্দীর শেষভাগেও, সম্পূর্ণ আস্থাহীন হয় নাই। ১৮৯৭ সালে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শঙ্করণ নায়ার ঘোষণা করেন, 'It is impossible to argue a man into slavery in the English language.' (১৭) ইংরেজের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি এই অকলঙ্ক শ্রদ্ধা এবং বৃটিশ রাজপুরুষদের উপর নির্ভরশীলতা সেযুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশন কোম্পানীর শাসন অবলুপ্তির পর নূতন শাসন ব্যবস্থা সূত্রপাতের প্রাক্কালে, গভর্ণমেণ্টকে "importance of the promotion of a territorial aristocracy as a political safety valve for the state" সম্পর্কে সচেতন হইতে অনুরোধ করেন। (১৮)

কিন্তু এই অনুরোধ জ্ঞাপন হইতে অনুমিত হয়, গভর্ণমেণ্টের সদিচ্ছার প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আস্থার মাত্রা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছিল এবং সাধারণভাবে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কও শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার কারণ, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে সৃষ্ট মধ্যবিত্তশ্রেণীকে সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, তাহাদের ভাবাদর্শ এই সীমানা অতিক্রম করিয়া বিস্তৃতি লাভ করুক, ইহা কর্তৃপক্ষের

(১৭) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—A Nation in the Making গ্রন্থের ১৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

(১৮) এসোসিয়েশনের ১৮৬০ সালের বার্ষিক বিবরণীতে উল্লেখিত

কাম্য ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিতেছিল, এবং শাসক ও শোষিতের মধ্যে শুধুমাত্র সেতুবন্ধনের কাজে সন্তুষ্ট না থাকিয়া তাহারা সেতু নির্মাতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবী জানাইয়াছিল। তাছাড়া প্রথম যুগে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট এই নূতন শ্রেণীর যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রয়োজনীয়তাও কমিয়া আসিতেছিল। সরকারী চাহিদার অনুপাতে উচ্চ পদাভিলাষী শিক্ষিত ভারতীয়দের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছিল। সুতরাং, গভর্ণমেণ্ট ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসাম্য কিছুটা বিচলিত হইতে আরম্ভ করে।

সামাজিক ক্ষেত্রেও এই বিচলন সমভাবে দেখা যায়। একটি মাত্র ঘটনা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ১৮৪৫ সালে উপেন্দ্রনাথ সরকার নামক এক ব্যক্তি সস্ত্রীক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখিতেছেন, "শুনিয়া আমার বড়ই রাগ ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত খৃষ্টান করিতে লাগিল। তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম, এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল।" "অন্তপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব! ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দু নাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। * * * অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারীদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ।"......—একদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ওদিকে রামগোপাল ঘোষ; আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম। ....ইহাতেই ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মসভার যে দলাদলি, এবং যাহার সঙ্গে যাহার অনৈক্য ছিল, সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই একদিক হইলেন, এবং যাহাতে খৃষ্টানদিগের বিদ্যালয়ে আর ছেলে পড়িতে না পায়, যাহাতে খৃষ্টানেরা আর খৃষ্টান করিতে

না পারে, তাহার জন্য সম্যক চেষ্টা হইতে লাগিল।" (১৯) এই ঘটনার অল্প কিছু-কাল পরে, ১৮৪৯ সালে মফঃস্বলের বিচারালয় হইতে শ্বেত কৃষ্ণ বৈষম্য বিরদূণের জন্য আইন প্রণয়ণের চেষ্টা করা হইলে ইউরোপীয় সমাজ এইসব "কালা কানুনের" (Black Acts) বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ করে, তাহাতে ইঙ্গ-ভারতীয় সামাজিক ব্যবধান সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে; আর ১৮৫১ সালে যখন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন একজনও ইউরোপীয় সদস্য গ্রহণ করা হয় নাই! অথচ, ইতিপূর্বে ইঙ্গ-ভারতীয় সমবেত চেষ্টায় জমিদার সংঘ (১৮৩৭) ও 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৪৩) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের ভারসাম্য যে বিচলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের আরম্ভকাল পর্যন্ত ইহাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক আচরণের, ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের, সাধারণ পরিচয়। আর বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন সমাজ এই সাধারণ সম্পর্কেরই ধারাবাহিক পরিণতি।

পাঁচ

বৃটিশ বণিকতন্ত্রের ভাঙ্গা-গড়া ক্রিয়ার অন্তরালে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দ্রুত সম্প্রসারণ ও পরিণামে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত হওয়ার চেতনা এবং পুরাতন সমাজ-মানসের ক্রম-তিরোভাবের মধ্য দিয়া ভারতীয় সমাজ গতি অর্জন করে। একদিকে ক্ষয় ও দুঃসহ অভাব এবং অপর দিকে সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের চিহ্ন, এই দুই সমান্তরাল বৈশিষ্ট্য বুকে লইয়া সমাজ চলিতে আরম্ভ করে। পূর্বতন ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণীসমূহের ক্ষমাহীন অবলুপ্তি এবং নূতন আমলে দেশ-দেশান্তরে প্রেরিত নিঃস্ব শ্রমজীবীদের কাহিনী আমাদের মানবিক বোধে আঘাত করিতে পারে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা ভারতীয় সমাজকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইল যে, কালের ঊর্ধ্বে নয়, তাহাকে কালের মধ্যেই প্রবাহিত হইতে হইবে। সমাজদেহে এই আকস্মিক গতিপ্রাণতার একটি লক্ষণ এই যে, কোন্ ধারায়, কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিয়া, কোন্ শ্রেয়বোধের প্রেরণায় ইহা প্রবাহিত হইতেছে, তাহার হিসাব নিকাশ করার অবকাশ ও প্রয়োজন সেই প্রবাহ-ক্ষণে অনুভূত হয় না; চলা ছাড়া তাহার গত্যন্তর

(১৯) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী; প ১০৪-৫

নাই, চলাতেই তাহার প্রাণ, তাহার অস্তিত্ব। এই চেতনাই উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে সমগ্রভাবে সমাজকে চঞ্চল করিয়াছিল।

অর্থাৎ অলক্ষ্যে পূর্বতন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তর এবং নূতন সংস্কৃতির পত্তন হইতেছিল। ভারতে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে আধুনিক 'জাতি' গঠনের কাজ শুরু হইয়াছে; সমাজ-জীবনের দিকে দিকে এই প্রেরণা, নূতন সৃষ্টি-ক্রিয়া ও চাঞ্চল্য। এই চাঞ্চল্য বাণিজ্য, শিক্ষাবিস্তার, পুস্তক প্রকাশ. ধর্মসংস্কার, সামাজিক দুর্নীতির বিলোপসাধন. ইত্যাদি ক্রিয়ার ভিতর দিয়া ব্যাপক অভিব্যক্তি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বাংলা দেশে রতিমঞ্জরী. রসমঞ্জরী ইত্যাদি গ্রন্থের পাশাপাশি ধর্মবিষয়ে বাদানুবাদমূলক পুথি, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাকরণ, অভিধান, "পাকরাজেশ্বর," (২) এমন কি, গৃহনির্মাণ সম্পর্কিত পুথি (২১) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা সমাজের সর্বাঙ্গীণ জাগরণেরই লক্ষণ। আর শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেদের জন্য পাঠশালা, স্কুল ও কলেজের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এবং মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে "অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিকা বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোষিকের নিমিত্ত" (২২) যাতায়াত করিতে থাকিলেও, স্ত্রীশিক্ষা শুধুমাত্র সাময়িকপত্রের বাদানুবাদের সামগ্রী ছিল না; এবং অন্যান্য ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সনাতনপন্থী ও রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেব মহাশয়রাও স্ত্রীশিক্ষাব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। অর্থাৎ তাঁহারা "সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে না-পাঠাইয়া, গৃহে শিক্ষক রাখিয়া তাহাদের লেখাপড়া শিখানই বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন।" (২৩) ধর্মীয় বাদানুবাদের ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থিগণ বিক্ষুব্ধ; কেন না তাঁহাদের আত্মরক্ষার শক্তি অপেক্ষা তাঁহাদের উপর আক্রমণের জোর বেশী। তার উপর, সাময়িক পত্রের প্রসার, মুদ্রণালয় স্থাপন, এবং জ্ঞানানুশীলনের জন্য গঠিত আলোচনী সভা তৎকালীন সমাজ-মানসে বিশেষ তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিল। সর্বত্রই যুগ ও সংস্কৃতি বদলানোর হাওয়া, এবং তাহার বিস্ময়কর চেতনা।

এই তরঙ্গের অভিঘাতে ব্যক্তিমনের উদ্বোধন। পূর্বে প্রাচীন সমাজ বিন্যাসের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, সমাজিক কাঠামোর সর্বনিম্ন অঙ্গ ছিল

(২০) সংবাদপত্রে সেকালের কথা; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ ১০৫

(২১) ঐ; প্রথম খণ্ড; পৃ ৮১

(২২) ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৭২

(২৩) ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৪৪২

পরিবার। কিন্তু বর্তমান সমাজ-বিন্যাসে বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ নীতির পরিবর্তে বর্ণ-নিরপেক্ষ সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণীর বিকাশ হওয়ায় সামাজিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও রূপ বদলাইতে থাকে। পরিবারের জায়গায় এককরূপে (unit) ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, এবং ব্যক্তির আচরণেও পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। বর্ণ-পঞ্চায়েৎ-পরিবারের অনুশাসন হইতে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে। ডিরোজিও শিষ্যদের "thinking for themselves" ব্যক্তিমনের এই অবাধ স্বাধীনতার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়, এবং কৌলিন্য-অকৌলীন্য প্রথা বিসর্জন দিয়া বর্ণ-হিন্দুদের বর্ণ-বিগর্হিত বৃত্তি গ্রহণের মধ্যে এই চেতনার বাস্তব প্রকাশ। পূর্বতন সামাজিক বিধিনিষেধ অবজ্ঞাত হওয়ায়,জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে, যে কোন ভাবে যে কোন পরিধিতে প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে ব্যক্তির আর কোন বাধা রহিল না। তাহার কর্মপরিধি এখন সুবিস্তৃত।

ব্যক্তিমনের এই বিস্তৃতির সহিত সমান্তরালভাবে সমাজ-মানসও বিস্তৃতি লাভ করে। গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা-সম্মত সঙ্কীর্ণ, অবরুদ্ধ দৃষ্টিকোণ দূরীভূত হইয়া ব্যাপকতর, বিস্তৃততর, দেশকালের বন্ধনমুক্ত উদার দৃষ্টিকোণ আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য এই রূপান্তর সময়সাপেক্ষ, কিন্তু কিরূপ দ্রুতগতিতে এই রূপান্তর ক্রিয়া চলিতেছিল 'সমাচার দর্পণের' একটি মন্তব্যে তাহা পরিস্ফুট হইবে। 'দর্পণ' বলিতেছেন (জানুয়ারী, ১৮৩০), "আমরা এই বোধ করি যে লোকেরদের পূর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে বারো বৎসরে যখন প্রথম সম্বাদপত্র প্রকাশ হয় তখন আমাদের এই দর্পণগ্রাহকের মধ্যে অনেকেই তিরস্কার পূর্ব্বক আমাদের লিখিতেন যে ২ দেশের নাম পর্য্যন্তও কখন আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই, তত্তদ্দেশীয় সম্বাদ তোমরা কি নিমিত্তে পত্রে প্রকাশ কর। কিন্তু এক্ষণে আমরা অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক দেখিতেছি যে কলিকাতা নগরে এতদ্দেশীয় লোককর্ত্তৃক যে কাগজ মুদ্রিত হয় তাহাতে পৃথিবীর নানাদেশীয় সম্বাদ প্রকাশিত হইতেছে।...বিশেষতঃ কলিকাতায় প্রকাশিত এক সম্বাদপত্রের অনুষ্ঠানে ব্যক্ত হইল যে তৎপত্র সম্পাদক পৃথিবীর নানাদেশীয় সম্বাদ প্রকাশ করিবেন...কিঞ্চিত কালানন্তর আমাদের সম্বাদপত্র মফঃস্বলনিবাসী কোন গ্রাহকের এক লিপি পাওয়া গেল তাহাতে ইহা লিখিত ছিল যে পূর্ব্বোক্ত সম্বাদপত্রে যত দূর দেশীয় সম্বাদ ব্যক্ত থাকে তত্তদ্দেশীয় তত সম্বাদ দর্পণে অর্পণ না করিলে আমি দর্পণ ত্যাগ করিব।" (২৪)

(২৪) ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯৬

রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রেও, ব্যবহারিক রাজনৈতিক আচরণের স্ববিরোধ বাদ দিলে, সমাজ-মানসের বিস্তৃতি লক্ষ্যনীয়। রামমোহন রায়ের মতবাদে তাহা অভিব্যক্ত; তিনি মনে করিতেন, পশ্চিমের রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিলেই তবে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জয়যুক্ত হইতে পারে। আর একমাত্র তখনই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহ একই আদর্শের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন দেখিতে পাইবে। (২৫) গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়, দেশগত অথবা প্রাদেশিক আত্মনির্ভরতাও নয়, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা পার হইয়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথাও তখনকার দিনের চিন্তানায়কদের মনে দেখা দিয়াছে। পরবর্তীকালে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা, সমাজ-আদর্শ, ইত্যাদি গভীরভাবে অনুধাবন করার যে আগ্রহ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শিশিরকুমার ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরও অনেকের মধ্যে দেখা গিয়াছে, তাহাকে রামমোহন রায়ের আদর্শের বিস্তৃতি বলা যাইতে পারে।

ধর্মীয় মনোভাবের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উদার বিস্তৃতি দেখা যায়। রামমোহন রায়ের আমলে এমন কি ব্রাহ্মদের মধ্যেও যে সঙ্কীর্ণতা ছিল (তখন শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ ও উপনিষদ পাঠ করা হইত) (২৬), দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগরের আমলে তাহাও দূরীভূত হয়; এবং সনাতন ব্রাহ্মণসন্তান বিদ্যাসাগরের মধ্যে তাহা পূর্ণাঙ্গ বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৮৫৩ সালে শিক্ষা পরিষদের নিকট তিনি যে বিখ্যাত পত্র প্রেরণ করেন তাহার একস্থানে তিনি বলেন, "কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়াইয়া উপায় নাই। সে সকল কারণের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই।" সমাজ-বিদ্রোহের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম রামমোহনপন্থীদের অবদানের চেয়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদ্যাসাগরের অবদান কম নয়।

রাজনৈতিক আদর্শের এই ব্যাপকতা, ধর্মীয় মনোভাবের এই উদারতা এবং সামাজিক কুপ্রথার ও কুসংস্কারের উপর এই আক্রমণের মূলে একটি মাত্র প্রেরণাই সক্রিয় ছিল। তাহা এই, যুক্তিসম্মত ও বুদ্ধিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমাজকাঠামোর রূপায়ণ। যুক্তিবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা

(২৫) English Works of Raja Rammohan Roy, P. 316—7

(২৬) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃ ৩৫৪

করিতে হইবে। যুগযুগান্তর ধরিয়া যাহা চলিয়া আসিতেছে, যাহা অমোঘ শাস্ত্রবচন বলিয়া কথিত, তাহার প্রশ্নহীন স্বীকৃতি, গ্রহণ অথবা বর্জন, অথবা তাহার নিকট আত্মসমর্পণ আর নয়, যুক্তিবাদের মানদণ্ডে যদি তাহার যথার্থ সার্থকতা ও কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়, তবেই তাহা গ্রহণযোগ্য, নতুবা নয়। এই বিচার ও অনুসন্ধান পদ্ধতি নূতন চিন্তানায়কদের প্রত্যেকের মধ্যেই অল্প-বিস্তর বর্তমান ছিল। এই দৃষ্টিমার্গের বিকাশ সমাজ-মানসের বিবর্তনে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ; কারণ, এই দৃষ্টি হইতে সমাজ, সামাজিক বিন্যাস, সমাজের অন্তর্নিহিত বিধিব্যবস্থা ইত্যাদি নব আলোকে প্রতিভাত হয়। পুরাতনকেও নূতনভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া মানুষ ভবিষ্যৎকে নূতনভাবে সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হয়। যাঁহারা সে যুগে এই সৃষ্টিশীল তরঙ্গে অবগাহন করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা ইহার গতি নিরূপণে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পাণ্ডিত্য দক্ষতা, বিষয়নিষ্ঠ একাগ্রতা এবং ব্যাপকতা আজও আমাদের মনে বিস্ময় জাগায়।

কিন্তু এই সামাজিক পুনরুজ্জীবনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক জটিলতা ও বৈচিত্র্যের জন্যই উল্লেখযোগ্য। তাহা এই, ভারতের নূতন সাংস্কৃতিক নির্মাতাগণ অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু, আর হিন্দুত্বের চেতনা সঙ্কীর্ণতার পঙ্কিল স্রোতে প্রবাহিত না করিয়াও কোনও-না-কোন ভাবে তাঁহাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছে। ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেয়ঃবোধ ও বাস্তববোধের বিকাশের পক্ষে সেকালীন সমাজ-পরিবেশ তৈরী ছিল না। বৃটিশ বিজয়ের প্রথম পাদ হইতেই হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে, এবং তাহারাই ভারতে নূতন সংস্কৃতির পত্তন করে। এই সময়ে মুসলমান সমাজের জাগরণের অথবা সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়ার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও এবং নূতন সংস্কৃতির প্রবর্তকদের সামাজিক ভিত্তি ফাঁকা হইলেও তাহাদের সর্বগ্রাসী সৃষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে শুভ ভবিষ্যতের সৃষ্টি হইতেছিল। এই সৃষ্টিচেতনা হইতেই তাঁহাদের আশ্চর্য প্রাণময়তা। আর ইহা একান্তই স্বাভাবিক যে, প্রথম পরিচয়ে ইহা মাত্রাহীন। আর ইহাও নিঃসন্দেহ, এই ভবিষ্যৎ একান্তই তাঁহাদের অর্থাৎ বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কিন্তু ইতিহাসের বিবর্তনধারার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজ-বিপ্লবের ফলে যখনই কোন নূতন শ্রেণী নিজস্ব সমৃদ্ধি এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়িয়া তোলার কাজে অগ্রসর হইয়াছে, তখন সমাজের অন্যান্য শ্রেণী, অন্ততঃ সাময়িকভাবে

হইলেও, সেই সমৃদ্ধির কিঞ্চিৎ স্পর্শ লাভ করে, এবং বাস্তব স্বার্থচেতনা যে রূপান্তর সাধনের প্রেরণায় সেই শ্রেণী-মানসকে উদ্বুদ্ধ করে, সেই রূপান্তরিত মানসই পরিণামে সেই শ্রেণীর একক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিয়া জনসাধারণের বৃহত্তম কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। যেমন ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবে ফ্রান্সের বর্ধিষ্ণু বণিকশ্রেণী সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জিগির তুলিয়া সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সংগ্রামের বিজয়ে তাহাদের শ্রেণীস্বার্থই প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ইহাতে ফ্রান্সের কৃষি-মজুররাও সামন্ত সম্পর্কের কবল হইতে মুক্ত হয়, এবং সাধারণভাবে সর্বমানুষের মানবতা স্বীকৃত হয়। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন কায়েম হওয়ার অল্পকাল পরেই এই আদর্শ বর্জিত হয়, এবং পরবর্তীকালে বঞ্চিত শ্রমজীবীরা সেই সাম্যের জিগিরকেই অবলম্বন করিয়া আধুনিক সাম্যবাদী আন্দোলন গড়িয়া তোলে। আমাদের বর্তমান আলোচনায়ও একথা বলা যায়। রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সামাজিক বা নাগরিক অধিকার, সমাজবিন্যাসের ভিত্তি ধর্মাচরণের যৌক্তিকতা, ইত্যাদি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা, এবং ব্যবহারিক সুবিধা আদায়ের আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থসমৃদ্ধির সহায়তা করিলেও, পরোক্ষে ইহা এমন সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যাহার সৃষ্টিধর্মী প্রভাব গণজীবনেও অনুভূত হয়। ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতি সংস্কার, শিক্ষার বিস্তার, ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যাপক তাৎপর্য স্মরণ করিলেই তাহা উপলব্ধি করা যাইবে।

এভাবেই ভারতীয় সমাজ ভবিষ্যতের পথে পদক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে, এবং ভারতীয় মানসে বিশ্বমানসের বিচিত্র ঐশ্বর্য নূতন সম্ভাবনা লইয়া আন্দোলিত হইতে থাকে। পশ্চাদগমনের পথ আর উন্মুক্ত নাই, এই কালে সর্ববিধ সামাজিক ক্রিয়ার সুনিশ্চিত অঙ্গুলি নির্দেশ ভবিষ্যতের পানে।

ছয়

এই নব জাগরণ ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বাংলা কাব্য,গদ্য ও নাট্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রূপান্তর সাধিত হয়। সামাজিক আলোড়নের মধ্যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের আবির্ভাব, এবং অতি অল্পকালের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ইহা বিকাশলাভ করে। ইতিপূর্বে নব জাগরণের যে, চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য এই যে, এখানে স্থানে ও কালে প্রসারিত অর্থাৎ

বাস্তব জীবন-চেতনা প্রবল।) এই যুগে বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের মধ্যেও এই লক্ষণ সুস্পষ্ট। অবশ্য এই বিবর্তনের ইতিহাস এত বিচিত্র ও ঐশ্বর্যপূর্ণ যে সংক্ষেপে তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব ; তথাপি, বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-বিবর্তনে ইহার দান অনস্বীকার্য বলিয়া এবং বঙ্কিমচন্দ্র এই সাহিত্য পরিবেশে গড়িয়া-ওঠা শিল্পী বলিয়াই এই বিবর্তনের লক্ষণগুলি শুধু আলোচিত হইল।

বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রথমে ঈশ্বরগুপ্ত ও পরে মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে এই জটিল সমাজপ্রবাহ মূর্ত ও অভিব্যক্ত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ভারতচন্দ্রের ঐতিহ্যে গড়িয়া-ওঠা কবি, এবং যদিও তাঁহার কাব্যে সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই, এবং যদিও "শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায় তাহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়," (বঙ্কিমচন্দ্র) তথাপি কাব্যের বিষয়বস্তুর পরিধি বিস্তৃত করিয়া এবং ইহাকে প্রতিদিনের পরিচিত পৃথিবীর ভাবপ্রকাশের বাহন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা কাব্যসাহিত্যে, সম্ভবত নিজের অগোচরে, গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর সাধন করিয়াছিলেন। কারণ, এই রূপান্তরের মধ্যে আছে স্থানে ও কালে বিধৃত জীবন চেতনা, আছে ব্যবহারিক জীবনের, আত্মনিরপেক্ষ পৃথিবীর স্বীকৃতি। আর তাঁহার হাসি ও বিদ্রূপের মধ্যে আছে সেই অনুপ্রেরণা যা জীবনকে, সমাজকে কল্যাণধর্মের আদর্শে সৃষ্টি করিতে চায়। তাঁহার "বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া" "দেশের কুকুর" ধরিয়া "স্নেহ" করার অভিলাষের মধ্যে সমকালীন ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের ছাপ সুস্পষ্ট। এই সম্পর্ক যে বিচলিত হইয়াছে, এবং ভারতীয়দের মধ্যে যে আত্মচেতনার ভাব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহার স্বাক্ষর ইহাতে রহিয়াছে। অর্থাৎ, মোটামুটিভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যে বিষয়গত জীবন প্রাণ পাইয়াছে।

পক্ষান্তরে, মাইকেলের কাব্যে আছে সমাজ-প্রবাহের আত্মগত দিকের প্রতিচ্ছবি। তাঁহার "মেঘনাদবধ কাব্য"কে একটি অখণ্ড মানস পরিমণ্ডলের চিত্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কবি-মানস সমকালীন সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং বস্তুজগৎ হইতেই রস আহরণ করিয়াছে। সেই পরিবেশে দেখিতে পাই, ব্যক্তি তাহার অন্তঃপুরের অপরিমিত শক্তির সন্ধান লাভ করিয়াছে, এবং সেই শক্তির গরিমায় নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মানবতাকে সে বাস্তব সম্পর্কের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। সৃষ্টির এই অনুপ্রেরণাই মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঔদার্য ও মুক্তির মধ্যে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা কাব্যপ্রবাহের

এই দ্বি-মুখী সম্প্রসারণ—ঈশ্বর গুপ্তে ইহার বিষয়গত এবং মাইকেলে ইহার আত্মগত স্ফূর্তি—চঞ্চল সমাজ-মানসের স্বচ্ছন্দ অভিপ্রকাশ।

বাংলা নাট্যসাহিত্যেও বাস্তব পৃথিবীর এবং পরিবর্তনশীল সমাজ সম্পর্কের চেতনা উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের "নাটক" আখ্যায়িত আদিরসাত্মক অথবা উপদেশাত্মক কাহিনী অথবা নক্‌সা ইত্যাদি হইতে বঙ্কিম-চন্দ্রের সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৮৬০ সালের পূর্বে রচিত ও অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্ব্বশী', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক', মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ইত্যাদিতে রূপান্তর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের অধিকাংশ নাটকই সমকালীন সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের রসে সিঞ্চিত। স্বভাবতই ব্যক্তির একক জীবনের সংকট অপেক্ষা (তখনও ব্যক্তিজীবনের সংকট বিশেষ আত্মপ্রকাশ করে নাই) সমাজ-জীবনের সংকটই এই সব নাটকে রূপায়িত হইয়াছে। এই সংকটের রূপ এবং অন্তর্নিহিত সত্তা যাহাই হউক না কেন, সমস্যাটা নিতান্তই বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ। সামাজিক প্রাণী হিসাবে তাহা এড়াইবার কোন উপায় নাই। সুতরাং, প্রকৃত নাট্যরস এই সব নাটকে যতই অনুপস্থিত থাকুক না কেন, ইহাদের রচয়িতাগণ যে স্থানে বিধৃত এবং কালের ধারায় সঞ্চরণশীল, তাঁহাদের বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যেই তাহার পরিচয় রহিয়াছে।

গদ্য সাহিত্যের আবির্ভাব ও বিবর্তনের মধ্যেও এই একই লক্ষণের অভিব্যক্তি। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের গদ্যপ্রচেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' পর্যন্ত মানবিকতা বোধের বিস্তৃতি এবং বাস্তব পৃথিবীর চেতনা ক্রম-পরিণতি লাভ করে। প্রথম যুগের তালহীন, সুরহীন, সংস্কৃতানুগামী গদ্যে গতি ছিল না ; যেন তাহা স্থানে কালে বিস্তৃত নয়, কালের ঊর্ধ্বে। তাহা যেন অল্প লোকের উপভোগের সামগ্রী, বহুর মধ্যে সেই রস ভাগাভাগি করা চলে না। কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন সাময়িকপত্রের আবির্ভাবের ফলে এবং সাধারণভাবে সামাজিক গতিশীলতার প্রভাবে, এবং আরও পরে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের সংস্কারের ফলে ব্যক্তির আত্মবোধ আত্মকেন্দ্রিকতা বর্জন করিয়া বাহিরে প্রসারিত হইতেছিল, তাহার প্রীতিবোধ নিজেকে অতিক্রম করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়ার চরম অভিব্যক্তি প্যারীচাঁদ মিত্রের

'আলালের ঘরের দুলাল'-এ। বিষয়বস্তুর ঔদার্য এবং ভাবের সর্বগামিতার বিচারে চলতি গদ্যরীতির বিরুদ্ধে প্যারীচাঁদ মিত্রের বিদ্রোহ বিস্ময়কর। ব্যক্তি বাহির বিশ্বে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছে, অথবা দিতে চাহিতেছে; সুতরাং ভাষাগত ও ভাবগত কোনরূপ কৌলীন্য অথবা কার্পণ্য তাহার নাই। অতি সহজেই এবং বিশেষ আনন্দের সহিত আর সকলের সাহচর্যে সে অন্তরের রস উপভোগ করিতে পারে, তাহার নিজস্ব মনোজগতের সংবাদ বিতরণ করিতে পারে। নিজেকে প্রসারিত করিতে যাইয়া সে বাহিরকেও নিজের অন্তরে গ্রহণ করিয়াছে, বাহিরের সঙ্গে তাহার অটুট সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছে। অর্থাৎ, ব্যক্তি-মানসে প্রতিদিনের পথ-চলা পরিমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইহা হইল গদ্যে সমাজ-প্রবাহের বিষয়গত চেতনার দিক; কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন মধুসূদনে সমাজ আবর্তের অপর দিক অর্থাৎ আত্মগত দিক—ব্যক্তির স্বপ্রকাশের ও সৃষ্টিধর্মী অনুরাগের দিক—মুক্তির আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল, গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে এই দিকটার পরিচয় এক রকম অনুপস্থিত বলিলেই চলে। গদ্যসাহিত্যের এই অসম্পূর্ণ চিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল।

শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন এই বিষয়-চেতনা, স্থান-কাল চেতনা বিকাশ লাভ করিতেছিল, যখন আত্মপ্রকাশের চাঞ্চল্য সমাজের সর্বাঙ্গে অনুভূত হইতেছিল, এবং যে মুহূর্তে সামাজিক ভারসাম্য রীতিমত ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে, সেই যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম ও সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি : প্রথম পর্ব

পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। এই পরিবেশের সহিত তাঁহার জীবনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র সরকারী চাকুরে ছিলেন; স্বল্প বেতনের চাকুরী হইতে পরবর্তীকালে তিনি ডেপুটি কলেক্টরের পদে উন্নীত হন। যাদবচন্দ্রে ছাড়া পরিবারের অন্যান্যরাও দায়িত্বশীল সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং নিজের পরিবারের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির নব-রূপায়ণের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ছোট বেলায়ই দুই একটি ইংরেজ পরিবারের সহিত মেলামেশা করার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল; মেদিনীপুর অবস্থানকালে ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক টীড্ সাহেব এবং তাঁহার পত্নী বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মলেট সাহেবের গৃহেও বঙ্কিমচন্দ্রের যাতায়াত ছিল। তাঁহাদেরই সুপারিশে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী পাঠের সূত্রপাত। এই প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ হইতে শিশু বঙ্কিমের মনে ইংরেজ-চেতনা এবং ইংরেজের অনুকরণ-প্রেরণা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর ইংরেজরাই যে এদেশের ভবিষ্যৎ, একথা সে যুগের আকাশে বাতাসে ছড়ানো ছিল।

সুতরাং, ইংরেজের অধীনে চাকুরী করিয়াও যাঁহারা সযত্নে স্বধর্ম রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, যাদবচন্দ্রকে তাঁহাদেরই একজন বলিয়া কল্পনা করা কঠিন নয়; এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারও সেই সব পরিবারের অন্যতম যাহারা সরকারী অনুগ্রহের ছায়ায় থাকিয়া শিক্ষা সংস্কৃতি ও প্রগতির চর্চায় অগ্রসর হয়। এই সব পরিবারে আদর্শগত সংঘাতের ধাক্কাটাও লাগে বেশী। বঙ্কিম-চন্দ্র এমন একটি পরিবারের কৃতী সন্তান; আর সেজন্য এই সংঘাতের রসটাও তিনি নিঃশেষে আহরণ করিয়াছেন।

পূর্ব আলোচনায় ইহা প্রতিভাত হইয়াছে যে, বিত্তশীল অভিজাত সম্প্রদায় ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিজেদের বৃটিশ ভারতীয় শাসন কাঠামোর

অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে ভাবিতে শিখিয়াছিলেন। সুতরাং ইংরেজ রাজপুরুষ অনুসৃত সামাজিক আচরণ আয়ত্ত করার প্রবণতা তাঁহাদের মধ্যে ছিল ; আর সেই আত্মীয়তাবোধের চেতনা হইতেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যকে একান্ত আপনার করিয়া লওয়ার আগ্রহ উদ্যম দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, এই প্রচেষ্টায় তাঁহারা অসামান্য সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য ছিল তাঁহাদের মানস-জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল, আর ইংরেজী ভাষাকেই তাঁহারা মাতৃভাষা বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ইংরেজীর প্রতি অপরিসীম অনুরাগ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিরাগের একটি প্রধান কারণ এখানে আবিষ্কার করা যায় (অবশ্য বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুদার মনোভাবের অন্যান্য কারণও ছিল)।

প্রথম বয়সের বঙ্কিমচন্দ্র এই সাধারণ আদর্শের ব্যতিক্রম ছিলেন না। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার নিজের উক্তিতেই অভিব্যক্ত রহিয়াছে। ১৮৭০ সালে বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনে তাঁহার "A Popular Literature for Bengal"-শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন, "আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করিতেও অভিলাষী নহেন।......যে তীব্রবুদ্ধি, তেজস্বী বাঙ্গালী যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পারে ; সে মনে করে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা করা হীনবৃত্তি মাত্র..." (সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ)। এই উক্তি হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মনোভাব অনুমান করা সহজ। সুতরাং ছাত্রাবস্থায় 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ এবং ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত "ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস"-কাব্যগ্রন্থ ও ইহার ভূমিকায় প্রকাশিত তাঁহার বাংলা গদ্যরচনার মধ্যে শক্তির পরিচয় থাকিলেও এই রচনার জন্য আত্মশ্লাঘা লাভের কোনও কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। এই সময়ে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ কোন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না। এবং তৎকালীন বাংলা সাহিত্য বিশেষ করিয়া বাংলা গদ্য কিভাবে অভিনব ঘাত-সংঘাতে রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছিল, তাহার বিচিত্র প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব না করিয়া উপেক্ষাই করিয়াছেন। (২৭) আর ১৮৮৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের

(২৭) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গদ্য রচনা সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের আলোচনা—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ"—সুরেশ সমাজপতি সঙ্কলিত ; পৃঃ ১২৮-৩৩

'জীবনচরিত ও কবিত্ববিষয়ক প্রবন্ধ'-এ "নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়", একথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিলেও নিজের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পাদে প্রভাকর-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করার অভিপ্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। কারণ, বাংলা সাহিত্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সে যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিরতিশয় সন্দিহান ছিলেন; আর অর্ধশিক্ষিত লেখকরাই বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেন ও বাংলা লেখেন, এইরূপ একটা মনোভাবও তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের মত শিক্ষিত পণ্ডিতের পক্ষে বাংলা চর্চা তখন "হীনবৃত্তি-মাত্র" ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মধ্যে ইতিমধ্যেই যে আত্মচেতনা 'বকাশলাভ করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের মানসজীবনের অপরিপক্কতার জন্যই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক. তাঁহার সে চেতনা তখন পর্যন্তও বিকশিত হয় নাই।

তাই ১৮৬০ সালে খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি কার্যের অবসরে তাঁহাকে ইংরেজীতে Rajmohan's Wife উপন্যাস রচনায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। ১৮৬১ সাল পর্যন্ত এই রচনা চলে, এবং ১৮৬৪ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রে ইহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮৬৪ সালের পূর্বেই বঙ্কিম-মানসে এক আকস্মিক রূপান্তর সাধিত হয়,– অবজ্ঞাত অশিক্ষিতের বাহন বাংলা শিক্ষিতের বাহন ইংরেজীর আসন অধিকার করিয়া বসে। পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, বাংলার স্থায়িত্ব ও ব্যবহারিক কার্যকারিতা সম্পর্কে সাধারণভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন; বাংলার চর্চা তাঁহার নিকট ছিল অপমানকর। এই রূপান্তরের ফলে সেই বাংলাই চিরস্থায়িত্বের ও সত্যের দাবী লইয়া বঙ্কিম-মানসে আবির্ভূত হয়। বঙ্কিমের মনে ইংরেজী-বাংলার যে বিরোধ ছিল, চিরদিনের জন্য সেই বিরোধের মীমাংসা হইয়া যায়। তিনি বাংলাকেই তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের কথা বলার বাহন নির্বাচন করেন। এই মীমাংসার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত অত্যন্ত উৎসাহিত ও আন্দোলিত হইয়াছিলেন। তাই অতি দ্রুত তিনি Rajmohan's Wife-এর বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করেন; অবশ্য অসমাপ্ত অবস্থায়ই তিনি অনুবাদ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু মানসিক আন্দোলন স্তিমিত হয় নাই, তিনি নূতন সৃষ্টি প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠেন; এই আন্দোলনের ফসল 'দুর্গেশনন্দিনী'।

কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া, কাহার প্রভাবে অথবা কাহার অচেতন ইঙ্গিতে এই বিস্ময়কর যুগান্তকারী রূপান্তর সাধিত হয়, তাহা আজ বিনির্ণয় করা কঠিন। ছাত্র জীবনে দীনবন্ধু মিত্রের "মানব চরিত্র" শীর্ষক একটি কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ মুগ্ধ ও প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন ; ১৮৫৮ সালে যশোহরে তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সাহচর্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ সালে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রভাব বঙ্কিমের মানসরূপায়ণে কতখানি সাহায্য করিয়াছিল, তাহা আজ কল্পনার বস্তু। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?' গোপনে বঙ্কিমকে বাংলা-সচেতন করিতেছিল কিনা, তাহাই বা আজ কে বলিবে ? ১৮৫৯ সালে 'নীল হাঙ্গামা' তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল কিনা তাহা অজ্ঞাত। কুমার ও কালীগঙ্গার তীরে যশোহর, নদীয়া ও পাবনা জেলার সহস্র সহস্র উৎপীড়িত নীল-চাষীর করুণ আর্তনাদ 'প্রভু, আমাদের দ্বারা যেন আর নীল চাষ করান না হয়' (১৮৬০ সালে সরকারী নীল কমিশনের নিকট তৎকালীন লেঃ গভর্ণর স্যার জন পিটার গ্র্যাণ্টের সাক্ষ্য) তাঁহার সংবেদনায় আঘাত দিয়াছিল কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। ১৮৬১ সালে পাদ্রী লং-এর কারাদণ্ড এবং মরেলগঞ্জের নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দমনে স্বয়ং বঙ্কিমের সক্রিয় অংশগ্রহণ (২৮) তাঁহাকে বিচলিত ও ভবিষ্যৎ সংগ্রামের সিদ্ধান্তে উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিল কিনা, তাহা অনুমান সাপেক্ষ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ' তাঁহাকে বাংলা ভাষার অপরিমেয় সম্ভাবনার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল কিনা, তাহাও অপরিজ্ঞাত। তাহা ছাড়া, রাজনারায়ণ বসুর জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যদের 'good night' না বলিয়া "সুরজনী" বলার (২৯) সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়াছিল কিনা তাহাও অনিশ্চিত। কিন্তু এই সব দৃষ্টান্তে সমাজ-মানসের দিক পরিবর্তনের আভাস রহিয়াছে, এবং প্যারীচাঁদ মিত্র-দীনবন্ধু-মাইকেলের সার্থক প্রচেষ্টার মধ্যে সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রহিয়াছে যে, বাংলা ভাষার অনাদৃত জমিতে আবাদ করিলেও ফসল ফলে। সুতরাং আবাদে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, বঙ্কিম-মানসে এমনি একটা চেতনার বিকাশ কল্পনা করা অসঙ্গত নয়।

(২৮) বঙ্কিম জীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃঃ ৯০-৯৩

(২৯) আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু ; পৃঃ ৮৩

ইতিপূর্বেই অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবন আরম্ভের পূর্বেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বিকাশের অনুকূল পটভূমি রচিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত গতিহীন, যতিহীন, অসংগঠিত শব্দসমন্বয়ের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া লিখিত বাংলা গদ্যে গতি ও ভাব-মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছিলেন। আর প্যারীচাঁদ মিত্রও তাঁহার বিদ্রোহের ভিতর দিয়া লিখিত ভাষাকে সর্বজনগ্রাহী ও স্বাভাবিক করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিদ্রোহ বিদ্রোহ মাত্র, বিপ্লব নয়; ইহা অসম্পূর্ণ। কারণ, তাঁহার গদ্যরীতি বাস্তব জীবনের অনুগামী হইলেও ইহাতে ভাষাগত বিশুদ্ধতা ও গভীরতা সর্বদা রক্ষিত হয় নাই; সংস্কৃতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি ঠিক বিপরীত প্রান্তে আসিয়া দাঁড়ান। সংস্কৃতানুগামী ভাষা আত্মগত ও বিষয়গত উভয়বিধ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহার সুর ছিল এমন এক স্তরে বাঁধা যাহার ঝংকার নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোজগতে সাড়া জাগাইত না। ইহাতে আড়ম্বর ছিল, কিন্তু প্রাণ ছিল না। ইহার জগৎ ছিল প্রতিদিনের পরিচিত জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। সেই কালে, সেই ক্ষণে, যে মানুষ আপনার মধ্যে নূতন জীবনের স্বাদ অনুভব করিতেছিল, এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবকে রূপায়িত করিয়া যে মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল, সংস্কৃতা-নুগামী ভাষা তাহার ভাষা ছিল না। এমন কি বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্কারের পরেও ইহা জীবন্ত মানুষের ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে, প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালী ভাষা অতিরিক্ত খাদে নামিয়া যায়, যাহা উপস্থিত প্রয়োজনের পক্ষে অনুকূল ছিল না। সুতরাং, বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্তের সংস্কার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের বিদ্রোহ, কোন রীতিতেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনোজীবনের সুর ঝংকৃত হইয়া ওঠে নাই। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল এই উভয়বিধ ভঙ্গীর এক অপূর্ব সমন্বয়ের; কারণ, এই সমন্বয়কেই নির্দিষ্ট স্তরে বাঁধিয়া ভাষার সহিত "নব-যৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন" (৩০) সম্ভবপর ছিল। অর্থাৎ, ভাষাকে জীবন্ত মানুষের অভিব্যক্তিতে পরিণত করার প্রয়োজন ছিল।

ইংরেজীতে উপন্যাস রচনার আশা পরিত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অদ্ভুত দূরদৃষ্টির সাহায্যে ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ১৮৯২ সালে "বাঙ্গলা সাহিত্যে ৺প্যারী-চাঁদ মিত্রের স্থান" প্রবন্ধে তিনি সে সময়কার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, "বাঙ্গলা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায়

(৩০) উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের; বঙ্কিমচন্দ্র, আধুনিক সাহিত্য।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।" বঙ্কিমচন্দ্র সেই আদর্শ বাংলা সৃষ্টি করেন। তাঁহার Rajmohan's Wife-এর অসম্পূর্ণ অনুবাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, প্রথম প্রচেষ্টা 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই বঙ্কিমচন্দ্র নির্দিষ্ট সমাধানে উপনীত হন। এখানে ভাব ও বিষয়ভেদে তাঁহার ভাষার রকমফের দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে সুউচ্চ ভাব এবং রসঘন বীরত্বের বর্ণনা রহিয়াছে, সেখানে তাঁহার শব্দচয়ন ও ভঙ্গী এমন হইয়াছে যে, সহজেই একটা অনায়াস আভিজাত্য ধরা পড়ে; কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তাঁহার শব্দ নির্বাচন সংস্কৃতানুগামী হইয়া থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র এমন ছন্দস্রোত সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন যে কোনভাবেই ভাষার গতি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আবার, যেখানে লঘু বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে সেখানেও তাঁহার শব্দ নির্বাচন ইহার অনুকূল হইয়াছে, এবং ভাষাও অনুরূপ চটুল গতি লাভ করিয়াছে। আর উভয়ের সংমিশ্রণ দ্বারা তিনি সহজ স্বাভাবিক গতি ও অভিব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

কিন্তু শুধুমাত্র ভঙ্গীর দিক হইতেই নহে, বিষয়বস্তুর এবং সত্তার দিক হইতেও 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পসৃষ্টি ও কাহিনী রচনার প্রচলিত আদর্শ, রীতিনীতি ও নিয়মকানুন উপেক্ষা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করেন, এবং শুধু নিজেকে নয় শিক্ষিত বিদ্যাগর্বী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেও অপরিচয়ের অন্ধকার হইতে আবিষ্কার করেন। পক্ষান্তরে, শিক্ষিত সমাজও 'দুর্গেশনন্দিনী'তে স্বীয় মানসের রূপায়ণ লাভ করিয়া বিস্মিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আবির্ভাব নিছক আবির্ভাব নয়, তিরোভাবও। ইংরেজী রচনায় সিদ্ধহস্ত, কর্মকুশল, সরকারী কার্যে পারদর্শী যে যুবকটি নিজেকে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের অঙ্গ কল্পনা করিয়া ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন রচনায় মসগুল ছিল, 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে সে অচেতন সমাধি লাভ করে, এবং নবজীবনের গৌরবে যাঁহার আবির্ভাব, তিনি আর যাহাই হোন, Rajmohan's Wife রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র নন। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হওয়ার ফলে নূতন ভাব-জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই ভাব-জগতের সহিত সমাজ-জগতের সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছে। নূতন পরিবেশে নূতন সম্পর্কের জন্ম, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-সত্তারও নবরূপায়ণ। ইহার পর হইতে ডেপুটি জীবনের ধরাবাঁধা গতানুগতিক তালে তাঁহার জীবন

আর প্রবাহিত হইবে না; শিল্পী তাঁহার সৃষ্টির মাধ্যমে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন, পাঠক সমাজের অনু-পরমানুতে সঞ্চার করিয়াছেন এক অভিনব ভাব-তরঙ্গ আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সেই সমাজের সহিত নূতন সম্পর্কে আবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং সমাজ যেমন তাঁহার সৃষ্টির স্পর্শে আন্দোলিত হইয়াছে, শিল্পীকেও তেমনি এই সম্পর্কের আঘাতে সঞ্চালিত হইতে হইবে, এবং নূতন ধারায় বাঁক লইতে হইবে। শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন কলাকৌশল, ও কথা বলার ভঙ্গী স্বীকৃত হইল, 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পূর্বে যাহাদের কোন স্বীকৃতি ছিল না। শিল্পীর কল্পনার স্বাধীনতাও এবার স্বীকৃত হইল। আর সমাজ-জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ও ভাবের মধ্যে এমন একটি সংবেদনশীলতা অথবা emotional tone, এবং কাহিনীর মধ্যে এমন একটি সংকেত বা reference-এর সহিত পরিচিত হয় যাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং ইতিপূর্বে যাহার কোনরূপ স্বাক্ষর ছিল না। ইহাতে যে সত্য চিত্রিত ও অভিব্যক্ত হয়, তাহা শুধুমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সত্য নয়, অথবা বিশেষ কোন ব্যক্তির সত্যও নয়, ইহা এমন একটি সংমিশ্রণ যাহা অংশত ও বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তি বিশেষের হইলেও ব্যাপক অর্থে ইহা সকলের। অর্থাৎ, উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম জীবনের জটিল ও ব্যাপক সত্য সাহিত্যের অভিব্যক্তি লাভ করে; এবং আত্মোপলব্ধির সংগ্রামে নিয়োজিত মানুষ অকস্মাৎ নিজেকে ইহাতে প্রতিফলিত ও সংশ্লিষ্ট দেখিতে পায়। সুতরাং তাহার জীবনের গতানুগতিক সম্পর্কেরও রূপান্তর ঘটে। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পূর্বে সে যাহা ছিল, প্রকাশের পরে সে আর তাহা নয়; তাহার জীবনের সত্তা ও সম্পর্ক পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, সে নতুন, সে অভিনব।

'দুর্গেশনন্দিনীর' প্রকৃতি ও সত্তা বিশ্লেষণ করিলে ইহা আরও স্পষ্ট হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে "ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ইতিবৃত্ত নয়, খাঁটি উপন্যাসও নয় - ইহা রোমান্স। উপন্যাসের উপজীব্য এমন কিছু যাহা আমাদের অন্তরের বাইরে, যাহা মনোজীবন হইতে স্বতন্ত্র। ইহা কাব্যের বিপরীত ধর্মী। কাব্যের উৎস কবিমানসের একক কেন্দ্র, কবি বাহির বিশ্বকে আপনার অন্তরে আকর্ষণ করেন। কিন্তু উপন্যাসের উৎস ঔপন্যাসিকের একক মানস-কেন্দ্র নয়; তিনি বাহির বিশ্বে নিজেকে বিস্তৃত করিয়া বহু উৎস হইতে রূপ ও রং সংগ্রহ করেন। তাই উপন্যাসের বিশাল পটভূমিতে আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করিতে

পারি, এবং আমাদের বাইরের পৃথিবীর পর্যালোচনা করিতে পারি। সুতরাং উপন্যাসের স্বাভাবিক প্রকৃতি এই যে, ইহাতে বাস্তব জীবন হইতে উপকরণ আহরণ করিয়া পরিবেশের বিরুদ্ধে সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির সংগ্রামের কাহিনী প্রতিফলিত করিতে হয়। কিন্তু উপন্যাস যে অর্থে বাস্তব, রোমান্স সে অর্থে বাস্তব নয়; ইহাতে কাব্যের গুণ সুরক্ষিত। জীবনের গদ্য এবং কাব্য উভয় সুরের অপরূপ সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে ইহার সৃষ্টি। ফলে, রোমান্সে আমরা যেমন বাহিরের পৃথিবীর সহিত পরিচিত হই, তেমনি আবার আমাদের মনের অন্দর মহলেরও সংবাদ পাই; কাব্যের মত, আংশিকভাবে, ইহা বাহির বিশ্বকে আপনার মধ্যে আকর্ষণ করে। এই গুণের ফলেই ইহা উপন্যাস হইতে স্বতন্ত্র। উপন্যাস ব্যক্তিকে তাহার বর্তমান জগতে, বাস্তব সংগ্রামের পরিসরে প্রতিষ্ঠিত করে, রোমান্স ব্যক্তিকে তাহার বর্তমান সম্পর্কের মধ্যে প্রকাশিত করে না, প্রতিষ্ঠিত করে তাহার অতীত গৌরবের মধ্যে। সুতরাং রোমান্স ঠিক বাস্তব বিরোধী বা অবাস্তবও নয়। ইহা বাস্তবকে সেই রং-এ ও সৌন্দর্যে পরিমণ্ডিত করিতে চায় শুষ্ক বাস্তবে যাহার স্বাক্ষর নাই।

রোমান্সের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে কাব্যের গুণ বর্তমান বলিয়াই উহাতে একটি পূর্ণাঙ্গ মানস-চিত্র অভিব্যক্তি লাভ করে। প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্পর্কে শিল্পীর যে মনোভাব সেই মনোভাবই এখানে চিত্ররূপ গ্রহণ করে। কোন শিল্পীই বাস্তবের দৈন্যকে স্বীকার করিতে পারেন না। তাই বাস্তবকে সংস্কার করা বা রূপান্তর করার চেতনা একটা বিশেষ রূপ লইয়া শিল্পীর মনে সংগঠিত হইতে থাকে। বাস্তব এই বিশেষ রূপে পরিবর্তিত হউক, শিল্পী-মনের এই আকৃতি অতীতের পরিমণ্ডলে আদর্শ পাত্র-পাত্রী ও পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া প্রকাশিত হয়। শিল্পী তাঁহার আকৃতিকে প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ কল্পনার সাহায্যে আদর্শ বাস্তব সৃষ্টি করিয়া যেন সেই বাস্তবের প্রতিষ্ঠার পথ সহজ করিয়া তুলিতেছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' রোমান্স; অর্থাৎ ইহাতে কাব্য এবং কাহিনী উভয়ের সুর অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে; এবং শেষাশেষি ইহাতে বাস্তবকে কল্পনার ঐশ্বর্য ও আদর্শ অনুযায়ী রূপান্তরিত করার অচেতন আকৃতিও বর্তমান। সার্থক ভাব, ভাষা ও মানস পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নূতন ঐতিহ্য গড়িয়া তোলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ঐতিহ্যেরও সমাধি হয়। গদ্য সাহিত্যে সমাজ প্রবাহের আত্মগত দিকের যে অভাব ইতিপূর্বে ছিল, 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাবে

তাহা দূর হয়; এবং গদ্য সাহিত্যে সমাজ-জীবনের পরিচয় পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসে তখন আত্মোপলব্ধির বাণ ডাকিয়াছে; নানাবিধ বর্ণে, বৈচিত্র্যে ও ভাবপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা, অজানাকে জানা, দুষ্প্রাপ্যকে পাওয়ার আগ্রহ তখন বাংলা ও সারা ভারতের নূতন মধ্যবিত্ত সমাজকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাষ্ট্রীয় জীবন, জাতীয় শিল্প ইত্যাদি সমস্ত বিভাগেই নিজেকে সম্প্রসারিত করার প্রেরণা পথ-না-পাওয়া ঝর্ণাধারার মত ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সংবেদনশীল মন সেই সম্ভাবনার আবেগে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে; বহুদিনের জমানো অবসাদ কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে; শীতের শৈথিল্যের উপর বসন্তের স্পর্শ লাগিয়াছে। কিন্তু পথ তখনও অবরুদ্ধ। ব্যবহারিক জীবনের মতো সাহিত্য জগতের স্পন্দনও অতিশয় ক্ষীণ; "সাহিত্যর ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল।"(৩১) সুতরাং আত্মোপলব্ধির জন্য প্রথম যে আত্মজ্ঞানের আবশ্যক, সাহিত্যে তাহার কোন পরিচয় ছিল না। এই নূতন চেতনাকে প্রতিফলিত করার দায়িত্ব সাহিত্য পালন করিতে পারে নাই।

সেই সাহিত্য এই নূতন মানুষ এবং তাহার মানসপটের সংবাদ রাখিত না। 'দুর্গেশনন্দিনী'র অসামান্য সাফল্য এবং সার্থকতা এজন্যই বিস্ময়কর যে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই নূতন মানুষকে আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি শুধু আবিষ্কারই করেন নাই, ক্ষীণভাবে হইলেও, সেই মানুষকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে রাখিয়া বিচার করার এবং ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণে তাহার কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সমাজ-মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তাহার বর্তমান অস্বীকৃত, কিন্তু তাহার অতীত নিজস্ব মহিমায় উজ্জ্বল। সুতরাং, অতীতের চেতনা (যদি ইহাতে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়) তাহাকে ভবিষ্যৎ গড়ার অনুপ্রেরণায় আন্দোলিত করিতে পারে। এই চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্য জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী'তেও ইহার স্বাক্ষর রহিয়াছে। সেজন্য তাঁহার ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য পাত্র-পাত্রী খাঁটি ঐতিহাসিক মানুষ নয়, তাহারা

(৩১) বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান—বঙ্কিমচন্দ্র

ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন মানুষের ভাবসমৃদ্ধ ও অতিরঞ্জিত প্রতিরূপ মাত্র। তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই, আয়েষার আত্মসমাহিত শক্তি ও সংযমে, তিলোত্তমার চারু কৌমার্যে ও সহনশীলতায়, বিমলার চাতুর্য, দৃঢ়সঙ্কল্প ও স্থিরচিত্ততার মধ্যে, জগৎসিংহের অসামান্য সাহস ও আত্মবিশ্বাসের মধ্যে, ঊনবিংশ শতকের সংগ্রামশীল ক্ষুব্ধ স্ত্রী-পুরুষকে আবিষ্কার করা দুষ্কর নয়। কিন্তু এই সব চরিত্র অপেক্ষাও বীরেন্দ্র সিংহের মধ্যে এই নূতন মানুষের পরিচয় অধিকতর সহজলভ্য। অভিরাম স্বামী তাঁহাকে আকবর শাহের পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য সুপারিশ করিলে বীরেন্দ্র সিংহ সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, "আকবর শাহের পক্ষ হইলে কোন্ সেনাপতির অধীন হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে ? কোন্ যোদ্ধার সাহায্য করিতে হইবে ? কাহার আনুগত্য করিতে হইবে ? মানসিংহের। গুরুদেব ! এ দেহ বর্ত্তমানে এ কার্য্য বীরেন্দ্র সিংহ হইতে হইবে না।" আবার, "বীরেন্দ্র সিংহ সগর্ব্বে হাস্য করিলেন, কহিলেন, 'কতলু খাঁ—আমি তোমার কাছে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি, তখন দয়ার প্রত্যাশা করিয়া আসি নাই। তোমার তুল্য শত্রুর দয়ায় যাহার জীবন রক্ষা—তাহার জীবনে প্রয়োজন ?" সামান্য কয়েকটি দৃশ্যে এবং উক্তির মধ্য দিয়া বীরেন্দ্র সিংহের চরিত্রের অপরিসীম দম্ভ, সাহস ও প্রাণপ্রাচুর্যের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেইদিক হইতে বীরেন্দ্র সিংহের ভূমিকা তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও তিনিই এই রোমান্সের প্রধান পুরুষ। তাঁহার চরিত্রে তেজ ও শক্তির সহিত সংযোজিত হইয়াছে, যাহা ক্ষুদ্র ও হীন তাহার প্রতি অপরিমেয় অশ্রদ্ধা। সেই শক্তি আপাতত আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন না করিতে পারে, কিন্তু তাহা কোনক্রমেই ক্ষুদ্র অথবা তুচ্ছ নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এক অচলায়তনের ব্যূহভেদ করিয়া সাহিত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই অচলায়তন ছিল কামাতুর বর্ণনা ও কাহিনীর গতানুগতিকতার অবসাদে নিন্দিত। কিন্তু এই আবেষ্টনী অতিক্রম করিতে করিতে তাহার কিঞ্চিৎ স্পর্শ বঙ্কিমচন্দ্রে সংক্রামিত হয় (আশমানি-গজপতি দিগগজ-বিমলা উপখ্যান. এবং 'সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণে' বিভিন্ন পাঠভেদে ইহা অভিব্যক্ত)। ফলে, স্থানে স্থানে জড়তা আসিয়া তাঁহার বর্ণনার গতিবেগ শ্লথ করিয়া দিয়াছে, এবং কোন কোন স্থানে বর্ণণা অকারণ বাহুল্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু এই সামান্য দুই তিনটি পরিচ্ছেদ এবং কয়েকটি পংক্তি বাদ দিলে সামগ্রিকভাবে তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' অপরূপ প্রাণপ্রাচুর্যে চঞ্চল ; ইহা

এমন একটি সাবলীল অথচ সংযত ও বলিষ্ঠ গতিচ্ছন্দে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে যে, সহজেই ঝর্ণাধারার সঙ্গে ইহার তুলনা করা চলে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের রচনাকৌশলের আলোচনা প্রসঙ্গে ঝর্ণাধারার সহিত ইহার গতির তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "পর্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা পাগলের মত ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে—মনে হয় না তাহারা কোন কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছু দূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায় নির্ঝরগুলা নদী হইতেছে—গতি গভীরতর হইয়া ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্বত ভাঙ্গিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া মহাবলে অগ্রসর হইতেছে—সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।" শুধু 'রাজসিংহ'-এর রচনাকৌশল সম্পর্কেই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোন উপন্যাস ও রোমান্সের ভাবজীবনের সত্তা সম্পর্কে একথা সমভাবে প্রযোজ্য। রোমান্সের বর্ণনার গতি পাঠকের, যে পাঠক কর্মময় জীবনসংগ্রাম ও আত্মোপলব্ধির কার্যে ব্যাপৃত, সেই পাঠকের মনের গতিতে প্রতিফলিত হইয়াছিল; অথবা সমসাময়িক সমাজমানসের অবরুদ্ধ গতি রোমান্সের গতিধারার মধ্যে অনায়াস অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। উভয়ের পক্ষেই ইহা যেন একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার। মানুষ খুঁজিয়া পাইয়াছে তাহার রোমান্সকে, রোমান্স মানুষকে। উভয়ের সম্পর্ক এখানে দ্বি-মুখী। বাস্তব সামাজিক পরিবেশ কবি-মনের প্রেরণা যোগাইয়াছে, এবং পক্ষান্তরে, কবি-মনের বর্ণনা সেই উৎসকেই নূতনভাবে সৃষ্টি করার প্রয়োজনে, হয়তো বা শিল্পীর অগোচরে, নিয়োজিত করা হইয়াছে। যেভাবেই হউক, নূতন সমাজের জীবন্ত মানুষের কর্মের ও ভাবের সহিত গতিশীল শব্দের প্রবাহ সংযুক্ত হয়, এবং মানুষ নিজেকেই নূতনতর সম্পর্কে উপলব্ধি করে। সুতরাং, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কেন 'দুর্গেশনন্দিনী' বিপুল সাড়া জাগাইয়াছিল, তাহা উপলব্ধি করা কঠিন নয়, এবং এই সাড়া জাগাইতে পারিয়াছিল বলিয়াই ইহা যুগান্তকারী বলিয়া স্বীকৃত।

প্রসঙ্গত 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে অবিশ্বাস্যতা ও অসম্ভাব্যতার স্বাক্ষর রহিয়াছে তাহাও উল্লেখযোগ্য। জগৎসিংহের নিকট বিমলার সুদীর্ঘ পরিচয়পত্রের প্রায় সর্বাংশই অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়, এবং বিমলার বাল্যজীবনের সহিত কৌশলে ওসমানের বাল্যজীবন সংগ্রথিত করিয়া এই পত্র জগৎসিংহের নিকট

পৌঁছানোর পন্থা উদ্ভাবন আরও বেশী বিস্ময়কর। কিন্তু এই অবিশ্বাস দূরীকরণের সুযোগ ও সময় যেন কোনটাই বঙ্কিমচন্দ্রের নাই; আর মনে হয়, পাঠকের মনে কোন সময় অবিশ্বাস দেখা দিতে পারে, সে প্রশ্নও কখনও তাঁহার মনে হয় নাই। এমন কি, অভিরাম স্বামীর মাধ্যমে কাহিনীর মধ্যে অতি-প্রাকৃতের অবতারণাও তিনি বিনা সঙ্কোচে ও অশঙ্কিতচিত্তে করিতে পারিয়াছেন। ভবিষ্যৎকে নিজস্ব ধ্যানধারণা ও গৌরবময় ঐতিহ্যের স্বর্ণ দ্বারা গড়িয়া তোলার সঙ্কল্প বঙ্কিম-মানসে তখনও পরিপূর্ণ রূপ ও শক্তি লইয়া দেখা দেয় নাই। কিন্তু মানুষের মহিমার যে চেতনা তাঁহাকে সৃষ্টির আনন্দে চঞ্চল করিয়াছিল, এবং যে মহিমা ব্যবহারিক জীবনের চাপে নানাভাবে ছিল ক্ষুণ্ণ, তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও গৌরব দান করার জন্যই তিনি সচেতনভাবেই হউক আর অচেতনভাবেই হউক অতীত ইতিহাসের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। সেই অতীতে সহজ মানুষের মত অতি-প্রাকৃতও স্বীকৃত; সুতরাং শেক্সপীয়র নাটকের কায়াহীন ছায়াগুলির ন্যায় বঙ্কিম-সাহিত্যেও অতি-প্রাকৃত স্বীকৃত। তাঁহার অতি-প্রাকৃত বাস্তব মানুষের মতই সত্য ও ক্রিয়াশীল। কিন্তু তাহা যে প্রকৃতই অবাস্তব এবং অসম্ভাব্যতার ঘন রহস্যে আবৃত, একথা এখন যেমন, পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদী মনেও তেমনি কখনও ধরা পড়ে নাই। তাই, ঘটনাপ্রবাহ যেখানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, যেখানে যোগসূত্রের অভাব পাঠককে অগ্রসর হইতে দেয় না, বঙ্কিমচন্দ্র অবলীলাক্রমে সেই ফাঁক অতিক্রম করিয়া নূতন স্থান হইতে পুনরায় কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঘটনাস্রোতকে একটা বৈজ্ঞানিক সত্যতা দান করার পরিবর্তে তিনি পরম আত্মবিশ্বাসের সহিত আনুভূতিক সত্যকে বিকশিত করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। কার্যকারণ পারম্পর্য অনুসরণ করার কর্ম যেন তাঁহার নয়, অবিশ্বাস্যতার জটিলতা খর্ব করার কর্মও তাঁহার নয়, অতিপ্রাকৃতের প্রভাবের জন্য কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করার কর্মও তাঁহার নয়, তাঁহার মনোরাজ্যে যে নূতন প্রেরণা ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে, জীবনের যে বিচিত্র স্বাদ গ্রহণের আশায় সমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, মানুষের যে অম্লান মহিমার চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার পরিচয় জ্ঞাপনই তাঁহার একমাত্র কর্ম। যুক্তি-বিজ্ঞানের মর্যাদা রক্ষিত হইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করার অবসর বা প্রয়োজন তাঁহার নাই, তিনি শুধু জানেন, জীবনে বসন্তের আহ্বান আসিয়াছে, তাহার ব্যঞ্জনা ও পূর্ণ অভিব্যক্তিই তাঁহার কাম্য। তিনি নিজেকে জানিয়াছেন, এবং সেই আত্মজ্ঞানকেই শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ

করিয়াছেন। মার্টিন লুথারের বিখ্যাত উক্তি 'By this I stand, I cannot do otherwise' দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের পরিচয় দেওয়া চলে। ইতিহাস প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; কিন্তু এই প্রবাহধারার সহিত মানুষের কর্ম সংযুক্ত না হইলে অভীপ্সিত সীমান্তে পৌঁছানো সম্ভব হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র যেন নিজের অগোচরে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আপনার স্থান নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন; এই প্রবাহের পারম্পর্যের মধ্যে নিজের কর্মকে অপরিহার্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। যে সামাজিক পরিবেশ ও সম্পর্ক হইতে তিনি রস টানিয়াছেন, এবং যাহার প্রভাবে তাঁহার শিল্পকর্ম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে, সেই পরিবেশকেই তাঁহাকে পুনরায় নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। এই উদ্দাম সৃষ্টি প্রেরণাতেই তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে যাহা অসম্ভব, এই প্রেরণা ও সীমাহীন উদ্দীপনার বিচারে সেই অসম্ভবও সম্ভব, অবিশ্বাস্যও বিশ্বাস্য। এখানে প্রশ্নের কোনরূপ অবকাশ নাই। সুতরাং, বর্ণনা ও ঘটনা-পারম্পর্যের ফাঁককে তিনি অসীম আত্মবিশ্বাস ও সৃজনী-প্রেরণার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন।

আর উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বর্ণনা-কৌশল ও ঘটনা-বিন্যাসের অন্তরালে একটি অনাস্বাদিত ও দৃঢ়, যদিও চাপা, প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। বীরেন্দ্র সিংহ অপ্ররোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিবাদ জানাইতেছেন; জগৎ সিংহ এক অনাত্মীয় পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাঁহার প্রার্থিত প্রণয়িণী তিলোত্তমার সহিত মিলিত হইয়াছেন; বিমলা, তিলোত্তমা, এমন কি আয়েষার জীবনাচরণের মধ্যেও তাহাদের স্ব স্ব পরিবেশের স্বীকৃতি নাই বলিলেও চলে। কতলু খাঁর প্রাসাদের কলুষিত আবহাওয়ায় বাস করিয়াও আয়েষা তাহা হইতে মুক্ত; আর মানসিংহের প্রতি বীরেন্দ্র সিংহের বিদ্বেষের কথা জানিয়া-শুনিয়াও বিমলা ও তিলোত্তমা মানসিংহের পুত্রের সহিত মিলিত হইতেছে। তাহাদের জীবন যেন পরিবেশের দাবীর বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ। তাহাদের মনোভাবের সহিত শিল্পীর সহানুভূতি মিশিয়া সেই প্রতিবাদকে আরও বেশী রসঘন ও আবেগময় করিয়াছে। শিল্পীমনের প্রতিবাদ তাহাদের অভিব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া ইহাকে সমসাময়িক মানুষের ভাব-জগতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। শিল্পীর এই প্রতিবাদ কাহার বিরুদ্ধে? পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, রোমান্সে একটি পূর্ণাঙ্গ মানস-চিত্র ব্যঞ্জনা লাভ করে। সেই দিক হইতে বীরেন্দ্র সিংহ প্রভৃতির সহিত

শিল্পীমনের সহানুভূতির এবং তাঁহার প্রতিবাদের উৎস খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নয়। এই প্রতিবাদ শিল্পীর বাস্তব জীবন-বিন্যাসের অবাঞ্ছিত সূত্রগুলির বিরুদ্ধে, জীবনের যে প্যাটার্ন শিল্পীকে বাধ্য হইয়া মানিয়া লইতে হইয়াছে, প্রতিবাদ তাহার বিরুদ্ধে। এই প্যাটার্ণের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আশা তাঁহার প্রতিবাদকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

'দুর্গেশনন্দিনী'র পরবর্তী গ্রন্থ 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিমচন্দ্র সুউচ্চ মার্গে আরোহণ করেন। শিল্পীর মানস বিবর্তনের ইতিহাসে কপালকুণ্ডলা কাহিনীর বিশেষ কোন অবদান নাই; কিন্তু এই গ্রন্থেই তাঁহার সাহিত্য-কৃতির অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার অপরোক্ষ প্রভাব নিঃসন্দেহে তাঁহার মানসজীবনকে সঞ্জীবিত করিয়াছে।

'কপালকুণ্ডলা'য় শিল্পী অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতা অর্জন করেন। ইহাতে 'দুর্গেশনন্দিনী'র শ্লথ জড়িমার বিন্দুমাত্র চিহ্নও অবশিষ্ট নাই। শিল্পীর ভাষা ইহাতে এমন একটা সাবলীল গতি ও কৌমার্য অর্জন করিয়াছে যে, অতি সহজ ও সূক্ষ্ম স্পর্শে তিনি গভীর আবেদন ও ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। বিনা আয়াসেই তিনি মুক্তির চরম স্তরে উপনীত হইয়াছেন। ভাষার এই মুক্তির সহিত শিল্পী, অপরদিকে, তাঁহার কাহিনীর স্থির লক্ষ্যের প্রতি সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্রীভূত করার ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছেন। ইহাতে একের সার্থকতার প্রয়োজনে বহুকে, উপধারাগুলিকে মূলপ্রবাহের অন্তর্গত করার এবং বিশেষ উদ্দেশ্যের খাতিরে নির্বিশেষকে সংগ্রথিত করার কৌশলের পরিচয় রহিয়াছে। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ এক একটি খণ্ড খণ্ড ঝর্ণাধারার মত অনিবার্য গতিতে সাগরসঙ্গমের পথে যাত্রা করিয়াছে। এখানে অকারণ পথ-চাওয়া নাই, যাত্রাপথের কোন এক গ্রন্থিতে অকারণ বিশ্রাম নাই। সব কিছুই এখানে নিয়ন্ত্রিত, সংগঠিত। অর্থাৎ কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ পর্দায় বাঁধিয়া কি ভাবে তারে ঝঙ্কার তুলিতে হইবে, শিল্পীর সে শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। নির্দিষ্ট ফললাভের জন্য তিনি নির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে শিখিয়াছেন। স্থির লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। শিল্পীর মানস-বিবর্তনের ইতিহাসে ইহাই 'কপালকুণ্ডলা'র উল্লেখযোগ্য অবদান।

এই বৈশিষ্ট্য ছাড়া এই গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য কপালকুণ্ডলা চরিত্র। বহু বিচিত্র রং এবং পরস্পরবিরোধী গুণের সমন্বয়ে এই চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে।

এখানে বাস্তবের সহিত কল্পনার, রসের সহিত কাঠিন্যের, জীবনের গদ্যের সহিত পদ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে; প্রচলিত সমাজ-জীবনের আস্বাদনের সহিত সমাজ জীবনের বাইরের অপরিচিত মাধুর্য মিশিয়াছে; শান্ত সংযত দৃঢ়তার সহিত মিশিয়াছে স্বাধীনতা ও মুক্তির, জীবনের সহজ-চলা প্যাটার্নকে অস্বীকার করার অদম্য আগ্রহ; সুন্দরের সহিত হইয়াছে শক্তির সমন্বয়, ভোগের সহিত বৈরাগ্যের। কিন্তু, তথাপি, এই অসাধারণ শক্তি ও সৌন্দর্যের মধ্যেও রহিয়াছে ব্যর্থতার বেদনা ও অশ্রুজল। সমগ্র ভাবে দেখিতে গেলে মনে হয়, কপালকুণ্ডলা ঊনবিংশ শতকের নূতন মানুষের এক সার্থক প্রতীক। এই চরিত্রের মাধ্যমেই যেন সে কালের মানুষ ভাবমুক্তি অর্জন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন সংকট-বিধ্বস্ত সমাজ এইরূপ একটি চরিত্রকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং উহা দ্বারা প্রভাবিত হইবে ইহা একান্তই স্বাভাবিক। এখানে শক্তি আছে, ক্ষমতা আছে, সৌন্দর্য আছে, আর সর্বোপরি আছে বিদ্রোহ, যাহা সহজেই মানুষকে অভিভূত করে এবং শক্তি ও শ্রেষ্ঠতার চেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। বীরেন্দ্রসিংহ সৃষ্টির পর কপালকুণ্ডলায় শিল্পী আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়; কারণ আদর্শ চরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসচিত্রের ব্যঞ্জনা এখানে আরও বেশী ব্যাপক ও রসঘন। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে এবং এখনও অনেকের মতে কপালকুণ্ডলা তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

'কপালকুণ্ডলা'র আবহাওয়ায় আরোহণের মত সেখান থেকে অবতরণও বিস্ময়কর। কারণ, প্রায় একই সময়ে রচিত এবং ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রকে রোমান্সের পাশাপাশি প্রায় আমাদের মত সমতল ভূমিতে বিচরণ করিতে দেখা যায়।

'দুর্গেশনন্দিনী'র তুলনায় 'কপালকুণ্ডলা'র রোমান্স অধিকতর অবিমিশ্র। ইহার তুলনায় 'দুর্গেশনন্দিনী' মিশ্র; আবার 'দুর্গেশনন্দিনী'র তুলনায় 'মৃণালিনী আরও বেশী মিশ্র ও অ-বিশুদ্ধ। কারণ ইতিপূর্বে বঙ্কিম-মানসে মানুষকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে সংস্থাপন করিয়া বিচার করার যে ক্ষীণ চেতনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, 'মৃণালিনী'তে তাহার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দেখা যায়। সেই জন্যই ইহা 'কপালকুণ্ডলা' অথবা 'দুর্গেশনন্দিনী' অপেক্ষা অনেক বেশী সত্য ও বাস্তব। বঙ্কিমচন্দ্র আত্মগত পরিধি ছাড়াইয়া বাহিরে বিস্তৃতি লাভ করিতে-ছিলেন, এবং সেই বিস্তৃতির, আত্মাকে ছাড়িয়া বিষয়কে অবলম্বন করার, স্বাক্ষর 'মৃণালিনী'তে রহিয়াছে। তাই ইহার বস্তুনিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে নিরপেক্ষ বস্তু-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, যাহা পূর্বে তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রেম, ইহার রহস্যাবৃত পরিবেশ এবং জটিল ঘাতপ্রতিঘাত, অতীতের ন্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালেও অসম্ভব নয়। কিন্তু এই প্রেমকাহিনী বর্ণনা এবং গিরিবালা-মৃণালিনী দৃশ্যের মাধুর্য সৃষ্টিতেই তাঁহার আসল কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন চরিত্রকে সংকটভরা সামাজিক পরিপ্রেক্ষণে রাখিয়া তাহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ ও বিচার করার মধ্যেই তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ পূর্বের ন্যায় তাঁহার রোমান্সের উৎস তাঁহার নিজস্ব কবি মনের একক কেন্দ্র নহে, মনের বাইরে যে পৃথিবী তাহার বহু কেন্দ্র হইতেও তিনি রস আহরণ করিয়াছেন। ফলে, এই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও স্রষ্টা হিসাবে তাঁহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ও রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে।

'মৃণালিনী'তে বঙ্কিম-মানসের আরও একটি অভিব্যক্তি সহজেই চোখে পড়ে। তাহা হইল, বাস্তবকে রূপায়িত করার নির্দিষ্ট সংকল্প। এই গ্রন্থেই সেই সংকল্প সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট আকার লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের অতীত-চেতনা তাঁহাকে "হিন্দুরাজ্যের পুনরুদ্ধার" করার আশায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে, এবং বক্তিয়ার খিলজির নেতৃত্বে সতেরজন মুসলমান সৈনিক কর্তৃক বাংলা বিজয়ের যে কাহিনী বাংলার হিন্দু রাজাদের উপর কলঙ্ক লেপিয়া দিয়াছিল, সেই কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, প্রথম দিনের আশাই পরবর্তী কালের নিরাশার পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখে। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে নিজস্ব কল্পনার রসে নূতনভাবে সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের অচেতন চেতনা গোপনে তাঁহার স্বপ্ন ভাঙিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিল। তিনি তাঁহার মানস চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে স্থাপন করিয়া তাহাদের অন্তর্লীন সৌকুমার্য ও সংগ্রামশীলতাকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া জনসাধারণের গোচরীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ভরসা ছিল, ইতিহাসের গভীর রসভাণ্ড হইতে রস আহরণ করিয়া তাঁহার সমকালীন মানুষ বাস্তবকে নিজস্বভাবে রূপান্তরিত করার কার্যে আত্মনিয়োগ করিবে। তাঁহার ভরসা ছিল, ইতিহাস এখানে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু ইতিহাস তাঁহাকে ব্যর্থ করিল। মাধবাচার্য্য, হেমচন্দ্র,

পশুপতি প্রভৃতি যাঁহাদের উপর তিনি বাংলা পুনরুদ্ধার এবং হিন্দুরাজ্য স্থাপনের অসম্ভব দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই কার্যোপযোগী দক্ষতা ও শক্তিসামর্থের অধিকারী নন। 'ঊর্ণনাভ' পশুপতিকে তিনি নীচতা, শঠতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিমূর্তিরূপে চিত্রিত করিয়াছেন; আর মাধবাচার্য্যের একমাত্র ভরসাস্থল হেমচন্দ্র প্রেমোন্মত্ত, উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও অপ্রকৃতিস্থ। হেমচন্দ্র যে এইরূপ গুরু দায়িত্ব প্রতিপালনে অক্ষম তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাসকে যথার্থ মর্যাদা দানের চেতনা যদি অগভীর হইত, এবং মানুষকে তাহার সমকালীন পরিবেশে স্থাপন করিয়া বিচার করার বিন্দুমাত্র চেতনাও যদি বঙ্কিমের না থাকিত, তাহা হইলে পশুপতি, হেমচন্দ্র প্রভৃতির দুর্বলতা ও অযোগ্যতা সম্ভবত কোনকালেই তাঁহার নিকট ধরা পড়িত না। তখন শিল্পী তাঁহাদিগকে যে কোন গুণের অধিকারী করিতে পারিতেন। এবং তাহাদের দ্বারা হিন্দু রাজ্য সংস্থাপনও অসম্ভব হইত না। ইতিহাসকে বাদ দিয়া বিশুদ্ধ ভাব জয়ী হইতে পারিত। কিন্তু বঙ্কিম-মানস সেভাবে গড়িয়া ওঠে নাই। তাই এই বিপর্যয়।

এ কয়টি চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এই কথাই নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় যে, বাস্তব ইতিহাসের গতিধারা এবং কার্যকারণ পারম্পর্যের সহিত বঙ্কিম-মানসের বিরোধ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবকে তিনি আর কোন মতেই মানিয়া লইতে পারিতেছেন না; জীবনের প্রচলিত প্যাটার্ণ অসহ্য বোধ হইতেছে। তাই নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির তাগিদে তিনি ইতিহাসকে নিজ মনোমত পুনর্বার সৃষ্টি করার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন; 'বাতায়নে', 'যবন-বিপ্লব' 'ধাতুমূর্তির বিসর্জন' ইত্যাদি পরিচ্ছেদের বর্ণনার গতি ও তীব্রতার মধ্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু ইতিহাসের কার্যকারণ পারম্পর্য এতখানি নমনীয় নয়। অথবা ইতিহাস এতখানি ক্ষমাশীলও নয়। জীবনে স্থান ও কালের প্রভাব কোন না কোন ভাবে স্বীকার করিয়া লইলে তাহার ফলও স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধির শাসনে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাই তাঁহার অজ্ঞাতে তিনি স্বয়ং তাঁহার আশাবাদকে ক্ষুণ্ণ এবং সংকল্পকে ক্ষীণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সে জন্য প্রথম দিনের আশার মধ্যেই নিরাশার কাল ছায়াপাত; জয়যাত্রার সূচনাতেই পরাজয়ের সংকোচ।

মৃণালিনীতেই তাঁহার সৃষ্টি-কর্মের প্রথম পর্বের সমাপ্তি। তাঁহার পরবর্তী শিল্পকর্ম প্রথম পর্বের শিল্পকর্ম অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তবে বাস্তবকে রূপায়িত করার সংগ্রামে শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের যে শিক্ষা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, প্রথম তিনটি রোমান্সে সে শিক্ষা ও প্রস্তুতি শেষ হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যায়।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি : দ্বিতীয় পর্ব

এক

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের সাহিত্য-জীবন আলোচনা করার পূর্বে সামান্য একটু ভূমিকার প্রয়োজন। কেননা, তাঁহার প্রথম পর্বের সাহিত্য-জীবনের অন্তরালে দেশের সাধারণ পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্ষুব্ধ হইতে আরম্ভ করে ; দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় তাহা গভীর আলোড়নে পরিণত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই পর্যায়ে তাঁহার রচনার মাধ্যমে নানাবিধ সামাজিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন ; এবং তাঁহার শিল্প-কর্মের উপর এই সাধারণ পরিবেশের প্রভাব উপেক্ষনীয় নয়।

১৮৫০ সাল হইতেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সুখস্বপ্ন ভাঙিতে আরম্ভ করে। এ যাবৎ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাঁহারা যে পিতৃস্নেহ লাভ করিতেছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের পর এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবলুপ্তিতে ভারতবর্ষকে সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পর, এই স্নেহের প্রভাবে ভাঁটা পড়িতে থাকে। নূতন শাসন কাঠামোয় শিক্ষিত ভারতীয়ের স্থান অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ভারতীয়েরা যাহাতে অধিক সংখ্যায় আই-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে সেজন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে পাঠ্যতালিকা ঘন ঘন পরিবর্তিত হইতে থাকে, বাধানিষেধের বেড়াজাল সুদৃঢ় করা হইতে থাকে। ইহাতে দেশের সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রগণও যখন উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ মনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে আরম্ভ করেন, তখন আবহাওয়া স্বভাবতই চঞ্চল হইয়া ওঠে। তদুপরি ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদির ফলে সরকারী প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবে ক্রমেই তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধিয়া ওঠে। ১৮৬২ সালে এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে শিথিল করিবার জন্য এদেশে হাইকোর্ট ও ব্যবস্থা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইল সত্য এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের

নিয়োগের উদার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইল সত্য, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতিকে কার্যকরী করার আগ্রহ বৃটিশ রাজপুরুষদের অতি সামান্যই ছিল। বরং শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্পর্কে বৃটিশ রাজের অকারণ ভীতি আত্মপ্রকাশ করে। উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী 'বাবুর' চাকরী সংস্থান অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।(৩২)

তদুপরি বাংলার শাসনকর্তা স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১-৭৪) উচ্চ শিক্ষার জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ হইতে জনশিক্ষার অজুহাতে বৃহদংশ ছাঁটিয়া দিলেন। তাঁহার আদেশে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং বহরমপুর কলেজ প্রথম শ্রেণীর কলেজ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ ফার্স্ট আর্টস্ কলেজে অবনমিত হয়। এই অযৌক্তিক কার্যের প্রতিক্রিয়ায় বাংলার শিক্ষিত-মানস অত্যন্ত আন্দোলিত হইতে থাকে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারী মনোভাবের এই অনুদার রূপান্তরের পরিণতি সামান্য কারণে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপসারণ; প্রতিকারের আশায় তাঁহার বিলাতযাত্রা; ব্যর্থ হইয়া এবং এমনকি, ব্যারিস্টারি পরীক্ষার অনুমতি না পাইয়া তাঁহার প্রত্যাগমন। আর সরকারী মনোভাবের অপর অভিব্যক্তি ১৮৭৮ সালের ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট। কর্মক্ষেত্রে এই নিদারুণ ব্যর্থতা এবং অপমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে প্রতিকারের দুর্জয় সংকল্প লইয়া ধ্বনিয়া ওঠে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও একটানা অবনতির পথে চলিয়াছিল। কোম্পানীর হাত হইতে ভারত শাসনের দায়িত্ব বৃটেনের সাম্রাজ্যিক গভর্ণমেণ্টের উপর বিবর্তিত হওয়ায়, কোম্পানীর অংশীদারদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কোটি কোটি টাকা দিতে হয়। এই টাকা অর্থাৎ কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতবর্ষকে ক্রয় করিবার টাকা ভারতকেই সরবরাহ করিতে হয়।

(৩২) শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদারের History of Political Thought, প্রথম খণ্ডের ৩২৩-৪ পৃষ্ঠায়, Mookherjee's Magazine-এর এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে; "The British Officers in the Punjab, Oudh, the N. W. Provinces, the Central Provinces, Rajputana, and Central India would not within the last ten years, unless sorely pressed for hands, receive a Bengali's application for any situation." P. 82, 1874. এখানে আরও একটি বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহার শেষ লাইনটি এই: "Bengali Baboos and youths fresh from college need not apply."

ফলে, নূতন নূতন কর সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন দুর্বিসহ করিয়া তোলে। এই সংকট মুহূর্তে উড়িষ্যা এবং পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্যশস্যের মূল্য কোন কোন স্থানে স্বাভাবিক মূল্যের আটগুণ দশগুণ এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গুণ (৩৩) বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের দরুণ ভারতে উৎপন্ন তুলার দর অত্যন্ত পড়িয়া যায়, এবং তুলা-চাষীরা ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। কৃষি-ঋণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই একটানা সংকট ১৮৭০ সালে চরমে পৌঁছায়। দারিদ্র্যের জ্বালায় মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায়, মহাজনশ্রেণী আদালতের আশ্রয়ে চাষীদিগকে নিজভূমি হইতে উচ্ছেদের পরোয়ানা লইয়া অগ্রসর হয়। কৃষকরা বিদ্রোহী হইয়া ওঠে; তাহারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়, আদালতের ডিক্রী অমান্য করিয়া উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে থাকে, এবং বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের অসংহত শক্তি লইয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং বিশেষ করিয়া সাঁওতাল পরগণায় রীতিমত অরাজকতা দেখা দেয়। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য এই বিদ্রোহ বিনা আয়াসেই দমন করিতে সমর্থ হন; কিন্তু একটি কমিশন নিয়োগ করিতে বাধ্য হন, এবং ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করা হয়। শুধু বাংলা দেশেই নহে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও, যথা দাক্ষিণাত্যে এবং মহারাষ্ট্রে, এই সময়ে বাংলার অনুরূপ কৃষক বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এইসব বিদ্রোহ অপেক্ষাও ব্যাপকতর, বিস্তৃততর চাষী-আন্দোলন বাংলায় ১৮৫৯ সালে হইয়া গিয়াছে। তাহা ইতিহাসে নীল হাঙ্গামা নামে খ্যাত। নদীয়া, পাবনা ও যশোহরের আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ দরিদ্র, নিরক্ষর প্রজা নীলকর সাহেবদের অমানুষিক উৎপীড়ন ও যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে একযোগে ধর্মঘট করে। তাহাদের অপ্রত্যাশিত সংগঠন, দৃঢ়তা ও মনোবল বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অপূর্ব আলোড়ন আনিয়াছিল।

কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্রম-অবনতির পথ প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। বিগত শতকের অষ্টম দশকের মাঝামাঝি বাংলা-বিহারে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এবং ১৮৭৭ সালে বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, মহীশূর এবং অন্যান্য

(৩৩) অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩০শে অক্টোবর, ১৮৭৩; শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদারের History of Political Thought পুস্তকের ৩২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্থানে দুই লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পুনরায় আকাল ভাঙিয়া পড়ে। সাড়ে তিন কোটি লোকের গৃহ হাহাকারে কাঁদিয়া ওঠে এবং প্রায় ৫২ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর দেশের এই ভয়াবহ আবহাওয়াকে ব্যঙ্গ করিয়া, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুকে অবহেলা করিয়া, গভর্ণমেন্ট তখন দ্বিতীয় আফ্‌গান যুদ্ধের (১৮৭৯) আয়োজন করিতেছিলেন, এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সংগৃহীত অর্থ যুদ্ধের তহবিলে দান করা হইল। এক দিকে ঘরে ঘরে মৃত্যু, অপর দিকে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' বলিয়া ঘোষণা করার জন্য আহূত দিল্লীর দরবারের সমারোহ (১৮৭৭), মানুষের জীবনের প্রতি এইরূপ নির্মম বিদ্রূপ এবং ঔদাসীন্য শিক্ষিত সমাজের মনে নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া ডাকিয়া আনে। বাংলার সাময়িকপত্র ও দৈনিক পত্রিকাসমূহে কঠোর সমালোচনা হইতে থাকে এবং বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে স্বজাতিপ্রীতি, সমবেদনা এবং ঐক্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতের ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতিশ্রেণীও এই সময়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে কোম্পানী-রাজ ভারতে শিল্পায়ণের নীতি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ১৮৫০ সালের পর হইতে কিছু কিছু শিল্প গড়িয়া উঠে, এবং বৃটিশ পুঁজিপতি ভারতে পাট, বস্ত্র এবং কয়লা-শিল্পের বিকাশের প্রতি যত্নবান হয়। কিন্তু বৃটিশ শিল্পের তুলনায় ভারতীয়দের পরিচালিত শিল্পপ্রচেষ্টা নিতান্ত নগণ্য ছিল, এবং সাম্রাজ্যিক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় শিল্পপ্রয়াসে নিশ্চিতরূপে বাধানিষেধ আরোপ করিতে থাকায় দেশী পুঁজিপতিদের মধ্যেও অসন্তোষের সঞ্চার হইতে থাকে। এই শ্রেণীগত অসন্তোষ বৃহত্তর জাতীয় বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। রাজনারায়ণ বসু বলিতেছেন, "এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, সেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় অভাব, ইউরোপীয় প্রয়োজন ও ইউরোপীয় বিলাসিতা এসে ঢুকেছে, অথচ সেই সকল অভাব ও বিলাসেচ্ছা পূরণের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হইতেছে না।" (৩৪) আর সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের যুবরাজরূপে ভারত আগমন উপলক্ষে নবীনচন্দ্র সেন লেখেন,—

> "ভারতের তন্তু নীরব সকল,
> দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে ম্যাঞ্চেস্টার!

(৩৪) সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু ; পৃ, ৪৪

লবণাম্বুরাশি-বেষ্টিত যে স্থল,
জন্মে শিবারপুলে লবণ তাহার !”

আহত সমাজ-মানস কিরূপ চঞ্চল এবং বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কিরূপ সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করিতেছিল, তাহা এই সব দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিভাত হয়।

জাতীয় অসন্তোষ এবং কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আহত অভিমান রাজনৈতিক অসন্তোষ এবং আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য জাতীয় মুক্তি অথবা বৃটিশ শাসনের অবসান ছিল না। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য না করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মধ্যবিত্তের প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, এবং দায়িত্বশীল পদ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট যেভাবে শিক্ষার ও শিক্ষিতের অমর্যাদা ও অবমাননা করিয়াছেন, এই আন্দোলন তাহারই সচেতন প্রতিবাদ; আর তাহার উদ্দেশ্য গভর্ণমেণ্টকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সঙ্গত ও যুক্তিবহ আপোষে বাধ্য করা। কিন্তু এই আন্দোলন স্বাজাত্যবোধ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, পারস্পরিক সম্প্রীতি, ঐক্যবোধ এবং জাতীয় দম্ভ ও শ্রেষ্ঠতাবোধ সঞ্চার করিয়া দেয়।

রাজনারায়ণ বসু ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে “জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা” প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই বৎসরেই তিনি মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করেন। তাঁহার পরে প্যারীচরণ সরকার কলিকাতায় ১৮৬৩ সালে মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করেন, এবং জাতীয় শক্তি উদ্বোধনের পথে সুরাপান যে মারাত্মক বিঘ্ন, তাহা প্রচার করিতে থাকেন। আর এই বৎসরেই উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠেন। শিক্ষা ও কর্মজীবনের, শিল্পবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সংকটের, ঘাত প্রতিঘাতে দেশের সমস্ত শ্রেণীর, সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে; দেশের আবহাওয়া সর্বাঙ্গীণ জাগরণের কাকলীতে মুখর। জীবনের সমস্ত প্রবাহে, সমস্ত দিকে গভীর আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় সমগ্র সমাজ-মানস জাগিয়া উঠিয়াছে। এই জাগরণেরই অভিব্যক্তি স্বরূপ ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির প্রচেষ্টায় ‘চৈত্র মেলা’র উদ্বোধন। মেলার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, “আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে,

কোন বিষয়-সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।" এই মেলা উপলক্ষেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "মিলে সব ভারত-সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান" গানটি রচনা করেন। স্থানীয় বা প্রাদেশিক বন্ধনী অতিক্রম করিয়া সমাজ-মানসে ঐক্যবদ্ধ ভারতের পরিকল্পনা জন্মলাভ করিয়াছে। আর এই মেলারই বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বিভিন্ন বক্তা "স্বজাতির উন্নতি সাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের" জন্য সমস্ত সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন।

অপর দিকে, ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন ভারতীয়দের মধ্যে স্বজাতি-প্রীতির উদ্বোধনে সহায়তা করে। ১৮৬৮ সালে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে কলিকাতায় যে নগর কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কয়েকটি লাইন নিম্নরূপ,—

> তোরা আয়রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হলো অবসান
> নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
> নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
> যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত-বিচার।(৩৫)

জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে এবং সমানাধিকারের পক্ষে এই আন্দোলন এবং ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতাদের সর্বভারত পর্যটন মোটামুটিভাবে বিভিন্ন প্রদেশ ও সম্প্রদায়ের লোককে একটা ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত করিতে থাকে। তদুপরি, প্রচলিত ধর্ম চিন্তা ও আচরণের বিরুদ্ধে রামকৃষ্ণ দেবের বিদ্রোহও এক্ষেত্রে উপেক্ষনীয় নয়।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আবহাওয়াও সে যুগে বিরামহীন সংঘাত এবং বিপুল সম্ভাবনায় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপে নব নব জাতির বিকাশ প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে ; গ্যারিবল্ডি, ম্যাৎসিনী ও কাভুরের প্রচেষ্টায় সংস্থাপিত ঐক্যবদ্ধ ইতালীর সংবাদ এবং বিসমার্কের ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর কাহিনী বাংলার শিক্ষিত-মানসের তন্ত্রীতে আশার ঝংকার তুলিয়াছে ; আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের অবসানে দাসপ্রথা উচ্ছেদের সাফল্যে, রাশিয়ায় দাস-প্রথার বিলোপে, ইতালী ও জার্মানীর জাতীয় মনোভাবের বিজয় গৌরবে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্যারিসের শ্রমজীবী জনসাধারণের অপূর্ব সংগ্রামে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষার এবং নিজস্ব প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়া

(৩৫) আত্মজীবনী—শিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃ. ১৪৭-তে উদ্ধৃত

আনন্দিত হইয়াছে। এমন কি মার্কসের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সংবাদও (৩৬) বাংলার শিক্ষিত সুধী সমাজের নিকট অবিদিত ছিল না। সুতরাং জাতীয় আশা ও রাজনৈতিক আদর্শের ব্যাপকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতার ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যও পরিবর্তিত হইল। উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকের মত শুধু উচ্চ সরকারী এবং দায়িত্বশীল পদমর্যাদার দাবীই আর যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার A Nation in the Making-এ লিখিয়াছেন, "The ground was now to be shifted·········it was not enough that we should have our full share of the higher offices, but we aspired to have a voice in the councils of the nation." অর্থাৎ তখন হইতে রাজনৈতিক আদর্শ পরিবর্তিত হইল। উচ্চ সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অধিকারই আর যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। জাতীয় পরিষদে আসন লাভের দাবী ধ্বনিত হইল। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ভারত সভা' এবং শিশিরকুমার ঘোষ 'ইণ্ডিয়া লীগ' স্থাপন করিয়া দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করেন। শিক্ষিত মহলে গুপ্ত সমিতি স্থাপনের অঙ্কুর উন্মেষিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিন পাল প্রভৃতি তাঁহাদের সমিতিতে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের দাসত্ব করিবেন না বলিয়া সংকল্প করেন।

কিন্তু এই জাগরণের মুখেও পশ্চাতের প্রবল আকর্ষণ অনুভূত হয়। অস্বীকৃত বর্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাংলার শিক্ষিত সমাজ আত্মশক্তি লাভের প্রেরণায় পশ্চাতের পানে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, এবং বিদেশী শাসনকর্তার নিকট পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া অতীতের শ্রেষ্ঠতা দ্বারা বর্তমানের ক্ষুদ্রতাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতে থাকেন, এবং একটা উগ্র ধর্মগত ও সম্প্রদায়গত দম্ভ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। তাই, চৈত্রমেলার অপর নাম জাতীয় মেলা না হইয়া হইল 'হিন্দুমেলা'; আর প্রথম জীবনের অসংযত ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসুকে ১৮৭২ সালে হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে দেখা যায়। হিন্দু-ধর্ম ও হিন্দুরাজ্য পুনঃ সংস্থাপনের একটা সচেতন প্রচেষ্টা দিকে দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে।

(৩৬) সাম্য—বঙ্কিমচন্দ্র ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, শিক্ষা ও কর্মজীবনের নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা মধ্যবিত্তের এই ভাব-বিপ্লবের উৎস হইলেও এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ এই ভাব-বিপ্লবের নেতা হইলেও মধ্যবিত্ত মানসের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কচ্ছেদ তখনও পাকাপাকি হয় নাই। ইতিপূর্বে নিজেকে শাসনযন্ত্রের সহিত একীভূত করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল, তাহার ভিত্তি শিথিল হইলেও এবং সরকারী মনোভাবের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঘনীভূত হইতে থাকিলেও আত্মীয়তার সব কয়টি গ্রন্থি তখনও ছিন্ন হয় নাই। তাঁহাদের মনে তখনও ক্ষীণ আশা প্রবাহিত হইতেছিল যে, সাম্রাজ্যিক শাসনকর্তাদের ভুল ভাঙ্গিবে ; মধ্যবিত্তকে তাঁহারা বঞ্চিত করিবেন না। সেই বিশ্বাসের অনুবর্তী হইয়াই শিশিরকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন, "If we demand a Parliament of our own from the English people, it is to lighten their trouble.'(৩৭) অর্থাৎ ইংরাজের নিকট হইতে আমরা যে নিজেদের স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট দাবী করি, তাহা তাহাদের শ্রম লাঘবের জন্যই। সম্ভবত এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট বিতর্কের যুগে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম-মানস বিবর্তনের ইতিহাসে ইহা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এবং বঙ্কিম-মানস বিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া বিস্তৃত উদ্ধৃতি করিতেছি। 'পত্রিকা' লেখেন "......According to his [Bunkim Chunder Chatterjee the Dy. Collector of Berhampoor] opinion 'much of the general feeling of distrust towards the Government which has often been the comment, is due to the action of the native press'...We are taken by surprise at the remarks of an educated native like Bunkim Babu, who holds no inconsiderable position in our society. Certainly in a free country such remarks from a person of Bunkim Babu's position would have brought down upon him universal condemnation, but under the pressure of a foreign government even the truest patriot turns a traitor to his country."—16 Octr. 1873.

(৩৭) শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদারের History of Political Thought গ্রন্থের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

"...This mischievous remark of the Babu, as may be easily supposed, has met with the approval of his Honor ......Babu Bunkim Chandra draws but only Rupees 600 per mensem and already his zeal has met with the approbation of his Honor, and it is to be expected that a promotion would increase his zeal tenfold....." 23 Octr. 1873 (৩৮) অর্থাৎ বঙ্কিমবাবুর মতে গভর্ণমেণ্টের প্রতি অবিশ্বাসের যে মনোভাব দেখা দিয়াছে, তজ্জন্য দেশীয় সংবাদপত্রের প্রচারকার্যই দায়ী।...বঙ্কিমবাবুর ন্যায় শিক্ষিত নেটিভের এই মন্তব্য শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি; কারণ তিনি আমাদের সমাজে অনুল্লেখযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত নহেন। কোন স্বাধীন দেশে যদি বঙ্কিমচন্দ্রের স্তরের কোন লোক এইরূপ মন্তব্য করিতেন তাহা হইলে তিনি সর্বসাধারণের নিন্দাভাজন হইতেন। কিন্তু বিদেশী গভর্ণমেণ্টের চাপে একনিষ্ঠ স্বদেশ প্রেমিকও স্বদেশের বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়।...বঙ্কিমবাবুর এই দুষ্ট মন্তব্য ইতিমধ্যেই তাঁহার প্রভুর অনুমোদন লাভ করিয়াছে।...তিনি মাসিক মাত্র ছয়শত টাকা মাহিনা পাইয়া থাকেন, এবং আশা করা যায়, প্রমোশন পাইলে তাঁহার উৎসাহ দশগুণ বৃদ্ধি পাইবে।

ভাববিপ্লবের এই ঘাতপ্রতিঘাতের তরঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকর্মের দ্বিতীয় পর্বের প্রারম্ভও প্রথম পর্বের ন্যায় বিস্ময়কর এবং গুরুত্বপূর্ণ। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে প্রাণপ্রাচুর্য ও আত্মোপলব্ধির প্রেরণা স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল, 'মৃণালিনী'র অভিজ্ঞতা এবং জাতীয় আশাভঙ্গের ক্রমবর্ধমান চেতনা আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মাভিমানে পরিণত হইল। 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব এই মানসিক আলোড়নের ফসল। বঙ্কিম-মানসে রূপান্তরের কাজ চলিয়াছে।

এদেশের 'নূতন' অভিজাত শ্রেণী এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সামাজিক সংকটের মধ্যে এবং বৃটিশ বণিকতন্ত্রের প্রয়োজনে সৃষ্ট হইয়াছিল। তাই তাঁহাদের সামাজিক ভিত্তি ছিল শিথিল, এবং তাঁহাদের সমৃদ্ধি এবং এমন কি,

(৩৮) সাহিত্য সাধক চরিতমালার 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' বই-এ উদ্ধৃত

অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল কোম্পানী-রাজ-নির্ভর। প্রকৃত পক্ষে, শাসক বিদেশী বণিকতন্ত্র এবং শাসিত দেশী জনসাধারণ, এই দুই সীমারেখার মধ্যে তাঁহারা ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগী। ফলে, তাঁহাদের সামাজিক আচরণ এবং আদর্শে একটা স্বাতন্ত্র্যধর্মী বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা যতখানি ছিলেন বৃটিশ বণিকতন্ত্রের আপনার জন (অন্তত তাঁহারা ইহাই কল্পনা করিতেন), ততখানি ছিলেন এদেশীয় জনসাধারণ হইতে দূরে। দেশীয় সমাজ হইতে তাঁহাদের এই ব্যবধানই তাঁহাদিগকে একটা অকারণ দম্ভ ও স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করিয়াছিল; বিদেশী শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত কোন উচ্চপদপ্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে নিরক্ষর সংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করিয়া ভাবিতে পারা এবং ভাবের আদানপ্রদান করা ছিল কল্পনাতীত। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং আত্মাভিমান যে ভ্রান্ত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মূল্যহীন শ্রেষ্ঠতাবোধকে আশ্রয় করিয়া লতাইয়া উঠিতেছে, প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস কাটিয়া যাওয়ার পরই তাহা অনুভূত হইতে থাকে। বঙ্কিমযুগ সেই আশাভঙ্গের যুগ।

সুতরাং যে বুদ্ধিজীবী স্বাতন্ত্র্যধর্মীমহল পূর্বে অতি যত্নে নিজদিগকে নিম্নশ্রেণীর কলুষ এবং সাধারণের অমার্জিত আচরণ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতেন, এ যুগে তাঁহাদের পক্ষে সেই দৃষ্টিকোণ বর্জন করিতে হইল। যাঁহারা ছিলেন আপনার সুখদুঃখ ও স্বপ্নের ভাঙ্গাগড়া লইয়া আত্মসমাহিত, বাহিরের কোলাহল বর্জন করিয়া যাঁহারা আশ্রয় লইয়াছিলেন আপনার মনে, এখন তাঁহাদিগকেও উন্মুক্ত রাজপথে দাঁড়াইয়া বলিতে হইল, তাঁহাদের ঘর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাঁহাদের মধ্যাহ্নের আশায় অমাবস্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। অন্তরকে বাহিরে প্রসারিত করার প্রয়োজন অনুভূত হইল। সুখের দিনে সুখ ভাগাভাগিতে তাঁহাদের যে অনিচ্ছা ছিল, দুঃখের দিনে বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে অন্যের সমবেদনা আকর্ষণের উপায় খুঁজিতে হইল।

'বঙ্গদর্শন' বুদ্ধিজীবী মানসের এই রূপান্তরের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ইতিহাসের লিপিকারগণ প্রত্যেকেই প্রাক্-বঙ্গদর্শন যুগের বঙ্কিম-চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য, অসামাজিকতা, দম্ভ, ইত্যাদি গুণের অথবা দোষের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করিয়া অসামাজিক বঙ্কিম সামাজিক হইয়া ওঠেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মানুষের জ্ঞান যেমন আপেক্ষিক মানুষের ক্রিয়াও তেমনি প্রত্যক্ষ লক্ষ্যের সীমায় আবদ্ধ থাকে না; আশু লক্ষ্য সিদ্ধির উপকরণ হইয়াও ইহা পরোক্ষে সেই লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া নূতন

লক্ষ্যের সংকেত জানায়, অথবা নূতন লক্ষ্য সিদ্ধির উপকরণে পরিণত হয়। নিজেকে বাহিরে প্রসারিত করিতে এবং নিজের শূন্যতার প্রতি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে যাইয়া বুদ্ধিজীবী মানসকে অন্যের শূন্যতার প্রতিও দৃষ্টি ফিরাইতে হইল, অপরকেও নিজের অন্তরে আকর্ষণ করিতে হইল। তাই, বঙ্গদর্শনের' পত্র সূচনায়ই দেখিতে পাই,...'এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোক-দিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক...এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা সম্পন্ন।...সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাহাদিগের সংস্রবে আসে না।" (বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা; বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ; পৃ ২২৪-২৫)

এভাবে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রাণপ্রাচুর্যের সহিত নবলব্ধ আত্মচেতনা এবং আত্মজিজ্ঞাসা সংযুক্ত হয়। আর আত্মচেতনা হইতে এই উপলব্ধি আসিয়াছে যে, মধ্যবিত্ত মানসের উচ্চপদ লাভের দাবী সার্থক অথবা নিজস্ব ধ্যানধারণার গৌরবে ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করিতে হইলে শুধুমাত্র শিক্ষাভিমানীর ইংরাজী বক্তৃতার আকাশ ফাটানো চীৎকারই যথেষ্ট নয়; উৎকেন্দ্রিক শিক্ষাভিমানীকে মাটিতে পা ফেলিতে হইবে, এবং এ দেশের মাটী হইতেই অপরাজেয় শক্তি আহরণ করিতে হইবে। এই উপলব্ধি হইতেই আত্ম-চেতনা পর-চেতনা অর্থাৎ সামগ্রিক চেতনায় রূপান্তরিত হয়, এবং নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে ফেলিয়া ও সুস্পষ্ট আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সমাজ-মানসকে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিম-মানস এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, এবং ইহার মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবকে রূপান্তরিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আর এই ভাবধারা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনী ক্রিয়া এবং তাঁহার শিল্পমানও

নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়। তাঁহার শিল্পক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রচারধর্মী ; সাধারণ অর্থে শুধু উদ্দেশ্যমূলক নয়, তাহা নীতিধর্মমূলক। বঙ্কিমের হিন্দুরাজ্য ও হিন্দুধর্ম সংস্থাপনের সংকল্পের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে 'মৃণালিনী'তে পাইয়াছি। উত্তর-'বঙ্গদর্শন' যুগে এই সংকল্প পরিপূর্ণ শক্তি ও রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। এখন হইতে তাঁহার শিল্প-প্রচেষ্টা মূলত হিন্দুধর্মসম্মত নৈতিক আচরণ এবং মূল্যমান প্রচারের বাহন মাত্র। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র সনাতন হিন্দুধর্মকে তাঁহার যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত দ্বারা অনেকাংশে সংশোধিত আকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে কথা পরে আলোচ্য। পরবর্তীকালের ১৮৮৫ সালের প্রথম ভাগে, 'প্রচারে', বাংলার নবীন লেখকগোষ্ঠীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন, "যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।" (বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; পৃঃ ২০৬) শিল্পক্রিয়ার এই নৈতিক সংজ্ঞা দ্বারাই তাঁহার সৃষ্টিকলার বিচার করিতে হইবে ; নৈতিক আদর্শ বিস্মৃত হইয়া অথবা ইহার মূল্যমান উপেক্ষা করিয়া তাঁহার শিল্প-বিচার সম্ভব নয়। এবং তাঁহার উপন্যাসগুলিকে এমনভাবে সংগঠিত করা হইয়াছে, উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাস্রোতের পারম্পর্য এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, এবং চরিত্রগুলিকে এমন পটভূমিতে স্থাপন করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে যে, তাহাদের জীবন-আলেখ্য হইতে সহজেই একটি নৈতিক সত্য প্রতিভাত হয়। নৈতিক শিক্ষাদানের জন্যই যেন ইহাদের সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, শিল্পকলার এই নৈতিক ব্যাখ্যা তাঁহার শিল্পক্রিয়াকে স্বাভাবিক গতিধারায় প্রবাহিত হইতে দেয় নাই, বরং পূর্ব-নির্ধারিত পথে সঞ্চারিত করিয়া ইহাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। আর ইহাতে তাঁহার সমাজ-সংস্কার আদর্শের স্বাভাবিক সংরক্ষণশীলতাও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় পর্বের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'-এ এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন মানুষকে তাহার সমকালীন পরিবেশে রাখিয়া বিচার বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, অপর দিকে তেমনি শিল্পী ইহাকে নৈতিক আদর্শ প্রচারের বাহনরূপেও ব্যবহার করিয়াছেন।

'বিষবৃক্ষ' কি সে সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, "রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে।......চিত্তসংযমের অভাবই

ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এই বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী ; একবার ইহার পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর,... কিন্তু ইহার ফল বিষময়, যে খায়, সেই মরে।" (বিষবৃক্ষ, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; পৃঃ ৯০) বঙ্কিমচন্দ্র এই তত্ত্বকে বিধবা কুন্দনন্দিনীর সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ এবং কুন্দর আত্মহত্যার শোচনীয় পরিণতি দ্বারা সপ্রমাণ করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। রিপুর তাড়নায় নগেন্দ্রের চিত্ত-সংযমের অভাব হইয়াছিল, কেন না সে প্রথম স্ত্রী সূর্য্যমুখী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কুন্দর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল আর কুন্দর চিত্তসংযমের অভাব ছিল, কারণ বিধবা হইয়াও সমাজ-ধর্মের বিধান উপেক্ষা করিয়া সে নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল। নিঃসন্দেহ, বঙ্কিম-চন্দ্র বহু-বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়াই 'বিষবৃক্ষ' রচনা করিয়াছিলেন, এবং নির্দিষ্ট নৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে নির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহা করিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে তাঁহার মতামত কি তাহা কয়েক বৎসর পরে 'সাম্য'-এ তিনি পরিষ্কার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন,...'বিধবা বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে ; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না ; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, সে জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাব-বিশিষ্টা, স্নেহময়ী, সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।" (৩৯) একটু অনুধাবন করিলেই এই যুক্তিধারার ফাঁকটুকু ধরা পড়িবে। বঙ্কিমচন্দ্র শুদ্ধ তত্ত্বের ক্ষেত্রে অন্যান্য সামাজিক অধিকার, যথা শিক্ষার অধিকারের ন্যায় বিধবাদের বিবাহের অধিকার স্বীকার করিতেছেন, এবং অধিকার তত্ত্বানুযায়ী তাহার যৌক্তিকতাও স্বীকার করিয়া লইতেছেন। কিন্তু যাহা তিনি যুক্তির খাতিরে স্বীকার করিতেছেন, তাহাকেই তিনি প্রচলিত সামাজিক নীতিবোধের মানদণ্ডে পুনর্বার অস্বীকার করিতেছেন। কেন না, উপরোক্ত উক্তির দ্বিতীয় অংশেই তিনি ঘোষণা করিতেছেন যে, যে বিধবা তাহার পূর্বস্বামীকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছে সে পুনরায় বিবাহ করে না। এই উক্তির মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে বিধবা-বিবাহের প্রতি তাঁহার সহানুভূতিহীন মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ, কোন বিধবা যদি প্রকৃতই বাস্তবক্ষেত্রে

(৩৯) সাম্য ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; পৃ, ৩৯

তাহার বিবাহের অধিকার প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্তানুযায়ী তাহাকে কোনক্রমেই আর 'সাধ্বী' 'পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা' 'স্নেহময়ী' ইত্যাদি কোন বিশেষণেই ভূষিত করা যাইবে না। বরং সমাজধর্ম তাহাকে বার বার একথাটাই স্মরণ করাইয়া দিবে যে, সে তাহার পূর্বস্বামীকে 'আন্তরিক' ভালবাসে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিবাদ অনুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা কার্যকরী করিতে তিনি প্রস্তুত নন। সুতরাং তাঁহার কার্যকারিতা-বিমুখ অধিকার স্ববিরোধী। ইহার একাংশে 'হাঁ' এবং অপর অংশে অনুরূপ একটি 'না'। তাহা হইলে এই অধিকারের মূল্য কি? যে অধিকার বাস্তবে প্রয়োগ করিলে সমাজে নিন্দিত হইতে হইবে, সে অধিকারের প্রয়োজন কি?

সম্ভবত বঙ্কিম-মানসে এই স্ব-বিরোধ ধরা পড়ে নাই। ধরা না পড়িবার আরও একটি কারণ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র অনুভূতিকে তাহার নিজস্ব নিয়মে বিচার না করিয়া সমাজধর্মের সূত্রানুযায়ী তাহা নির্ধারণ করিতে চাহিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত 'সাম্য'-এর অধিকার বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রতিভাত হয়, যে একবার কাহাকেও আন্তরিক ভালবাসিয়াছে, সে দ্বিতীয়বার অন্য কোন ব্যক্তিকে আন্তরিক ভালবাসিতে পারে না ; অথবা দ্বিতীয়বার কেহ আন্তরিক ভালবাসিয়া ফেলিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, তাহার প্রথমবারের ভালবাসা সত্য ছিল না, তাহা কৃত্রিম। এই তত্ত্বে ভালবাসা অতএব ভালবাসা-গুণের আধার মনের ক্রমবিকাশমান, সৃষ্টিধর্মী, পরিবর্তনশীল প্রকৃতি স্বীকৃত হয় নাই ; ভালবাসা-গুণকে একটা অচল সত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া হ্রদের জলের মত স্থির ও স্থিতিশীল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, নদীর স্রোতের মত গতিশীল বলিয়া উপলব্ধি করা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের মন শুদ্ধ ভাবও (আইডিয়া) নয়, স্বয়ম্ভূও নয়। যে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে মন ক্রিয়াশীল, সেই পরিবেশ কর্তৃক ইহা প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিয়াছে, এবং পক্ষান্তরে সেই পরিবেশকেও সে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। একদিকে সৃষ্টিশীল মন, অন্যদিকে সৃষ্টিকারী পরিবেশ, এই দুই সত্যের পূর্ণ সঙ্গতির মধ্যেই একটি বিশেষ একক সত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই একের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া মন পরিবেশকে, ও পরিবেশ মনকে নিরন্তর সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে বলিয়াই ইহাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য। পরিবেশ হইতে যে অভিজ্ঞতা জন্মে তাহা পরিবেশের প্রতি মনের আচরণসম্ভূত, আবার মনের বিশেষ লক্ষণগুলিও পরিবেশ কর্তৃক

নিয়ন্ত্রিত। মনকে বাদ দিয়া পরিবেশ সত্য নয়, আবার পরিবেশ বাদ দিয়া মনও সত্য নয়।

সুতরাং মন ও পরিবেশের এই অবিচ্ছেদ্য সৃষ্টিশীল ধর্মের জন্যই এই মন-পরিবেশ সম্পর্ক স্থিতিশীল নয়; বা বিচ্ছিন্নভাবে মন বা পরিবেশও অপরিবর্তনীয় নয়। ইহাদের সম্পর্ক গতিশীল, এবং নিয়ত বিকাশমান। এই সম্পর্কের কোন একটি কেন্দ্রে সংগঠিত রূপান্তর সমগ্র পরিস্থিতিকেই রূপান্তরিত করে। মনের এই ক্রিয়াশীল প্রবহমান প্রকৃতির স্বীকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রে নাই বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার উক্তিতে একথাই সূচিত হয় যে, ভালবাসার পাত্র অন্তর্হিত হইলে অথবা সম্পর্ক বিনষ্ট হইলে মনের নূতন সম্পর্ক পাতার গুণও বিনষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ ভালবাসা রিপু-সেবার পর্যায়ে নামিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র আনুভূতিক সত্যের মানদণ্ডে অনুভূতিকে বিচার করেন নাই, আনুভূতিক সম্পর্ককে নীতিধর্মের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছেন। এই সম্পর্কের উৎস ও সত্যতা বাস্তব পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আছে কি নাই, তাহা বিচার করিয়া দেখেন নাই; নীতিধর্মের মানদণ্ডে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে চাহিয়াছেন। এই বিচারে যে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে-ই বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ, তাঁর প্রিয় পাত্রী। তাঁহার আদর্শ সাধ্বী স্ত্রী 'রজনী'র লবঙ্গলতিকা। লবঙ্গের "সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে" অমরনাথের জন্য এতটুকু স্থান আছে কিনা তাহার উত্তরে সে বলিতেছে, "না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।" (রজনী, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ; পৃ ৮৫) কুন্দ এই সনাতন আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। তাই তাহার ভালবাসা, তাহা আন্তরিক হইলেও পাপাচার, আর পাপাচার বলিয়াই তাহা ইন্দ্রিয়-দহন-সঞ্জাত। নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দর ভালবাসা অঙ্কুরিত হওয়ার পর হইতেই কুন্দকে এমন ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে যে, একটা পাপ-চেতনা সর্বক্ষণ তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া নিয়াছে, এবং তাহাকে ঘর-ভাঙ্গা কলঙ্কের কালিমায় লিপ্ত করিয়াছে।

অথচ কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রের সহানুভূতি ও উদার মনোভাব যে নূতন ভাবে কুন্দকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল, এবং নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দর অনুরাগ যে নূতন ভাবে নগেন্দ্রকেও সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল, তাহা শিল্পীর দৃষ্টিকে এড়াইয়া গিয়াছে।

আর সূর্য্যমুখীর স্বাভাবিক অহমিকার জন্যই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, সূর্য্যমুখী-নগেন্দ্র সম্পর্ক যে উত্তরোত্তর একটা প্রাণহীন গতানুগতিকে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, এ সত্যও শিল্পী উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ উপেক্ষার একমাত্র কারণ, শিল্পী আনুভূতিক সত্যকে মর্যাদা দানের জন্য অথবা নিরপেক্ষভাবে এই প্রবাহকে অনুসরণ করার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই, প্রচলিত নৈতিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই 'বিষবৃক্ষ' রচনা করিয়াছিলেন।

সুতরাং কুন্দর ট্র্যাজেডি অথবা কুন্দ-নগেন্দ্র সম্পর্কের ট্র্যাজেডি এই জন্য নয় যে, সামাজিক অচলায়তন ইহার সার্থক পরিণতির গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং কুন্দ-নগেন্দ্রের সীমাবদ্ধ শক্তি দুর্জয় সংকল্প লইয়া সংগ্রাম করিয়াও সেই অচলায়তনকে জয় করিতে পারে নাই। কুন্দর ট্র্যাজেডি এবং কুন্দ-নগেন্দ্র সম্পর্কের অনিবার্য ব্যর্থতা এইজন্যই যে, তাহা সনাতন নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে পাপাচারে নিমগ্ন হইয়াছিল। ব্যর্থতা এইজন্য নয় যে, সামাজিক সম্পর্ক তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে, ব্যর্থতা এই জন্য যে, তাহারাই বিধিবদ্ধ নৈতিক আচরণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। যে মানস-বিপ্লব ও ভাবতরঙ্গ নগেন্দ্রের সমস্ত নীতিবোধকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার প্রথম বাস্তব অভিব্যক্তির অব্যবহিত পরক্ষণে নগেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল; তাহার নীতিবোধ তাহাকে আঘাত করিতে থাকে আর কুন্দনন্দিনীর অগোচর পাপ চেতনা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে যে, সমস্ত সুখেরই সীমা আছে। কিন্তু কি ভাবে এই উদ্দাম ভাবতরঙ্গ নিমেষে প্রবল প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হইয়া গেল, তাহার সঙ্গত কোন মীমাংসা বঙ্কিমচন্দ্র করেন নাই। অবশ্য তাহা প্রত্যাশিতও নয়। কারণ, তাঁহার শিল্পসৃষ্টি নৈতিক তত্ত্ব প্রমাণের বাহনমাত্র; "সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণের" (ধর্ম্ম ও সাহিত্য; বিবিধ প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ; পৃঃ ১৮২) প্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত। নগেন্দ্র কুন্দকে ভালবাসিয়া অধর্মাচরণ করিয়াছিল; সুতরাং ফলভোগ মারাত্মক। ইহা শুধুমাত্র অনুভূতির বিক্ষেপ অথবা পাত্র পরিবর্তনের সমস্যা নয়, অথবা পরিবেশকে নূতনভাবে সৃষ্টি করার সমস্যাও নয়। নগেন্দ্রকে কয়েকটি নৈতিক অনুশাসন দ্বারা তাহার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহার ভাঙ্গা ঘর পুনরায় পরিপূর্ণ মাধুর্যে উজ্জল হইয়া উঠিবে। নীতিপ্রবণতার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং অথবা নগেন্দ্র কেহই কখনো একথা উপলব্ধি করেন নাই যে, সূর্য্যমুখী হইতে কুন্দনন্দিনীতে নগেন্দ্রের অনুভূতির

বিক্ষেপ তাহার একক আত্মগত মানস-প্রকরণের ফল নয়। সূর্য্যমুখী-নগেন্দ্র সম্পর্ক উত্তরোত্তর শিথিল হইতেছিল ; তাহার সজীবতা অন্তর্হিত হইয়া অনুষ্ঠান-পূত গতানুগতিক ধর্মাচরণে পর্যবসিত হইতেছিল ; তাহা স্পন্দনহীন হইয়া আসিতেছিল। তাই চরম সংকট মুহূর্তেও এই সম্পর্ককে অম্লান সৌষ্ঠবে বাঁধিয়া রাখার কোন প্রচেষ্টা সূর্য্যমুখী করে নাই। সেজন্যই নগেন্দ্রের পক্ষে প্রতিসংবেদী পরিবেশ সৃষ্টি করা অথবা তাহার আকর্ষণে সাড়া দেওয়া সহজ হইয়াছিল। কিন্তু অনুভূতির সঞ্চার, ক্রমবিকাশ অর্থাৎ অনুভূতির নিয়মে ইহা যত বাস্তব বা সত্যই হউক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে নগেন্দ্রের এই মানসিক বিক্ষেপ পাপ। কুন্দর ভালবাসাও পাপ। কেননা, মানবিক সম্পর্ক ধর্ম-সম্পর্কে রূপান্তরিত হইলেই তাহা সার্থক, অন্যথায় নয়। এই সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ'-এ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মানবিক সম্পর্ককে যথার্থ মানবিক সত্য দ্বারা বিচার না করিয়া অতিপ্রাকৃত সত্য দ্বারা বিচারের প্রচেষ্টা তাঁহার শিল্পক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে, এবং তাঁহার রক্ষণশীলতাকে প্রকট করিয়াছে। কোন নৈতিক তত্ত্বই বাস্তব-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সত্যের মর্যাদা পাইতে পারে না। বিশিষ্ট সামাজিক পরিবেশ এবং সম্পর্কের মধ্যে তাহার আবির্ভাব, আবার সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশিষ্টতারও রূপান্তর। বঙ্কিমচন্দ্র এই আপেক্ষিক পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক তত্ত্বের বিচার করিতে পারেন নাই ; তাই পরিবর্তিত সমাজবিন্যাসের বাস্তব পটভূমিতে রাখিয়া নৈতিক আদর্শের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করেন নাই, অথবা তাহার যাথার্থ্যও যাচাই করেন নাই। নৈতিক বিধানকে কালাতীত দেশাতীত মর্যাদা দান করিয়া সর্বকালের মানুষকে সেই বিধান অনুযায়ী স্ব স্ব আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই দৃষ্টিমার্গ হইতে সত্যে উপনীত হওয়া কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্রও পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া তাঁহার পশ্চাৎ আকর্ষণ অনুভূত হইল। বাস্তবকে রূপায়িত করার সংগ্রামে তিনি কতদুর অগ্রসর হইবেন, তাহার আভাসও প্রথম পদক্ষেপেই পাওয়া গেল।

কিন্তু নীতিশিক্ষার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াও কুন্দনন্দিনীর জন্য কয়েক বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করিতে হয়। কুন্দ চোখের সামগ্রী, হৃদয় দিয়া অনুভব করার সামগ্রী রূপে চিত্রিত না হইলেও পাঠকের সংবেদনার ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব অকিঞ্চিৎকর নয়। তাই কুন্দর মৃত্যু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা উৎপল-

কুমারীর মৃত্যু (৪০) নিষ্ফল হয় নাই। সমাজ মানসে তাহার প্রতিক্রিয়া হইয়াছে নিশ্চিত, আর বঙ্কিমচন্দ্র যে ফসল কামনা করিয়াছিলেন, সমাজ-মানসে তাহার বিপরীত প্রতিক্রিয়াই ফলিয়াছিল। এখানেও ঐতিহাসিক পরিবেশ তাঁহাকে ব্যর্থ করিয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, পরিবেশের কোনরূপ অপূর্ণতা ছিল না, অপূর্ণতা ছিল তাঁহার তত্ত্বের। তাই তত্ত্বকে বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেও তাহাকে চিরসত্যের মর্যাদা দান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই; কুন্দর প্রতি অপ্রকাশিত সহানুভূতি তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু বাস্তবকে নবরূপে রূপায়ণের জন্য গণ-মানসকে বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ ভাবে সংগঠিত করিতে হইবে। গণ-মানস বিশেষ অনুভূতিতে আন্দোলিত হইলেই চলিবে না, বিশিষ্ট কর্মে আন্দোলিত হইতে হইবে; মানসিক বিপ্লবকে কর্ম বিপ্লবে পরিণত করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বেই এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, পূর্বোদ্ধৃত 'বঙ্গদর্শন'-এর পত্রসূচনাতে তাহার সাক্ষ্য রহিয়াছে। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র স্থির সংকল্প লইয়া এই কার্য আরম্ভ করেন। মনটলানো ক্রিয়াকে বুদ্ধিটলানো ক্রিয়া দ্বারা পরিপূরণ করিতে সচেষ্ট হন। যে বুদ্ধির জড়তা ও আত্মোপলব্ধির দৈন্য সমসাময়িক বাঙ্গালী-মানসকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, এবং যে আচ্ছন্নতা সর্ববিধ ক্রিয়া সর্ববিধ আচরণে প্রতিভাত হইত, সেই জড়তা এবং আচ্ছন্নতার মোহের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নির্মম কশাঘাত হানিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দৃষ্টির এবং কর্মের পরিধি বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর হইতে থাকে। কিন্তু পূর্বেই বিশ্লেষিত হইয়াছে যে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক শিথিল হইতে থাকিলেও, এবং সরকারী অবহেলায় মধ্যবিত্তের বিক্ষোভ উত্তরোত্তর তীব্রতর হইতে থাকিলেও আত্মীয়তার শেষ বন্ধনটি তখনও ছিন্ন হয় নাই। তাই বঙ্কিমের পক্ষে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না। অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালা এবং বেদনার বিক্ষোভ বাইরের অবারিত অভিব্যক্তি বর্জন করিয়া অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। বঙ্কিম ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, উপহাসের সর্পিল পন্থা অবলম্বন করেন। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত এইরূপ রচনা লইয়া ১৮৭৪ সালে 'লোকরহস্য' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম তাঁহার শাণিত বিদ্রূপের নিষ্ঠুর সরু সরু আঙ্গুল তৎকালীন বাংলা সমাজের সর্বত্র প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন; কোন একটি

(৪০) 'এই কন্যাটিও কুন্দনন্দিনীর হতভাগ্য অনুকরণ করিয়াছিল।' 'আমার জীবন' নবীনচন্দ্র সেন।

অন্ধকার কোণও তাঁহার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। “যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সম্বাদপত্র এবং তীর্থ ‘ন্যাশানেল থিয়েটর’, তিনিই বাবু, যিনি মিসনারির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। ......যাহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা এবং কথোপকথন-কালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু” (বাবু, লোকরহস্য; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ২৩); অথবা, “এক্ষণে তপস্যাবলে ব্রহ্মার বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ” (গর্দ্দভ, ঐ, পৃঃ ২৫) ইত্যাদি ধরণের উক্তি নিছক লঘু হাস্যরসের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। পরিহাসের সহিত মিশিয়াছে আত্মগ্লানির চেতনা। আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপের হাসি-অশ্রুর অন্তরালে থাকিয়া বঙ্কিম শিক্ষিত গণ-মানসকে গ্লানির আচ্ছন্নতা হইতে টানিয়া বাহির করিবার ব্যাকুল প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রচণ্ড বেগে এই মোহজাল তিনি কাটিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই বুদ্ধি টলানোর কার্যক্রম অনিবার্যরূপে একটা সংকটে পরিণত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের মন ছিল পশ্চাতে, কিন্তু চোখ ছিল সম্মুখে। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের যুক্তিবাদ এবং বৈজ্ঞানিকদের নির্মোহ তত্ত্বানুসন্ধান প্রণালী তাঁহার বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করিয়াছিল। নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তিনি স্বদেশী সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, বিদেশী শাসনের স্বরূপ, সামাজিক বৈষম্যের উৎস ইত্যাদি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাঁহার রাষ্ট্রচিন্তায় যুক্তির বলিষ্ঠতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাঁহার মন ছিল অতীতের মোহময় স্বপ্নময় ইন্দ্রপুরীতে। তাই বুদ্ধির কথার সঙ্গে মনের কথার অপরিহার্য বিরোধ দেখা দেয়। বঙ্কিম-মানসে এক ঘোরতর সংকট সমুপস্থিত। একদিকে যুক্তিহীন আবেগ, অপরদিকে নির্মোহ যুক্তিবাদ, এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার মন ভয়ঙ্কর আলোড়িত হইতেছে। অথচ এই সংকটের মীমাংসা না হইলে একটা স্থিতিশীল ভিত্তি স্থাপনও সম্ভব নয়। আর সমাজ-মানসকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংগ্রথিত করাও সম্ভব নয়। ‘বঙ্গদর্শন’-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই বিরোধী মনোভাবের সমন্বয় খুঁজিতেছিলেন।

তিন

জীবনাচরণের সংকট এবং চিন্তার সংকট 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫)-এ চরম অভিব্যক্তি লাভ করে।

'চন্দ্রশেখর'-এ বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় রোমান্সের বর্ণ-সমারোহ এবং মোহময় পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং জীবনের পদ্য এবং গদ্য উভয় দিককেই একসূত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া আশ্চর্য লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর'-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য এই যে, ইহাতে জীবনের সর্বাঙ্গীন সংকট ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আর উপন্যাসে বর্ণিত এই সংকটের মধ্যে, এবং ঘটনার অনিবার্য প্রবাহস্রোতের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সমাজ-জীবনের সংকট এবং মনোজীবনের সংকট আবিষ্কার করা খুব কঠিন নয় বরং বাস্তব জীবনাচরণের সংকটই যেন অতীত পরিবেশের অচেনা আবহাওয়ায় পূর্ণতর রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, অর্থনৈতিক সংকটের চাপে জীবন অনিশ্চিত, দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে; আর এই সংকট দেশের সুদূর প্রান্তসীমায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কোলাহলহীন, শান্তিপূর্ণ জীবনপ্রবাহ সংকটমুখর অত্যাচারের আর্তনাদে পরিণত হইয়াছে। অর্থনৈতিক জটিল আবর্তে নিরীহ মানুষের জীবন তলাইয়া যাইতেছে। সমাজবিন্যাসের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য কোন ক্ষমাই আর অবশিষ্ট নাই।

জীবনের এই সংকট 'চন্দ্রশেখর'-এ দলনী বেগমের জীবন ইতিহাসে আশ্চর্য-ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দলনী বেগম ফুলের মত কোমল, আর প্রভাতের শিশিরকণার মতই সুন্দর ও নিরপরাধ: পৃথিবী তাঁহার নিকট সুন্দর, জীবন আরও সুন্দর! কিন্তু এই দলনী বেগমকেও রাজনৈতিক সংঘাতের ক্রূরচক্রে জড়াইয়া পড়িতে হইল, এবং ঘটনার অপ্রতিরোধ্য আবর্তনে তাঁহার আত্মাহুতি ছাড়া আর উপায়ান্তর রহিল না। তাঁহার একমাত্র চিন্তা, আসন্ন বিপর্যয়ের কঠিন আঘাত ব্যর্থ করিয়া মীরকাসেমের জীবন ও তাঁহার নিজের জীবন রক্ষা। জীবনের প্রতি এই নিষ্কলুষ মোহই তাঁহাকে অন্তঃপুরের বাইরে নিক্ষেপ করে এবং বিপর্যয়কে এড়াইবার প্রচেষ্টা সেই বিপর্যয়ের সম্ভাবনাকেই তীব্রতর করিয়া তোলে। গুরগণ খাঁর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ, ইংরাজের সহিত আপোষের

অনুরোধ, ফলে গুরগণ খাঁর নিকট অপ্রত্যাশিত লাঞ্ছনা, দুর্গে পুনঃপ্রবেশের পথ অবরুদ্ধ ; চন্দ্রশেখরের সহিত আকস্মিক সাক্ষাৎ, প্রতাপের গৃহে আশ্রয় লাভ, সেখান হইতে শৈবলিনীভ্রমে ইংরেজ কর্তৃক বেগমের অপহরণ, ফষ্টরের নৌকায় দলনী বেগম ও কুলসমের বাস ; মহম্মদ তকির ব্যর্থতা এবং আত্মদোষ ক্ষালনের জন্য মীরকাসেমের নিকট বেগম সম্পর্কে কুৎসিত মিথ্যাচরণ, কুলসমের সহিত বিচ্ছেদ, বেগমের মুঙ্গের আগমন,—প্রত্যেকটি ঘটনাই একটা অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে প্রচণ্ড বেগে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। নির্মম ইহার বন্ধন, আর অনিবার্য ইহার পরিণতি। ইহার ঘটনাধারাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁহার নাই, নিতান্ত শক্তিহীন, উপায়হীন, তৃণখণ্ডের ন্যায় দলনী বেগম ভাসিয়া গিয়াছে। পরিশেষে, নবাবের দৃষ্টিহীন, বিচারহীন, অ-ক্ষমা দলনীবেগমের মুখে বিষপাত্র তুলিয়া দিয়াছে।

এই চিত্রে জীবন-সংকটের মূর্ত অভিপ্রকাশ। সমাজ-দেহে বিভিন্ন শক্তির সংঘাত বাঁধিয়াছে, আর এই সংঘাতজাত গতিবেগ ও রূপ পরিগ্রহ করিয়া সমাজ নির্দিষ্ট ধারায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ব্যক্তিজীবন এই ঘটনাস্রোতের সহিত সমাঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না, যে ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া ইহা দাঁড়াইয়া আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, যাহা জীবনকে রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে মণ্ডিত করিয়াছিল, সেই আদর্শ অপরাজেয় শক্তির আঘাতে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, জীবন স্বাভাবিক মূল্য হারাইয়া ফেলিতেছে। জীবনের বিভিন্ন দিকে ঘটনার এই লীলা-বৈচিত্র্য, ইহার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিজীবন আত্মরক্ষার কোন অবলম্বনই খুঁজিয়া পাইতেছে না। দুরন্ত শক্তির অভিঘাতে ব্যক্তিজীবন বুদ্বুদের মত হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতেছে। এই মানস-চিত্রই চন্দ্রশেখরে ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে।

সংকট শুধু ব্যক্তি বিশেষের জীবনেই নয়, ইহা সর্বব্যাপী। প্রতাপ ভালবাসিয়াছিল ; কিন্তু তাহার ভালবাসা চরিতার্থ করিবার কোন উপায় ছিল না। এক্ষেত্রেও তাহার বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে প্রতাপ মুহ্যমান। সুতরাং জীবনের আকর্ষণ হারাইয়া সে আত্মহত্যার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু জীবনাস্বাদনের ক্ষেত্রে যেমন, মৃত্যু আস্বাদনের ক্ষেত্রেও তেমনি সে ব্যর্থ হইল। প্রতাপ জীবনের কোলাহলে ফিরিয়া আসে, কিন্তু ব্যর্থতার ফাঁককে কোন সুখের আশা দিয়াই সে আর পূর্ণ করিতে পারিল না। একটা পরাভব-চেতনা তাহার জীবনকে বিষাদের আনন্দে আপ্লুত করিয়া রাখে। অবশেষে ইংরাজের বিরুদ্ধে নিষ্ফল

যুদ্ধে সে আত্মবিসর্জন করে। মৃত্যুর পূর্বে সে বলিতেছে, "শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এজীবন আমার রাখা অকর্তব্য বিবেচনা করিলাম।...অতএব আমি চলিলাম।" একটা অজানা শক্তির নিকট, বিশেষ করিয়া যে সমাজ-শক্তি প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমকে সার্থক হইতে দেয় নাই, তাহার নিকট প্রতাপ আত্মসমর্পণ করে। সেই শক্তির সহিত তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা স্বীকার করিয়া প্রতাপ নিজেকে সরাইয়া দিল।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চন্দ্রশেখরের জীবনকেও এই সংকট স্পর্শ করিয়াছে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ঝড়ো হাওয়া, রাষ্ট্রলোলুপ জিঘাংসা, অসংযত-চরিত্র ইংরাজ কর্মচারীর কামাতুর দৃষ্টি তাঁহার ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; এবং পরিণামে, শুধুমাত্র লেখকের ন্যায়দণ্ড বিধির কল্যাণে চন্দ্রশেখর জীবনের স্থিতিশীল ভিত্তি পারিতোষিকস্বরূপ লাভ করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনের সংকট সর্বত্রই অনাহুতভাবে ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্রচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে। জীবনের সহজ প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহারা দিক্‌ভ্রান্তের ন্যায় পথে-প্রান্তরে বিচরণ করিতেছে।

এই ন্যায় দণ্ডবিধির পরিপ্রেক্ষণে স্রষ্টা শৈবলিনীকে একটা নৈতিক আদর্শ সংস্থাপনের দৃষ্টান্ত স্বরূপই ব্যবহার করিয়াছেন। তাই তাহার জীবনের সংকট যতখানি বাইরের অভিঘাতে, তাহার চেয়ে বহুগুণে বেশী অন্তরের অনুতাপে। শৈবলিনী প্রতাপকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু মুহূর্তের দুর্বলতায় সে প্রতাপের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিতে পারে নাই। তৎসত্ত্বেও প্রতাপের প্রতি তাঁহার ভালবাসা কখনও ম্লান হয় নাই। চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার বিবাহ প্রতাপের প্রতি তাহার প্রেমকে শিথিল না করিয়া আরও গাঢ় করিয়াছে; কেন না, শৈবলিনীর প্রেম-তৃষা চন্দ্রশেখর মিটাইতে সমর্থ হন নাই। এক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্কের বিচারে শৈবলিনীর মানসিক বিদ্রোহের সঙ্গত কারণ বর্তমান রহিয়াছে। বঙ্কিম-চন্দ্রের যুক্তিবাদ ও অধিকার-তত্ত্ব সম্ভবত ইহা অস্বীকার করিত না। কিন্তু যুক্তি-বাদের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণের কথা নয়। তাঁহার প্রাণের কথা, সনাতন নীতিধর্মের অনুশাসন দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা। শৈবলিনী ধর্মমতে চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করিয়াছে; সুতরাং, তাহার প্রেম-তৃষা চরিতার্থ না হইলেও

বিবাহের পবিত্রতা তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, কায়মনোবাক্যে নিজেকে বিবাহ-সম্পর্কের বিধানের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে. এমন কি মনে মনেও মুহূর্তেকের জন্য দ্বিচারিণী হইলে চলিবে না ; কিন্তু শৈবলিনী প্রতাপকে এবং প্রতাপ-শৈবলিনী সম্পর্ককে বিস্মৃত হইতে পারে নাই, তাই সে দ্বিচারিণী, তাহার প্রেম-তৃষা তাহাকে প্রতাপ-শৈবলিনী সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার অনুপ্রেরণায় ঘরের বাইরে টানিয়া আনিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক তত্ত্বানুযায়ী শৈবলিনী ধর্মের পথ হইতে বিচ্যুত হয় ; এই বিচ্যুতির কলুষ হইতে ধর্মাচারণের মহিমায় শৈবলিনীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যই তাহার প্রায়শ্চিত্ত, এবং যৌগিক প্রথায় তাহার চিকিৎসা। ইহাতে মানবিক সম্পর্ক অতিক্রম করিয়া ধর্ম-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শৈবলিনীর আত্মশুদ্ধিকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিমের বুদ্ধি-সংকট চরমে পৌঁছায়। বঙ্কিমচন্দ্র সমস্যাটিকে মন দিয়া দেখিয়াছেন, চোখ দিয়া দেখেন নাই। তাই এখানে তাঁহার বুদ্ধি পরাভূত, পূর্বসংস্কারই বিজয়ী। চন্দ্রশেখরকে পুরস্কৃত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রশেখরের প্রেমের আকর্ষণে অর্থাৎ জীবন্ত মানবিক সম্পর্কের আকর্ষণে তিনি শৈবলিনীর রূপান্তর সাধন করিতে পারেন নাই, আধ্যাত্মিক যোগবলের প্রহারে তাহার অনুরাগের মূল উৎস উৎপাটিত করিয়াছেন। রক্ত মাংসের মানুষকে হত্যা করিয়া তিনি কয়েকটি নৈতিক তত্ত্বকে শৈবলিনীর মধ্যে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন। তাই চন্দ্রশেখর রক্ত-মাংসের শৈবলিনীকে পুনর্বার লাভ করিয়াছেন কি অনুভূতিহীন ধর্ম-পুত্তলিকাকে পাইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের এ ক্ষেত্রে পরাজয় হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু এই জীবন সংকট এবং বুদ্ধি-সংকটের মধ্য দিয়াও অন্যায় সামাজিক প্যাটার্ণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আর রামানন্দ, চন্দ্রশেখর, প্রতাপের মাধ্যমে অতীতের মণি-কোঠার সঞ্চয় দ্বারা নূতন সমাজিক প্যাটার্ণ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ প্যাটার্ণ যতখানি না হাঁ-ধর্মী, ততোধিক না-ধর্মী। বিশুদ্ধ কল্যাণ ও আত্মত্যাগের আদর্শে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে অস্বীকারের নেতিধর্মের মধ্যেই ইহার বীজ নিহিত। রামানন্দ ও চন্দ্রশেখরের পরোপকার বৃত্তির মহিমা আছে, প্রতাপের আত্ম-বিসর্জনেরও মহিমা আছে, কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহাতে প্রতিষ্ঠা নাই। ত্যাগেই তা সমৃদ্ধ, ভোগে নয়। তাহারা বর্তমানকে

অস্বীকার করিল সত্য, কিন্তু কোন ভবিষ্যতকে ফিরিয়া পাইল না, এমনকি কোন অতীতকেও না। এই প্যাটার্ন কেন নেতিবাচক, কেন অস্বীকারের মধ্যেই তাহার পরিতৃপ্তি, তাহার সংকেতও বাস্তব জীবন সংকটের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। বাস্তব জীবনে যেমন বিদেশী শাসকের কূটনীতির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া মনোজগতে অতীত চমৎকারিত্বে গৌরব বোধ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, রামানন্দ-প্রতাপের ত্যাগ-ধর্মও যেন অনেকটা তেমনি। তাঁহাদের অস্বীকৃতির সহিত তুলনীয় কোন স্বীকৃতি নাই।

বুদ্ধির, আদর্শের এবং বাস্তব জীবনের এই যে সংকট চতুর্দিক হইতে জীবনের স্বাদ অপহরণ করিয়া চলিয়াছে, এবং সমস্ত সম্ভাবনাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া দিতে চলিয়াছে, তাহা সুতীব্র বেদনায় ও দুঃসহ তীব্রতা লইয়া 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ আত্মপ্রকাশ করে।

ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহার প্রভাব তাঁহার মানস-জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তন্মধ্যে একটি পারিবারিক গোলযোগ। ১৮৬৫ সালেই এই বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে,—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উইল করিয়া কাঁটালপাড়ার ভদ্রাসন মধ্যমপুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে বণ্টন করিয়া দেন। শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হন। এই বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রাতাদের মধ্যে অসদ্ভাবের আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশের (১৮৭৫) এক বৎসরের মধ্যেই এই বিরোধ চরমে পৌঁছায়। ফলে, ১৮৭৬ সালের শেষের দিকে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইয়া যায়, এবং বঙ্কিমচন্দ্র লেখাপড়া করিয়া সঞ্জীবচন্দ্রকে 'বঙ্গদর্শন' দান করেন, এবং তাহারই দুই এক মাস পর তিনি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া সপরিবারে চুঁচুঁড়ায় চলিয়া আসেন। বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় জীবনে যে শূন্যতা বঙ্কিম-মানসকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার সহিত পারিবারিক জীবনের এই অনুদার অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হইয়া তাঁহার শূন্যতাকে তীব্রতর, বিক্ষোভকে প্রচণ্ডতর আর সংকটকে প্রবলতর করিয়াছে সন্দেহ নাই। এই সময়কার আর একটি ঘটনা বহরমপুর (১৮৭৩—৭৪) ক্যান্টনমেন্টের কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল ডাফিনের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের কলহ। একদিন অফিস হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ণেল ডাফিন কর্তৃক লাঞ্ছিত হন এবং কর্ণেলের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে নালিশ করেন। এই মামলা লইয়া সহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং পরে প্রকাশ্য আদালতে সহস্রাধিক

লোকের সম্মুখে কর্ণেল ক্ষমা প্রার্থনা করায় বঙ্কিমচন্দ্র মামলা প্রত্যাহার করেন তৎকালীন বিক্ষুব্ধ সমাজ পরিবেশে, যখন বিদেশী শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, যখন পরাধীনতার চেতনা উন্মেষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই কালবৈশাখীর মত ক্ষুব্ধ আবহাওয়ায় ব্যক্তিজীবনের এই দুর্ঘটনাকে জাতীয় অপমানের ক্ষতচিহ্ন স্বরূপ গণ্য করা অসম্ভব অথবা অবাস্তব নয়। যাহা হউক, এই বেদনা, এই লাঞ্ছনা, শূন্যতা ও ক্ষোভ, কালবৈশাখীর উদ্দাম বেগে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

'কমলাকান্তের দপ্তর' অপূর্ব মানস-দ্বন্দ্বের ফসল। কথারম্ভের প্রথম ছত্র হইতে বিদায়ের শেষ ছত্র পর্যন্ত ইহা ঐ দ্বন্দ্বের কলরব ও বেদনায় মুখর। এই সংঘাতের মূল কথাটি এই,—শিল্পী-মানসের সহিত জীবনের সর্বাঙ্গীন বিরোধ দেখা দিয়াছে, বন্ধনের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সুখ-সান্নিধ্যের শেষ স্মৃতিটুকুও মুছিয়া গিয়াছে। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক আরোপিত জীবনের প্যাটার্ণ, প্রচলিত আদর্শ, সাংস্কৃতিক অঙ্গাবরণ, প্রচলিত রাজনীতি, জীবনাচরণের সমস্ত দিকের সহিত শিল্পী মনের ঘোরতর সংগ্রাম দেখা দিয়াছে; পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান, অথবা তাল মিলাইয়া চলা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইতেছে না। হয় বাস্তবকে বিশিষ্ট ধারায় রূপায়িত করিয়া শিল্পীমানস আপন কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, নয়তো বাস্তব ব্যবহারিক পৃথিবী সম্পর্কে তাঁহার আচরণ পরিবর্তন করিতে হইবে। এই সংকটের চরম অভিব্যক্তি রূপেই 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায়ই তাঁহার মানসদ্বন্দ্বের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে; সত্যই, "মানুষটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে।" (কমলাকান্তের জবানবন্দী)

গোটা সমাজের সঙ্গেই তাঁহার বিরোধ; "দেখিলাম, এ সংসার কেবল ঢেঁকিশালা। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা - তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি, গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি, প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া, নূতন নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের গড়ে পিষিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন—আইন; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস...। বাবু ঢেঁকি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছেন—পিলে যকৃৎ,... সর্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি—সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুলবুক!" (ঢেঁকি) অবশ্য 'ঢেঁকি' তাঁহার

পরবর্তীকালের রচনা। তথাপি ইহাতে কমলাকান্তের মনোজীবনের সুবিন্যস্ত নিখুঁত চিত্র রহিয়াছে বলিয়া এই প্রবন্ধ হইতেই উদ্ধৃত করিলাম। অন্যান্য প্রবন্ধে স্বতন্ত্র ভাষা ও চিত্রে যাহা ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাই এখানে একত্রে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। তাই 'ঢেঁকি'র উক্তিতে কমলাকান্তের মনোজীবনের চিত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না।

সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রোহ; "তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই?... দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?...পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন?......সমাজের ধন বৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?" (বিড়াল)

সামাজিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাঁহার আক্রোশ; "বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে, 'এসকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও।" (বিড়াল)

তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মনীতির সহিত তাঁহার বিরোধ; "ভাই পলিটিক্স্-ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগকে হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। 'জয় রাধে-কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!' ইহাই তোমাদের পলিটিকস্। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।" (পলিটিক্স্)

প্রচলিত সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে বিরোধ; "সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মিকী প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃতফল বেচিতেছেন; বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নীচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কিসের দোকান?' বালকেরা বলিল, 'বাঙ্গালা সাহিত্য।' 'বেচিতেছে কে?' 'আমরাই বেচি। দুই এক জন বড় মহাজনও

আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পত্রাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।' 'কিনিতেছে কে?' 'আমরাই।' বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম, খবরের কাগজে জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।" (বড়বাজার)

পরিশেষে, বিরোধ তাঁহার নিজের মনের সঙ্গে; "আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই—এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয়, মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের হইলাম না, এজন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই।" (আমার মন)

কখনও আশায় তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে; "সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা…এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব… (আমার দুর্গোৎসব)

কিন্তু পরক্ষণেই নিরাশা তাঁহার হৃদয় শূন্য করিয়া দিয়াছে; "এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই।" (একা) "উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম—আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা।' (বুড়ো বয়সের কথা) "তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় আধখানা।……বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার সা, ঋ, গ, ম কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন? তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।" (কমলাকান্তের বিদায়)

'কমলাকান্তের দপ্তর' শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আশাভঙ্গের ও জীবন সংকটের গীতি-কাব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন মানুষ এবং সামগ্রিকভাবে সমকালীন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক কি, পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে একে অপরকে কি ভাবে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, তাহার চিত্র ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কমলাকান্তের এই অভিজ্ঞতা শুধু তাহার একান্ত একলার নয়। বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতায়, তাহাদের বাস্তব জীবনাচরণে যাহা সাধারণ, যাহা সকলের, তাহাই এখানে ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে; তাই ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালকে অতিক্রম করিয়া অতি সহজেই বর্তমান কালের মানসকে

স্পর্শ করিতে পারিয়াছে ; এমন কি, আমাদের কালকেও অতিক্রম করিয়া তাহা সুদূর ভবিষ্যতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। 'বিষবৃক্ষ'-এর মত, এমন কি 'চন্দ্রশেখর'-এর মতও আমরা মনে করি না যে, কমলাকান্তের আকৃতি, তাহার মনোবেদনা, তাহার দুঃসহ নিঃসঙ্গতার অবস্থিতি আমাদের মনের বাইরে ; মনে করি না যে, তাহার অভিজ্ঞতার সহিত আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কোনও মিল নাই ; বরং তাহার অভিজ্ঞতার মধ্যে আমাদের ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার আশ্চর্য সঙ্গতি ও ছন্দোময় রূপায়ণ দেখিতে পাইয়া অভিভূত হই।

'কমলাকান্তের দপ্তর' সংবেদনশীল কবি মনের সৃষ্টি। তাই বিশুদ্ধ কাব্যের মত ইহা পাঠককে কমলাকান্তের হৃদয়ের অন্তঃপুরে টানিয়া নেয়, উপন্যাসের মত ইহা মনের বাইরে ছড়াইয়া পড়ে না। সে জন্যই ইহা সময়কে জয় করিতে পারিয়াছে; উপন্যাসে যে সময়ের পারম্পর্য পরিলক্ষিত হয়, 'কমলাকান্ত' এ তাহার একান্ত অভাব ; কারণ, এখানে ঘটনা নাই, আছে ভাবের সঙ্গতি যা তুলনায় অপরিবর্তনশীল। ইহা যেন সর্বকালের, সময়ের উর্ধ্বে। আরও উল্লেখযোগ্য, কমলাকান্তের ভাববিক্ষোভ কোন নির্দিষ্ট পরিপূর্ণ রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই ; বহুক্ষেত্রেই তাহা অস্পষ্টতার আবরণে আচ্ছন্ন। কিন্তু এই অ-স্বচ্ছতাই তাহার উক্তিকে দূরদৃষ্টি দিয়াছে, এই অসংগঠিত বিক্ষোভই তাহার উক্তিকে অপরিমেয় শক্তিতে সিঞ্চিত করিয়াছে। বহু মানুষের অভিজ্ঞতা কবি-মনের একটি মাত্র কেন্দ্রে সংহত ও কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই উক্তি একটা অবিশ্রান্ত প্রবাহের গতি অর্জন করিয়াছে।

কমলাকান্ত একা ; সাধারণের গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যে সে কোন ঐক্যই খুঁজিয়া পায় না। জীবনের যে প্যাটার্ণ সকলকে অনাহূতভাবে আপনার মধ্যে জড়াইয়া ফেলিয়াছে, কমলাকান্ত তাহাকে স্বীকার করিতে পারে নাই। ইতিপূর্বে সমসাময়িক সামাজিক কাঠামো এবং ভাব-বিক্ষোভের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, বর্দ্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহজ আত্মোপলব্ধির পথ অবরুদ্ধ হইতে চলিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর জীবনে নিদারুণ অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে, আর, নবজাগ্রত বণিকশ্রেণীও শিল্পায়ণের পথে সহজ অভিব্যক্তি লাভ করিতেছিল না। জীবনের এই 'না'-এর দিকে সর্বশ্রেণীর স্বার্থ একীভূত হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তই হোক, দরিদ্র চাষীই হোক, আর বিত্তশালী বণিক শ্রেণীই হোক, জীবনের 'না'-এর দিক সকলকে এক সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে নিজেকে অভিব্যক্ত দেখার এবং প্রতিষ্ঠিত

করার প্রেরণা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার সার্থক ব্যঞ্জনার দ্বার রুদ্ধ। সামাজিক প্যাটার্ণ আত্মোপলব্ধির এই প্রেরণার অস্তিত্ব ক্রমাগত অস্বীকার করিয়া চলিয়াছে, আর এই অস্বীকারের বেদনা হইতেই কমলাকান্তের হাহাকার, তাহার শূন্যতাবোধ কাব্যের মূর্ছনায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু জীবনের এই প্যাটার্ণকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করার জন্যও ব্যক্তি-মানস প্রস্তুত ছিল না। সামাজিক সম্পর্ক রূপান্তরিত করিয়া নিজেকে প্রকাশ করার জন্যও ইহা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ভাব-বিক্ষোভের আলোচনায় ইতিপূর্বে আমরা এই চাঞ্চল্যের পরিচয় পাইয়াছি। এই চাঞ্চল্যের তীব্রতা কত দূর, তাহার স্বাক্ষরও কমলাকান্তের দপ্তরে রহিয়াছে। কমলাকান্ত সুস্থিরভাবে ও সুসংহতরূপে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। বহু ভাব, বহু কথা, বহু সমস্যা একসঙ্গে আসিয়া তাহার মনের কোণে ভীড় জমাইয়াছে। সমস্ত ভাব একই সঙ্গে ব্যঞ্জনা লাভের জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করিতেছে; কমলাকান্ত তাহাদিগকে সংযত করিতে পারিতেছে না। তাই কখনও অতি চাঞ্চল্যে তাহার মুখের কথা জমাট বাঁধিয়া যাইতেছে, কখনও অনির্বাণ গতিতে একের পর এক প্রবাহিত হইতেছে। এই চাঞ্চল্যের স্রোতে যে রাজনৈতিক কার্যক্রম ও চিন্তার মধ্যে ঐক্য বা সঙ্গতি ছিল না, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কর্ম ও চিন্তাধারার জটিল আবর্তে কমলাকান্ত আপনাকে জড়িত করিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং সত্যিকারের দ্রষ্টার অনুভূতি ও দৃষ্টি লইয়া সে সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির সমালোচনা করিয়াছে; এই কর্মনীতির শোচনীয় ব্যর্থতা তাহার মনে ধিক্কারের প্রতিধ্বনি জাগাইয়াছে। আর কল্পনার সুউচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া সে মানসচক্ষে এই শ্রীহীন দেশের শ্রীময় কল্যাণময় মূর্তি (আমার দুর্গোৎসব) অঙ্কিত করিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়াছে। এক্ষেত্রেও, সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের অগোচরে, কমলাকান্ত ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মের ভিত্তি রচনা করিতেছিল; কারণ, পরবর্তীকালের জাতীয় মুক্তিআন্দোলনে কমলাকান্তের প্রভাব অনস্বীকার্য। এমনি ভাবেই বর্তমানের অধ্যাস ভবিষ্যতের বাস্তব উপলব্ধিতে পরিণত হয়।

কিন্তু তাহার সুতীব্র বেদনা, আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা, বলিষ্ঠ কর্মের উদ্দীপনা সত্ত্বেও কমলাকান্তের মানস-সংগঠন যেন পরাজয়ের চেতনায় সঙ্কুচিত। কলমাকান্ত এই অন্ধকার পথে এই বলিয়া নিজেকে প্রবোধ দিতেছে, "প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার

সংগীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্য-জাতির প্রতি যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।" (একা) যেখানে উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই, শ্রেণী-সংঘর্ষ নাই, সামাজিক রাষ্ট্রিক শোষণ নাই, যেখানে সর্বপ্রকার বৈষম্য পরাজিত, এইরূপ সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতি সহজ স্বাভাবিক অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু যেখানে বৈষম্যই নিয়ম, শোষণই শৃঙ্খলা, যেখানে অগ্রগমনের পথ অবরুদ্ধ, সেখানে বস্তু-নিরপেক্ষ সম্প্রীতির কল্পনা পরাজয়ী মনোভাবেরই পরিচায়ক। 'চন্দ্রশেখর'-এর আলোচনায় রামানন্দ ও চন্দ্রশেখরের জীবনচর্যায় আমরা যে নেতি-ধর্মী জীবন-প্যাটার্ণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, কমলাকান্তের সম্প্রীতি এই প্যাটার্ণেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই পরাজয়-চেতনা পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্পূর্ণভাবে অতীতের গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

অবশ্য এই আদর্শের পরোক্ষ ফলও উপেক্ষা করা যায় না। কেননা শুদ্ধ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও পরার্থপরতার স্বীকৃতি, নিজের স্বার্থকে অপরের স্বার্থের মধ্যে প্রতিফলিত দেখার চেতনা মানুষের সংবেদনা ও সমবেদনার পরিধি বিস্তৃত করিয়া দেয়। মানুষ নিজের মধ্যে পরকে, অথবা পরের মধ্যে নিজেকে দেখিতে পায়; আত্মাকে ছাড়িয়া বিষয়কে অবলম্বন করিতে শিখে। তাহার চেতনার সীমারেখা প্রসারিত হয়; এবং ইতিহাসের অমোঘ বিকাশ ধারায় তাত্ত্বিক চেতনা প্রত্যক্ষ বাস্তব কর্মে রূপায়িত হয়। আর এই নিয়মের প্রভাবেই মানুষ অতীতকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে যাইয়া কার্যত ভবিষ্যৎকে আহ্বান জানায়।

চার

উত্তর-'কমলাকান্ত' পর্যায়ে অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-কর্মের দ্বিতীয় পর্বের শেষ পাদেও তাঁহার মানস-দ্বন্দ্বের সমাধান হয় নাই, অথবা কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তেও তিনি পৌঁছাইতে পারেন নাই। এই পর্যায়ের এক দিকে 'রজনী' এবং অপরদিকে 'সাম্য' (বর্ধিত 'রাজসিংহ'কে এই পর্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত নয়); মধ্যবর্তী 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। প্রথম প্রান্তে মনের এবং দ্বিতীয় প্রান্তে চোখের অর্থাৎ বুদ্ধির প্রাধান্য; যে সংকট ও সংঘাত বঙ্কিম-মানসকে আলোড়িত করিতেছিল, তাহা নিজ নিজ পরিধির মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে মাত্র। বঙ্কিম-মানসে এই দুই বিরোধী প্রবাহের মিলন তখন পর্যন্তও সংগঠিত হয় নাই।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ যে মনোবেদনা, যে শূন্যতাবোধ, এবং যে আত্মধিক্কার রূপ পাইয়াছে তাহার রেশ 'রজনী'-তেও নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। অমরনাথ স্বীয় আত্মকাহিনীতে বলিতেছে, 'আর এক প্রকারে লোকের উপকারের ঢং উঠিয়াছে। তাহার এক কথায় নাম দিতে হইলে বলিতে হয় 'বকাবকি লেখালেখি।' সোসাইটি, ক্লব, এসোসিয়েশন, সভা, সমাজ, বক্তৃতা, রিজলিউশ্যন, আবেদন নিবেদন, সমবেদন,-- আমি তাহাতে নহি। আমি একদা কোন বন্ধুকে একটি মহাসভার ঐরূপ একখানি আবেদন পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কি পড়িতেছ? তিনি বলিলেন, 'এমন কিছু না, কেবল কানা ফকির ভিক মাঙ্গে।' এ সকল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাই কেবল 'কানা ফকির ভিক মাঙ্গে রে বাবা।'......সুতরাং এ বঙ্গ সমাজে আমার কোন কার্য্য নাই। এখানে আমি কেহ নহি-- আমি কোথাও নহি। আমি, আমি, এই পর্য্যন্ত; আর কিছু নহি।" (রজনী, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ; পৃ ৩২-৩৫) জীবনে সংকট কতদূর ঘনাইয়া উঠিয়াছে, এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের সহিত ব্যক্তি-মনের বিরোধ কতখানি তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অমরনাথের এই অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তি প্রমাণ করিতেছে। সামাজিক পটভূমিতে অমরনাথের চরিত্রও এই আশাহীন নিঃসঙ্গতা এবং "কাম্য বস্তুর অভাব" ও হাহাকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ; জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সামাজিক সম্পর্ক তাহার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করে নাই; এমন কি, তাহার এই শূন্যতায় সান্ত্বনার প্রলেপ দেওয়ার মত সঞ্চয়ও তাহার কিছুই ছিল না। প্রথম বয়সের বিচ্যুতির অপরাধে সারা জীবন সে প্রায়শ্চিত্ত করিল, কিন্তু মনের স্থৈর্য ও শান্তি সে ফিরিয়া পাইল না; তাহার ঘর বাঁধা হইল না। সম্ভবত, বঙ্কিমচন্দ্র অমরনাথকে অবলম্বন করিয়া সমসাময়িক পাঠকসমাজকে নীতিশাস্ত্রের ব্যবস্থাপত্র হইতে শিক্ষালাভ করিবার সংকেত করিয়াছেন।

কিন্তু অমরনাথকে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইলেও, শিল্পী রজনীর ভাগ্যবিধাতা-রূপে তাহাকে যেভাবে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহা বাস্তব সম্ভাব্যতার সকল সীমা অতিক্রম করিয়াছে। অমরনাথের সংগ্রাম এবং মনোবেদনার বাস্তব উৎস রহিয়াছে; প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্পর্ক হইতেই তাহার উদ্ভব। কিন্তু রজনীর পুরস্কার--অলৌকিক উপায়ে শচীন্দ্রনাথের হৃদয়ে রজনী-প্রেম সঞ্চার ও গ্রন্থশেষে রজনীর দৃষ্টিলাভ--প্রত্যক্ষ সামাজিক পরিবেশ হইতে অঙ্কুরিত হয় নাই। মানুষ রজনী অথবা মানুষ শচীন্দ্রনাথ পরস্পরকে সৃষ্টি করিয়া নূতন

সম্পর্ক স্থাপন করে নাই; দৈববলে তাহা সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষেত্রেও মানব-সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এবং অতিপ্রাকৃতের বিজয় ঘোষিত হইয়াছে। সেজন্যই অমরনাথের দুঃখ, তাহার সংগ্রাম সত্য, কিন্তু রজনীর পুরস্কারকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে মন বিদ্রোহ করে। এখানে মানবিক সম্পর্ককে তাহার সত্য মর্যাদায় চিত্রিত করা হয় নাই। কারণ, প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ারই আত্মগত এবং বিষয়গত দিক থাকে। আত্মগত দিকে তাহার অধ্যাস বা illusion, বিষয়গত দিকে তাহার বস্তু-সংকেত। রজনীর পুরস্কার লাভ ক্রিয়ার যে সংকেত তাহার সাক্ষাৎ বস্তু জগতে পাওয়া অসম্ভব। রজনীর মধ্যে তিনি যে পরিবর্তন আনিয়াছেন, তাহা কি সমাজ-সম্পর্ক কি শারীরবৃত্ত কোন দিক থেকেই সমর্থনযোগ্য অথবা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই ইহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। আর বস্তুজগতের সম্পর্কহীন বলিয়াই ইহা সত্যের মর্যাদা দাবী করিতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে, বঙ্কিম-মানসের সংকট তখনও মীমাংসিত হয় নাই। তাঁহার মনের দৃষ্টি ও চোখের দৃষ্টি পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে নাই। চোখ দিয়া তিনি দেখিয়াছেন রজনী, অমরনাথ, লবঙ্গলতিকা ও শচীন্দ্রনাথের মনকে; তাই তাহাদের মানস-দ্বন্দ্ব, চিন্তার অভিঘাত এবং ভাবজগতের সূক্ষ্ম বর্ণনা তাহাদের মনোজগতকে আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু তিনি মন দিয়া চিত্রিত করিয়াছেন রজনীর সৌভাগ্যকে। তাই, বস্তুজগতকে অতিক্রম করিয়া তিনি অপ্রাকৃতের সাহায্য লইতে কুণ্ঠিত হন নাই। বাস্তব বিশ্লেষণকে অতিপ্রাকৃতের ভাব-তরঙ্গ আসিয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহাতে মন পরিতৃপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু চোখের দৃষ্টিকে অন্যায়ভাবে খর্ব করা হইয়াছে। বোধ করি, শিল্পী হিসাবে তাঁহার ব্যর্থতা এখানেই চরম।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ (১৮৭৮) বঙ্কিমচন্দ্রের চোখের দৃষ্টি অর্থাৎ বিশ্লেষণ-ধর্মী মনন সুউচ্চ মার্গে পৌঁছায়। শিল্পী নিষ্কলঙ্করূপে নিজেকে সমসাময়িক সামাজিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিরপেক্ষভাবে তাঁহার পাত্রপাত্রীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাদের ভাবানুভূতির সূত্র আবিষ্কার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন; এবং এই উপন্যাসে তিনি এতখানি বিষয়গত সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, ঘটনা পারম্পর্যের শৃঙ্খল এমনভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন যে, ইতিপূর্বে 'বিষবৃক্ষ'-এও তাহা সম্ভব হয় নাই। প্রতি ধাপে ধাপে এই কাহিনী নিজেকে রচনা করিয়া চলিয়াছে, ঘটনা ঘটনান্তরে পরিণত হইয়াছে, কোথাও

ইহা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া অতিপ্রাকৃতের আবির্ভাবের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে নাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বাস্তব মানবিক সম্পর্ক পাত্রপাত্রীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে, এক অধ্যায় হইতে অতি স্বাভাবিক ভাবে আর এক অধ্যায়ে টানিয়া লইয়া গিয়াছে; মাঝপথে বিশ্রাম গ্রহণের অবকাশ তাহাদের ছিল না। এখানকার সবই আমাদের মনের বাইরে, আমাদের চোখের সম্মুখে সংগঠিত হইতেছে; ইহা কালে বিস্তৃত, 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মত ইহা কালের ঊর্ধ্বে নয়। সময়ের আনুপূর্ব এখানে নিখুঁত; অর্থাৎ ঔপন্যাসিক হিসাবে এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক আবির্ভাব। 'বিষবৃক্ষ'-এর সহিত দুই একটি বিষয়ের তুলনামূলক বিচার করিলেই 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর শ্রেষ্ঠতার নিঃসন্দেহ স্বাক্ষর মিলিবে। বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখীর ন্যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ভ্রমর নিষ্ক্রিয়ভাবে তাহার ভাগ্যের রূপান্তর লক্ষ্য করিয়া অপমানে, লাঞ্ছনায় কাঁদিয়া ওঠে নাই। ঘটনাস্রোতকে নিজস্ব কর্ম দ্বারা অংশত প্রভাবিত করিয়াছে; গোবিন্দলালের প্রতি তাহার অকারণ অভিমান ও ভিত্তিহীন সন্দেহ কাহিনীকে অদ্ভুতভাবে তরঙ্গায়িত করিয়াছে; 'বিষবৃক্ষ'-এর কুন্দ-নগেন্দ্র সম্পর্ক অপেক্ষাও এখানকার রোহিণী-গোবিন্দলাল সম্পর্ক, তাহাদের পারস্পরিক অনুরাগের সঞ্চার, বিকাশ ও পরিণতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এবং সময়ের আনুপূর্ব অনুসরণ করিয়া বিশ্লেষিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ঘটনার বিবর্তনের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছাড়াও পৃথক জগৎ রহিয়াছে, তাহাদের মনোজগৎ ছাড়া যে বহির্জাগতিক পরিবেশ রহিয়াছে, তাহার কথাও শিল্পী বিস্মৃত হন নাই। পাত্রপাত্রীর মানস সংগঠন-নিরপেক্ষ আন্দোলনও যে প্রত্যেকটি চরিত্রকে প্রতিনিয়ত বিক্ষুব্ধ করিতেছে, এবং কাহিনী ও তাহাদের নিজ নিজ জীবনকে পরিণতির দিকে ক্রমশঃ ঠেলিয়া দিতেছে তাহাও চমৎকার-রূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাস্তব পরিবেশ এবং উপন্যাসের পাত্রপাত্রী প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম ও ভাব দ্বারা উপন্যাসের গতি নিরূপণ করিয়াছে। খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রত্যেকে এই বিশেষ অখণ্ডকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদর্শিতাও তাঁহার মনকে অর্থাৎ সনাতন নীতিধর্ম-বোধকে জয় করিতে পারে নাই। নৈতিক তত্ত্ব প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য অথবা উপন্যাসকে বাহন করিয়া ধর্মে উপনীত হইবার জন্য তিনি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; রোহিণী চরিত্রের পরিণতিই তাহার সাক্ষ্য। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশ কালে এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রথম সংস্করণে রোহিণীকে অর্থলোলুপ,

কামাতুর, হীনচেতারূপে চিত্রিত করা হইয়াছিল।(৪১) "সে আড়ি পাতিয়া কথা শুনে, অর্থলোভে জাল উইল বদল করিতে নিজে উপযাচিকা হইয়া হরলালের সহিত সাক্ষাৎ করে, নির্লজ্জার মত শ্লোক আওড়ায়, চিরদিন দুষ্কর্মরতা দুর্বৃত্তার ন্যায় আগে টাকা লইতে চায়, শেষে হরলালকে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎ করিতে বলে।"......বঙ্গদর্শনে রোহিণী-চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন, "...... নির্জ্জল একাদশী করিত না ; পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে, সে মাছও খাইত। যখন পাড়ায় বিধবা-বিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, 'পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।'"(৪২) এইরূপ চরিত্রকে ভিত্তি করিয়া নৈতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিলে তাহা সঙ্গত ও রুচিসম্মত হইবে না. অথবা শিল্পদৃষ্টিতে ইহা কদর্য দেখাইবে, এই ভাবিয়াই সম্ভবত পরবর্তী সংস্করণে রোহিণী-চরিত্র রূপান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু রূপান্তরিত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কোনক্রমেই খর্ব করা হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও স্বয়ং ,বঙ্গদর্শনে, লিখিয়াছিলেন, "...অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'রোহিণীকে মারিলেন কেন ?' অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, 'আমার ঘাট হইয়াছে।' কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, একথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধিত হইব।"(৪৩)

সংশোধিত রোহিণী লোভীও নয়, দুশ্চরিত্রাও নয় ; হরলালের প্রতি তাহার স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতার চেতনাই তাহাকে কৃষ্ণকান্তের উইল চুরি করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, এবং অন্যান্য সামাজিক স্ত্রীপুরুষের ন্যায় সে-ও বাস্তব পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, বাস্তব সম্পর্ককে নূতনভাবে রূপায়িত করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কার্যে ব্যাপৃত ছিল। গোবিন্দলালের সহিত তাহার সম্পর্ক সম্পূর্ণ মানবিক ; তাহার দুঃখ-তাপ-সহা জীবনের প্রতি গোবিন্দলালের অযাচিত সমবেদনা, উইল চুরির জন্য তাহার অনুশোচনা এবং সর্বোপরি বারুণী পুষ্করিণীতে গোবিন্দলাল কর্তৃক রোহিণীর জীবন রক্ষার ভিতর দিয়া নূতন রোহিণীর জন্ম হইতেছিল, এবং সম্পূর্ণ মানবিক সম্পর্ক দ্বারা সে নিজেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে

(৪১) এ সম্পর্কে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম জীবনী'তে বিস্তৃত আলোচনা আছে। পৃ, ৩১৩-৩২২ দ্রষ্টব্য

(৪২) ঐ ; পৃ, ১১৫

(৪৩) ঐ ; পৃ, ৩২৩

পরিবেশকেও মনোজগতের আলোকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল। পক্ষান্তরে, এইসব কর্মের ভিতর দিয়া নূতন গোবিন্দলালেরও আবির্ভাব হইতেছিল; প্রথমত অবচেতন মনে, পরে অর্থাৎ ভ্রমরের অভিমান ও সন্দেহ প্রকাশ্যে ঘোষিত হওয়ার পর সচেতনভাবেই সে নিজেকে এবং রোহিণীকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল। তাহাদের পারস্পরিক সৃষ্টি-কর্মের সহিত বহির্জগতের আন্দোলন সংযুক্ত হইয়া এই সৃষ্টি-কর্মের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল কার্যত রোহিণী ও গোবিন্দলালকে পরস্পরের সান্নিধ্যে টানিয়া আনে। এই সম্পর্ক রচনায় তাহাদের পারস্পরিক আত্মগত হৃদয়াবেগের অবদান যতখানি, পরিবেশের অবদানও তাহা অপেক্ষা কম নয়। কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল ছাড়াও ভ্রমরের অভিমান, পাড়া-প্রতিবেশীর কদর্য ইঙ্গিত. ইত্যাদির অবদানও কম নয়। প্রত্যক্ষ নায়ক-নায়িকার কর্মের সহিত পরিবেশের আন্দোলন সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এই সম্পর্ক বাস্তব এবং সত্য; মানুষের সহিত মানুষের, এবং মানুষের সহিত প্রতিবেশের ঘাতপ্রতিঘাতের প্রক্রিয়ায় ইহা বিকাশ লাভ করিয়াছে। রোহিণী প্রচলিত সমাজ-সম্পর্কের উপর স্বীয় ইচ্ছা প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রত্যক্ষকে আপন কল্পনা অনুযায়ী রূপায়িত করার জন্য, এক দুঃসাহসিক অভিযানে যাত্রা করিয়াছিল, এবং ঘটনার পারম্পর্য তাহার এই সংগ্রামে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে, এবং ইহাকে সার্থক পরিণতির পথে লইয়া গিয়াছে। মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ হইতে এই অভিযানকে প্রতিরোধ করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

কিন্তু শিল্পী প্রচলিত সমাজ-ধর্মের সম্পর্ক হইতে ইহাকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন। তাই উপলব্ধির প্রথম যামেই তিনি উপন্যাসের বাঁক ফিরাইলেন। বহুদিনের অজানা গহ্বরে থাকিয়া যে হৃদয়াবেগ অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং অতি সন্তর্পণে ও সংগোপনে যাহা নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিমিষে স্তিমিত হইয়া গেল। প্রেম পরিতাপে পরিণত হইল। এই পরিণতি এতই আকস্মিক, এতই অপ্রত্যাশিত যে, যে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদর্শিতা এ পর্যন্ত উপন্যাসকে গতিশীল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা অকস্মাৎ নিঃসঙ্কোচে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হয়। বৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতার পরিবর্তে অকস্মাৎ উপন্যাসের গতিকে প্রতিরোধ করা হয়। কারণ, ততক্ষণে উপন্যাস পরিসমাপ্ত হইয়াছে, শিল্পীর দায়িত্বও শেষ হইয়াছে, এবং নীতিবিদের তত্ত্ব প্রমাণ-পর্ব আরম্ভ হইয়াছে

বঙ্কিম-স্বীকৃত নৈতিক তত্ত্বের বিচারে রোহিণীর অপরাধ, সে সামাজিক ধর্ম-নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে ; বিধবা হইয়াও সে নূতন করিয়া নূতন মানুষকে ভালবাসিয়াছে। অর্থাৎ, 'বিষবৃক্ষ'-এর আলোচনাকালে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মানদণ্ডে হয় সে তাহার বিবাহিত স্বামীকে জীবিতাবস্থায় আন্তরিক ভালবাসে নাই, নয়তো স্বামীর প্রতি তাহার ভালবাসা অকৃত্রিম সত্য হইয়া থাকিলে গোবিন্দলালের প্রতি তাহার অনুরাগ সত্য নয়, ইহা কাম-তৃষ্ণা মাত্র ; আর কাম-তৃষ্ণা বলিয়াই ইহা ভালবাসার সত্য মর্যাদা পাইতে পারে না। যে কোন দৃষ্টিমার্গ হইতেই বিচার করা হউক না কেন, রোহিণী দ্বিচারিণী। সে মানবিক সম্পর্ককে অতিক্রম করিয়া অনুভূতির উৎস কেন্দ্রকে বিশুদ্ধ করিয়া নিজের জীবনে ধর্ম-সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে নাই। সুতরাং সমাজ-ধর্মের নিকট এবং সমাজ-ধর্মের ধারক বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সে সহানুভূতিশীল মনোযোগ ও বিচার আশা করিতে পারে না। কুন্দ-নগেন্দ্র সম্পর্কের মত, এক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী-গোবিন্দলাল সম্পর্ককে মানবিক সম্পর্কের পরিপেক্ষিতে বিচার করিতে পারেন নাই, ধর্ম-সম্পর্কের অনুশাসন দ্বারা বিচার করিয়াছেন। আর অপরাধ শুধু রোহিণীর একার নয়, গোবিন্দলালেরও। গোবিন্দলালের অধঃপতন সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য ছিল, "গোবিন্দলালের······মনে মনে বিশ্বাস, সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্য, তাঁহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম্ম পরের সুখের জন্য, আপনার চিত্তের নির্ম্মলতার সাধন জন্য নহে। ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মের জন্য নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে পবিত্রতার জন্য পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য কোন কারণে পবিত্র, সে বস্তুতঃ পবিত্র নহে। তাহাতে আর পাপিষ্ঠে বড় অধিক তফাৎ নই। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধঃপতন হইল।"(৪৪) কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-এ গোবিন্দলালের চরিত্রে এই দুর্বলতা আরোপ করিলেও পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালকে অন্তত মানবিক সম্পর্ক দ্বারা বিচার করার মত উদারতা দেখাইয়াছিলেন। প্রথম তিন সংস্করণে গোবিন্দলাল ভ্রমরের মৃত্যুর পর আত্মহত্যা করিয়াছিল ; আত্মহত্যার মধ্য দিয়া তাহার সুতীব্র বেদনা ও দুঃখবোধই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু চতুর্থ সংস্করণের (১৮৯২) গোবিন্দলাল অতি-মানবে পরিণত হয়। শান্তি ও মোক্ষ লাভের আশায় ভগবানের আরাধনায় সে দেশে দেশে, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও এই সময়ে সমস্ত কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভগবৎ উপাসনায় নিমগ্ন

(৪৪) 'বঙ্কিম জীবনী'—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃ, ৩২১—২২

ছিলেন। চতুর্থ সংস্করণের গোবিন্দলাল বলিতেছে, "ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।" কিন্তু উপন্যাসের পরিণতিকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্তিত করা হইলেও বাস্তব মানবিক সম্পর্ক যে গোবিন্দলালকে সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার মৃত্যু বঙ্কিমচন্দ্র রোধ করিতে পারেন নাই। ভ্রাম্যমান যে নূতন গোবিন্দলালের সহিত আমরা পরিচিত হই, সে সুখদুঃখানুভূতির অতীত, সামাজিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র মানবিক সম্পর্কের পরিবর্তে ধর্ম-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তব সম্পর্ক দ্বারা গোবিন্দলালের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার সকল সম্ভাবনা অন্তর্হিত হওয়ায় শিল্পী তাহাকে এক কৃত্রিম জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই জগৎ কৃত্রিম, কেননা তাহা মানবিক গুণ বর্জিত। ক্রিয়াশীল, গতিশীল বস্তুজগৎকে সে আর সৃষ্টি করিতে পারিবে না। অথবা, তাহার প্রভাবে নিজেকেও আর সৃষ্টি করিতে পারিবে না। কোনরূপ বাস্তব বন্ধনই তাহার নাই; সে তাহার ঊর্ধ্বে। অথচ মন যখন তাহার সৃষ্টির ধর্ম হারায়, বাহ্য-সম্পর্কের চেতনা যখন তাহার লুপ্ত হয়, কার্যত তখনই তাহার মৃত্যু। শুদ্ধ তত্ত্বের মধ্যে যে বাঁচা তাহা বাঁচা নয়; কেন না, মনুষ্য-সম্পর্ক দ্বারা এই বাঁচার পরিমাণ কোন কালেই সম্ভব হইবে না। আর যাহা দ্বারা এই পৃথিবীতে ও সমাজে সত্যের পরিমাপ করা হয়, তাহা দ্বারা ইহার পরিমাপ সম্ভব নয় বলিয়াই তাহা কৃত্রিম।

এভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মন তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির উপর জয়ী হয়। কিন্তু উপন্যাসের পরিণতি প্রচার ধর্মমূলক হইলেও এবং স্রষ্টার উদ্দেশ্যের সহিত ইহার পূর্ণ সঙ্গতি থাকিলেও, এই আকস্মিক পরিণতি তাঁহার কলা কৌশলকে নিন্দিত করিয়াছে। প্রসাদপুরের প্রমোদকক্ষ পর্যন্ত ইহা একরূপ, আর রোহিণীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্ত হইতে ইহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। প্রথম পর্যায়ে আছে শিল্পীর চোখ, তাঁহার অপূর্ব বিশ্লেষণ শক্তি, পরিমিতি বোধ, সংযত ভাব-বিন্যাস ও বুদ্ধির প্রভা; আর দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে তাঁহার মন, যা বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করিয়া অবুঝভাবে কথা বলিতে ব্যগ্র, যা পাঠককে সে কথা বুঝাইবার জন্যও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে কুণ্ঠিত, যা সামাজিক নীতিধর্মের মূল্য যাচাই না করিয়াই মানুষকে ইহার নিকট নতি স্বীকার করিতে বলে, এবং যা সমাজ-ধর্মের বিরোধিতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করিতে ব্যস্ত। কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে, এক্ষেত্রে মনের উপলব্ধি চোখের দৃষ্টির নিকট

পরাজিত হইয়াছে। তাই, এই অতর্কিত পরিণতিতে পাঠকের মন আহত হয়, তাহার রসবোধ পরিতৃপ্ত হয় না। আর একথাও স্বীকার্য, বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-দ্বন্দ্ব অর্থাৎ চোখের দৃষ্টির সহিত মনের দৃষ্টির বিরোধের মীমাংসা বা সমাধান তখনও হয় নাই; বিশেষ ক্ষণে এক পক্ষ আরেক পক্ষের উপর প্রাধান্য অর্জন করিতেছে, এবং পরক্ষণেই আবার পরাজিত হইতেছে। চক্রাকারে এই দ্বন্দ্বের আবর্তন চলিয়াছে।

কিন্তু সমাজ পরিবেশের বিরুদ্ধে রোহিণীর সংগ্রাম বাস্তব ও সত্য। সমাজ দেহের চাপে যে শক্তি সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা যে পুনরায় জাগিয়া উঠিতেছে এবং সমাজ দেহের চাপ যে উত্তরোত্তর হ্রাস পাইয়া আসিতেছে. রোহিণীর সংগ্রামের ভিতর দিয়া তাহা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবহারিক জীবনেও আমরা এই চেতনার আশ্চর্য শক্তি ও সংহতির পরিচয় পাইয়াছি। এই জাগরণ ও প্রতিবাদ সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে, ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে, অন্যায় সমাজ সম্পর্কের বিরুদ্ধে। অস্বীকৃত ও উপেক্ষিতের বেদনা ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এই জাগরণের অভিব্যক্তি সতেজ ও সরব। প্রথম প্রকাশেই ইহা আত্মবিশ্বাসে প্রাণবন্ত এবং দুঃসাহসিকতায় দুরন্ত। জীবনের সংকট যেমন সত্য, তাহাকে জয় করার প্রতিজ্ঞাও তেমনি সত্য. আর এই দুই শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে অলক্ষ্যে ইতিহাস নিজেকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য, রোহিণীর আত্মোপলব্ধির জন্য জীবনের যে নূতন প্যাটার্ন কাম্য, সে প্যাটার্ন বাস্তব সংগ্রামের অংশীদার বঙ্কিমচন্দ্রের কাম্য নহে; তাই রোহিণীকে তিনি শুধু অস্বীকারই করিতে পারেন।

(কিন্তু মন তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেও চোখ তাঁহাকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার নিষ্করুণ যুক্তিবাদ, তাহার সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসা গোপনে তাঁহাকে মনের সংস্কারের উর্ধ্বে উঠিবার অনুপ্রেরণা দিতেছিল, এবং তাহাই 'সাম্য' (১৮৮০) এই 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা', 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'বাংলার ইতিহাস' ইত্যাদি প্রবন্ধে বিদ্রোহের রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দ্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ" (সাম্য); "সুবিজ্ঞ লেখক বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই

লিখিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন।... অনেকেই বলিবেন ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যে সাদৃশ্য কল্পনা সুকল্পনা নহে; কেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি—ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি। ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্নজাতির পীড়ন, উভয়ই সমান" ; (ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা ; বিবিধ প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; পৃঃ ১১০) "আইন আছে—সে আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হয় না কেন? আদালত আছে—সে আদালতে দোষী জমীদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দুর্ব্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না—সে আইন, আইন কিসে?.. আমরা যে সভ্য হইতেছি, দিন দিন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহার একটি পরিচয়। আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন আসিয়াছে। জাহাজে আমদানী হইয়া চাঁদপালের ঘাটে ঢালাই হইয়া, কলিকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে ওকালতি, হাকিমি, আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।...আমরা বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলেই নির্দ্দোষ হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে।" (বঙ্গ দেশের কৃষক, ঐ ; পৃ, ২৬৮-৯, ২৭০-১, ২৭৩) এইরূপ বিদ্রোহাত্মক কথা তৎকালীন সমাজে আর কেহ বলে নাই। যুক্তিবাদের নির্মোহ আঘাতে বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী শাসন ও স্বদেশী শোষকের স্বরূপ, তথাকথিত জনকল্যাণ-বাগীশদের আচরণের ফাঁকিটুকু এবং চিন্তাধারার জড়তা উদ্ঘাটিত করিতেছিলেন এবং এই বিস্ফোরণে প্রচলিত সমাজ-সম্পর্ক শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

পক্ষান্তরে, এই বিদ্রোহের ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-দ্বন্দ্বেরও মীমাংসা হইতেছিল। পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন মানুষের হৃদয় যতখানি দুলিয়াছিল, বুদ্ধিবৃত্তি ততখানি আন্দোলিত হয় নাই ; বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক আলোড়নও তাঁহার বুদ্ধি-বৈকল্যকে সহজেই ছাপাইয়া যাইত। সুতরাং বিদ্রোহের তরঙ্গাঘাত চিত্ত-রাজ্যেই লাগিয়াছিল বেশী। কিন্তু বুদ্ধির সংযত জিজ্ঞাসার সহিত চিত্ত-বিক্ষোভের মিলন এতকাল সম্ভবপর হয় নাই। তাই বঙ্কিম-মানস আত্ম-বিদ্রোহে ক্ষুব্ধ ছিল। এইবার বুদ্ধির অবিসম্বাদিত প্রাধান্যের

অন্তরালে সংগোপনে এই মিলন সংগঠিত হয়। কিন্তু চিত্ত-ক্ষোভের প্রাবল্যের দরুণ ইহার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হয় নাই। তিনি চোখের দৃষ্টিকে মনের দৃষ্টি দ্বারা খণ্ডিত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সমকালীন মানুষের চিন্তা-বিভ্রমের মধ্যেই সামাজিক দুর্নীতির মূল নিহিত রহিয়াছে। চিন্তার এই আচ্ছন্নতা বিদুরিত হইলেই সামাজিক ন্যায়বিচার বোধ এবং কল্যাণের প্রতিষ্ঠা সহজ হইবে। এই সমন্বয়ে মনকে সংশোধিত এবং বুদ্ধিকে খর্ব করিতে হইল। সনাতন সামাজিক ধর্মবোধ, ধারণা কল্পনা, সামাজিক ন্যায়বিচার আদর্শের মধ্যে যতখানি গ্রহণ করিয়া নব আদর্শের সহিত তাহার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হইবে, ততখানি গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ অগ্রাহ্য করা হইল, এবং নূতন যুক্তিবাদী আদর্শকেও খণ্ডিত আকারে গ্রহণ করা হইল। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সামঞ্জস্য বিধানের ভিত্তি। এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমীদারদের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে।...এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদারদিগেরই হাতে। যদি কোন পরিবারে পাঁচভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুইভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্র সংশোধন জন্য যত্ন করেন। জমীদার সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য 'এই যে, তাঁহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না—জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ,"(সাম্য) "শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালীর ভরসা ;" (অনুকরণ ; বিবিধ প্রবন্ধ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ৭৫) "ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খ্রীষ্টধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দু-দিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসম্মত এবং নৈসর্গিক। ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নহে", (ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে, ঐ, পৃঃ ২২০), ইত্যাদি।

এই সমন্বয় সংস্থাপিত হওয়ায় বঙ্কিম-মানসের সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের চিরতরে সমাধান হইয়া যায়। বুদ্ধির রসায়নাগারে মনের আচ্ছন্নতাকে কোন্ মাত্রায়

কিভাবে সংশোধিত করিতে হইবে, 'সাম্য'-এর বিদ্রোহ ও শান্তির ভিতর দিয়া সেই শিক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের হইয়াছে। ইহার পর মনের অনাবিল অভিপ্রকাশ ও স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠায় আর কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। বঙ্কিমচন্দ্র এই সমন্বয়ের আলোকে অতীতকে সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইলেন। তৃতীয় পর্বের উপন্যাস ও প্রবন্ধের মাধ্যমে সেই প্রচারের অভিযান। এই পর্বের বঙ্কিম-মানসও তাই শান্ত, সমাহিত এবং শক্তিদৃপ্ত। এই পর্যায়ে কেন তিনি সাম্যের আদর্শ বর্জন করিয়াছিলেন, তাহাও উপলব্ধি করা কঠিন নয়।(৪৫)

(৪৫) 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর ভূমিকায় (বিবিধ প্রবন্ধ, পৃ, ২৩৪) বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' 'বিলুপ্ত' করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এবং তাঁহার সম-সাময়িক লেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমবাবু বলেন, 'এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে।' নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, 'সাম্য'টা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।' "—'বঙ্কিম প্রসঙ্গ', পৃ, ১৯৮

স্রষ্টা ও সৃষ্টি : তৃতীয় পর্ব

এক

দ্বিতীয় পর্বের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-দ্বন্দ্ব মীমাংসিত হওয়ায় তৃতীয় পর্বে বঙ্কিম-মানস নূতন রূপ লইয়া আবির্ভূত হয়। প্রথম পর্বে আমরা তাঁহার অপরিমেয় প্রাণপ্রাচুর্য ও আনন্দবেগের পরিচয় পাইয়াছি; দ্বিতীয় পর্বে ইহার সহিত নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ক্ষমতা সংযোজিত হয়; এবং এই পর্বেরই শেষভাগে বঙ্কিম-মানসের দুইটি স্বতন্ত্র ধারার—অর্থাৎ মনের অতীত আকর্ষণ এবং চোখের সম্মুখ-দৃষ্টি—মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়; ফলে, তৃতীয় পর্বে প্রাণ-প্রাচুর্য ও আনন্দবেগ, এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির সহিত তাঁহার নবাবিষ্কৃত সমন্বয়ের প্রচার সংযুক্ত হয়। প্রথম পর্বের অদ্ভুত গতিবেগ, দ্বিতীয় পর্বের আশ্চর্য বিষয়কেন্দ্রিকতা ও বিশ্লেষণধর্মিতা এবং তৃতীয় পর্বের সুদক্ষ প্রচার-ক্রিয়া, এই তিনের সমন্বয়ে তাঁহার রচনাকৌশলও রূপান্তরিত হয়। প্রত্যেকটি গুণই এখানে সমভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকলা শুধুমাত্র শিল্পকলা নয়; ইহা নৈতিক তত্ত্বের বাহন। আর ইহাও বিশ্লেষিত হইয়াছে, দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক কারুকারিতার অন্তরালেও নৈতিক তত্ত্বের প্রচার কোনক্রমেই পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। তৃতীয় পর্যায়ে তাঁহার এই প্রচার—নবাবিষ্কৃত সমন্বয়ের বাস্তব প্রয়োগ ও ইহার কার্যকারিতা প্রদর্শন - তাঁহার রচনা-কৌশলকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে। অবশ্য তাঁহার সাহিত্যভঙ্গীর অপূর্ব চলমানতা তাঁহার রচনাকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু ভঙ্গীর কথা ছাড়িয়া দিলেও এই পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার মানস-দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়াছে। সেই মীমাংসায় তিনি মনের আচ্ছন্নতাকেও প্রয়োজনমত বর্জন করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টিকেও খর্ব করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে প্রাচীন ও বিদেশাগত সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতের কলরব অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশী শাসক কর্তৃপক্ষের নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হিন্দু-মানস প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির কোলে আশ্রয়লাভ করিতে থাকে। নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মরাও তাঁহাদের কৌলীন্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। ১৮৭২ সালে রাজনারায়ণ বসু হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন; এবং স্বীয় প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ১৮৭২ সালের সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্টের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কেশবচন্দ্র হিন্দুমতে কোচবিহারের রাজার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন, ১৮৭৩ সালে আদি ব্রাহ্ম সামাজে প্রাচীন উপনয়ন পদ্ধতি প্রচলিত হয়। আরও দুই এক জন "প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম"(৪৬) হিন্দুমতে পারিবারিক বিবাহ ইত্যাদি সম্পন্ন করেন। কিন্তু এই সব আন্দোলনের তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া হিন্দু-মানস স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর 'আর্য-সমাজ' আন্দোলনের উচ্ছ্বাসে দুলিয়া উঠিয়াছে। আর খাস কলিকাতায় কিছুকাল পরে অর্থাৎ ১৮৮৫ সাল হইতে শশধর তর্কচূড়ামণিকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন হিন্দু ধর্ম স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং এই শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের যুদ্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য গ্রহণের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এই মানসিক আলোড়নের কোলাহলে বঙ্কিমচন্দ্রও অংশ গ্রহণ করেন। সমাজ-মানসে যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে, তাহা বিদূরণের জন্য এবং ইহাকে একটা স্থিতিশীল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমন্বয়ের আদর্শ লইয়া অগ্রসর হন। ১৮৮০-৮১ সাল হইতে তিনি ধর্মতত্ত্ব ও হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য লইয়া গভীরভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সহিত এই সময়ে তাঁহার পজিটিভিজম্ সম্পর্কে আলোচনা হইত, এবং তাঁহার সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে হিন্দুধর্ম গ্রাহ্য তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি ঘোষ-মহাশয়কে কয়েকটি পত্র লেখেন। ১৮৮২ সালের নবেম্বরে জেনারেল এ্যাসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেবের সহিত হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব লইয়া তাঁহার বাদানুবাদ হয়। সে সময়কার 'ষ্টেটস্ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সব পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সমন্বয় ও সংস্কারধর্মী মনোভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহারও বৎসর দুই পরে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার বিতর্ক হয়। এই সময়ে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সহিত সংশোধিত আকারে সমন্বিত হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হন।

(৪৬) আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু, পৃ, ১৯৭—৮

ধর্ম-বিতর্কের এই আলোড়ন ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়, যাহার প্রভাব বঙ্কিম-মানসে অনস্বীকার্য। ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারীতে বঙ্কিমচন্দ্র হাবড়ায় বদলি হন, এবং এখানে কার্যভার গ্রহণ করার অনতিবিলম্বেই কালেক্টর সি, ই, বাকল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার ঝগড়া হয়। এই ঘটনার কিছুকাল পরে, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, বঙ্কিমচন্দ্র অস্থায়ীভাবে বাংলা গভর্ণমেণ্টের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৮৮২ সালের জানুয়ারী মাসেই অকস্মাৎ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদ বিলুপ্ত করা হয় ; এবং গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এই বিভাগেও (৪৭) 'আণ্ডার সেক্রেটারি'র পদ সৃষ্টি হয়। তৎকালীন সরকারী বিধান অনুযায়ী এই পদে ভারতীয়দের নিয়োগের কোন সুযোগ ছিল না। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র নবনিযুক্ত আণ্ডার সেক্রেটারি ব্লাইথ সাহেবকে চার্জ বুঝাইয়া দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সমসাময়িক দৈনিক পত্রিকাদিতে যেমন 'বেঙ্গলী' 'স্টেটস্‌ম্যান'-এ লেখালেখি হয়। ক্ষুব্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় উক্ত পদের অবলুপ্তিকে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্যের নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে উক্ত বিভাগের সেক্রেটারি মেকলে সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের মনোমালিন্যও স্মরণীয়। কিন্তু উর্ধ্বতন অফিসারদের সহিত মনোমালিন্যের পর্ব এইখানেই শেষ নয়। ১৮৮৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় হাবড়া বদলি হন। সেখানে কার্যভার গ্রহণের অল্পদিন পরেই তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট ই, ভি, ওয়েস্টমেকৃট সাহেবের সহিত তাঁহার গুরুতর ঝগড়া হয়, এবং ইহা এমন ভয়ানক রূপ ধারণ করে যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বদলি না হইলে সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রকে চাকুরী ত্যাগ করিতে হইত।(৪৮)

কর্মক্ষেত্রের এই বিষাক্ত আবহাওয়ার অন্তরালে এবং বাকল্যাণ্ড সাহেবের সহিত বিবাদ চলিতে থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ব্যাক্তগত জীবনের এই সব বিচ্ছিন্ন ঘটানা ছাড়াও বৃহত্তর জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে ১৮৮২ সালের প্রথম পাদে "ইলবার্ট বিল"কে অবলম্বন করিয়া ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হয়। ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতা যাহাতে দেশী বিচারকের হাতে না বর্তায় সেজন্য ইউরোপীয়

(৪৭) বঙ্কিমচন্দ্র রাজস্ববিভাগে (Financial Department) সহকারী সেক্রেটারির পদ পাইয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য, 'বঙ্কিমজীবনী'— শচীশ চট্টোপাধ্যায়, পৃ ১২৭-৮

(৪৮) বঙ্কিম জীবনী— শচীশ চট্টোপাধ্যায়, পৃ ১৩৪-৬

সমাজ লর্ড রিপনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং এই বিলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন। এমন কি, ইউরোপীয় সমাজ আত্মরক্ষার জন্য একটি আত্মরক্ষা কমিটিও গঠন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়দের এই হাস্যকর আত্মসম্মানবোধে ইউরোপীয়-ভারতীয় সম্পর্কের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। ইউরোপীয়দের প্রতি দ্বেষ, বিদ্রূপ ইত্যাদি বর্ধিত হইতে থাকে। 'আনন্দমঠ' রচনায় নিয়োজিত বঙ্কিম-মানস এই বিক্ষুব্ধ পটভূমি হইতেও রস টানিয়াছিল।

এই পর্বে বঙ্কিমের সমস্যা, অধ্যাস (illusion) দ্বারা বাস্তবের নব রূপায়ণ এবং এই রূপায়ণের মাধ্যমে তাঁহার নবাবিষ্কৃত সমন্বয় অথবা ধর্মতত্ত্বের নিদর্শন স্থাপন। প্রথম পর্বের 'মৃণালিনী'-তে এবং দ্বিতীয় পর্বের 'চন্দ্রশেখর' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ আমরা তাঁহার অধ্যাসের পরিচয় পাইয়াছি। তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের অথবা পুনরুদ্ধারের সংকল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় পর্বের রচনায় তাহা পূর্ণাঙ্গ সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় রোমান্সের স্বর্ণ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কারণ, রোমান্সের মধ্যেই জীবনের হাসি ও অশ্রু, আনন্দ ও নিরানন্দকে এক সূত্রে সংগ্রথিত করা সম্ভব এবং সহজ। অন্য কথায়, সামাজিক উপন্যাসে যে বিষয়গত দিকের, মনের বাহিরের বহু উৎস-কেন্দ্র হইতে রস ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহের স্বাক্ষর পাই, রোমান্সে সেই বিষয়মুখীনতার স্বাভাবিক স্বাক্ষর থাকে না। এখানে আত্মগত দিকের, স্রষ্টার মনের একক উৎস হইতে পৃথিবীকে চিত্রিত করার মানসিক ভঙ্গীর, প্রাধান্য। উপন্যাসে বস্তুজগতের আর রোমান্সে মনোজগতের প্রাধান্য। 'আনন্দমঠ'-এও মনোজগতের প্রাধান্য। দ্বিতীয় পর্বের আলোচনার প্রারম্ভে এবং এই পরিচ্ছেদেরও সূচনায় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনায়াসলভ্য ইঙ্গিত এই যে, বাস্তব মানুষের জীবন নিরাশায় এবং সহায়-সম্বলহীনতায় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে; এখানে আশা চরিতার্থ হয় না, দুঃখের নিরসন নাই, জীবনের নিরাপত্তা নাই। সামাজিক মানুষের ধন প্রাণ মান ধর্ম সমস্তই নিঃশেষে লোপ পাইতে বসিয়াছে, শাসনতন্ত্র এখানে বিকল, শাসকগোষ্ঠী হৃদয়হীন। কল্পনার সাহায্যে এই শৃঙ্খলাহীন অনাচারী ব্যবস্থার অনুরূপ চিত্র অব্যবহিত অতীত ইতিহাসের খাতায় খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর নয়। বৃটিশ শাসনের প্রথম পর্যায়ের দুঃখ-তাপ-ভরা স্মৃতি তখনও লোক-মানসে সজীব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই অতীত চিত্রে বাস্তবকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বাস্তবকে নিজ অধ্যাস অনুযায়ী রূপান্তরের কার্যে অগ্রসর হন; সেই

চিত্র প্রাচীন হইলেও তাহার সংকেত ভবিষ্যতের পানে ; কাঠামো পুরাতন হইলেও তাহাতে বর্তমানের জীবন্ত স্বাক্ষর।

ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করার আনন্দে এবং ইহার স্বপ্নময় আবেশে চঞ্চল বঙ্কিম-মানস অ-সত্য ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত। অ-সত্য বলিতেছি এই জন্য যে, বঙ্কিম ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাহিনীর প্রতি আক্ষরিক আনুগত্য প্রদর্শন করেন নাই। বাস্তব ইতিহাসের মূল কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া তিনি অবাস্তব কাহিনী সৃষ্টি করেন ; কেন না, তখন সেই মুহূর্তে অতীত কাহিনী তাঁহার নিকট ভবিষ্যতের গৌরব ও মহিমা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। মুসলমান শাসনের অবনতির যুগে রাজকর্মচারিদের অমানুষিক অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া হিন্দু এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অ-হিন্দু প্রজাগণ দলবদ্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এই ঐতিহাসিক সত্যের আশ্রয়ে থাকিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অ-সত্য ইতিহাস রচনা করেন, অথবা প্রয়োজনবোধে সত্য সৃষ্টি করেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার লিখিতেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র···গোড়ায় গলদ, তাঁহার 'সন্তানেরা' বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত ; কিন্তু যে সব "সন্ন্যাসী ফকিরেরা" সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তর বঙ্গে (বীরভূম নহে) ঐ সব অত্যাচার করে তাহারা এলাহাবাদ কাশী ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্‌গীতার নাম পর্য্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তান সেনা বৈষ্ণব, আর আসল "সন্ন্যাসী"রা ছিল শৈব, আজ পর্য্যন্ত তাহাদের নাগা সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে, যদিও······তাহারা এখন অস্ত্র রাখিতে বা লুঠ করিতে পারে না। ······সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল, একেবারে লুঠেড়া ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারিও করিত ; মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র।"(৪৯) কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই অ-সত্য ইতিহাসের ভিতর দিয়া সত্য মানুষ প্রাণ পাইয়াছে। যে ঐতিহাসিক মানুষকে বঙ্কিমচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যে মানুষ জীবনের আরোপিত প্যাটার্ণের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ এবং সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে, যে মানুষ সমাজের বাস্তব ভিত্তির উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, সেই মানুষই এই অবাস্তব ইতিহাসের মধ্যে আশ্চর্যভাবে আত্মপ্রকাশ

(৪৯) আনন্দমঠ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ ৷৵০

করিয়াছে। এই মানুষ বঙ্কিমের সমকালীন উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, যে শাসনব্যবস্থায় লোক অকাতরে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, যে ব্যবস্থায় মানুষ ঘাস লতাপাতা, শিয়াল কুকুর খাইতে বাধ্য হয়, যেখানে জীবনের কোনও মূল্য নাই এবং যেখানে জাতি-ধর্ম মান-সম্ভ্রম এমন কি বাঁচিবার অধিকার পর্যন্ত অস্বীকৃত, বঙ্কিমচন্দ্রের সন্তানগণ সেই রাজা এবং শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সেই অকুণ্ঠ অরাজকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং সেই সংগ্রামে নিশ্চিত জয়লাভ করে। আর শুধুই জয়লাভ নয়, ন্যায়ধর্মের আদর্শ স্থাপন করিতেও তাহারা সমর্থ। বাকল্যাণ্ডের সহিত কলহের ফলে বঙ্কিমের ব্যক্তিগত যে বিক্ষুব্ধ মনোভাব তাহার সহিত জাতীয় ভাবাকাশের ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব সন্তানদের কণ্ঠকে আশ্রয় করিয়াছে এবং তাহাদের সংগ্রামকে অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। সন্তানদের এই সংগ্রাম, জয়লাভ এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন মানুষ তাহাদের বাস্তব সংগ্রাম এবং আশা আকাঙ্ক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়াছে। সন্তানদের সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে সামাজিক সম্পর্কের জরিষ্ণুতা এবং পরিণামে বিলোপ চিত্রিত হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন সমাজেও তাহার প্রতিচ্ছবি রহিয়াছে। আর ইংরাজ সেনার উপর সন্তানদের বিজয়ে যে রূপান্তরিত সামাজিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ঘোষিত হইয়াছে, সে সম্ভাবনার মধ্যেও বঙ্কিম-যুগ স্বীয় কল্পনার অভিপ্রকাশ দেখিতে পাইয়াছে। আর শুধু তাহাই নয়, সমসাময়িক সমাজ-মানস যাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গিত কোনক্রমে ভুল বুঝিতে না পারে, তজ্জন্য বর্তমান সংস্করণের তৃতীয় খণ্ডের যুদ্ধবর্ণনায় যে সব স্থানে "যবন" সৈন্য, 'নেড়ে' ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সব স্থানে প্রথম সংস্করণে "ইংরেজ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল।(৫০)

আর সন্তানদের সাধনা, সংগ্রাম ও সিদ্ধি বর্ণনার ভিতর দিয়া এমন একটা অদ্ভুত আনন্দধারা, সহৃদয়তা এবং মনস্কামনা অঙ্কিত হইয়াছে যে, সমকালীন মানুষ প্রত্যেকে ইহাতে তাহার নিজস্ব মনস্কামনার অভিব্যক্তি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। 'আনন্দমঠ' যেন কাব্যের মত স্রষ্টার মনের একক উৎস হইতে রচিত হইয়াছে, এবং সেজন্যই ইহা কাব্যের মত সকলকে স্রষ্টার মনের অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিয়াছে। আর শিল্পী মনের এই চেতনা, তাহার স্ফুরণ এবং অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া যাহা বহু মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে

(৫০) আনন্দমঠ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; পাঠভেদ. পৃ ১৬৬-৭

সাধারণ, যাহা সকলের, তাহাই স্ফুরিত ও অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেইজন্যই ইহা বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অস্বীকৃত বর্তমানকে তাই ইহা স্বপ্নময় ভবিষ্যতের সম্ভাবনার রং দিয়া রাঙাইতে পারিয়াছিল। 'কমলাকান্ত' যে স্বপ্ন জাগাইয়াছিল, 'আনন্দমঠ' তাহা সার্থক করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এইখানেই 'আনন্দমঠ'-এর শক্তি ও সার্থকতা।

কিন্তু সন্তানদের সংগ্রামের ভিতর দিয়া সমকালীন রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতা দুই-ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সন্তান নেতাদের অতুলনীয় দেশভক্তি, আদর্শবাদ, ত্যাগ এবং প্রাণশক্তির মধ্যে, এবং সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক ক্রিয়ার পরিকল্পনা ও পরিচালনার মধ্যেই এই আন্দোলনের শক্তি। এই প্রাণশক্তি বলেই 'আনন্দমঠ'-এর ঘটনাপ্রবাহ তর্ তর্ বেগে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, ইহার অপূর্ব উন্মাদনাতেই শিল্পী নিঃসঙ্কোচে ও অনায়াসে সমস্ত অবাস্তবতা পার হইয়া গিয়াছেন, নিরক্ষর ফকির সন্ন্যাসীদিগকে অশ্রুতপূর্ব মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারিয়াছেন; এই শক্তির জোরেই দস্যু আদর্শ পুরুষে পরিণত হইয়াছে; আবার এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বলিয়াই শান্তির পক্ষে দুই দুই বার সুদক্ষ ইংরাজ সৈনিককে পরাজিত করা সম্ভব হইয়াছে (একবার সে ক্যাপ্টেন টমাসের নিকট হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছে, এবং আরেকবার লিণ্ডলেকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিয়া পূর্বাহ্নে সত্যানন্দকে ইংরাজের গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন করিয়াছে এবং ইংরাজের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়াছে)। এই প্রাণশক্তি শুধু নিজেকে প্রকাশ করিতে জানে, আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে জানে, বাধাকে স্বীকার করিতে জানে না। আর নিজের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির জন্যও ইহা কারণ দর্শাইতে জানে না; নিজেকে চিনিয়াছে, প্রকাশ করিয়াছে - ইহার বেশী কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা ইহার নাই, অথবা বলিতে জানে না। সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক কর্ম ও সংগঠনের যে পরিকল্পনা 'আনন্দমঠ'-এ ভাষা পাইয়াছে, তাহার মধ্যেও সমকালীন আন্দোলনের শক্তি ও দূরদর্শিতার ছাপ রহিয়াছে। বিচ্ছিন্ন, একক সাধনা ও মনস্কাম, মুষ্টিমেয়ের আকাশবিদারী চীৎকার ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে স্বর্ণ কুড়াইয়া আনিতে পারিবে না, এই বিচ্ছিন্ন মনস্কামকে সকলের, সর্বসাধারণের মনস্কামে পরিণত করিয়া তবেই তাহাকে সার্থক কর্মের রূপ দেওয়া সম্ভব। এখানেও শিল্পী-মানস ভবিষ্যতের দিকে তাঁহার অঙ্গুলি-সংকেত জানাইয়া গিয়াছেন।

আর সমকালীন আন্দোলনের দুর্বলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহার অন্তর্নিহিত

পরাভব চেতনায় ; আর বিদেশী শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত পুরোপুরি সম্পর্ক ছেদনের অক্ষমতার ভিতর দিয়া। পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং সেজন্যই তাহাদের অস্তিত্বও বৃটিশ-রাজ নির্ভর ছিল। মধ্যবিত্ত মানসও নিজেকে শাসন-যন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ কল্পনা করিয়া আকাশকুসুম রচনায় বিভোর ছিল। ইতিপূর্বে ইহাও আলোচিত হইয়াছে, উনিশ শতকের শেষার্ধে এই আকাশ-সৌধ বাস্তবের কঠিন স্পর্শে ভাঙ্গিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেও আত্মীয়তার শেষ বন্ধনটি তখনও ছিন্ন হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলেও তাহা কোনক্রমে জোড়া লাগিয়াই ছিল। বিষয়গতভাবে ভারতে ইংরেজবিজয় যে প্রগতিশীল কার্য সম্পাদন করে, তাহার প্রতি শিক্ষিত মানসের শ্রদ্ধা অবিচল ছিল। বঙ্কিম আমলেও এই শ্রদ্ধা মলিন হয় নাই। কেননা, বঙ্কিম-আমলে জাতীয় মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিলেও বিক্ষোভ প্রধানত ছিল চিত্তরাজ্যেই সীমাবদ্ধ ; সমাজদেহের অন্তরে যে অলঙ্ঘ্য নিয়মের লীলা চলিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া তাহার সূত্রানুযায়ী রাজনৈতিক কর্ম ও আদর্শ নির্ধারিত হয় নাই। সে জন্যই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সামাজিক কল্যাণ আদর্শ অপেক্ষা ব্যাপকতর ও মহত্তর কল্যাণ আদর্শ লক্ষ্য হিসাবে সংস্থাপন করা তৎকালীন আন্দোলনকারীদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাই প্রারম্ভেই এই আন্দোলন পরাভব চেতনায় সঙ্কুচিত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় ক্ষণেও তাই ভবানন্দ বলিতেছেন, "কাপ্তেন সাহেব. তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে।……ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।" আর গ্রন্থ শেষে মহাপুরুষ চিকিৎসক বলিতেছেন, "হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না— তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।

"শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, 'হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?'

"তিনি বলিলেন, 'না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।"

"সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল।" কিন্তু এই পরাজয়কে মন মানিতে চায় না। তথাপি অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে প্রথম সংস্করণের পর বঙ্কিমচন্দ্রকে চিকিৎসকের উক্তির একস্থানে "ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—

নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে" এই লাইনটি সংযোজন করিতে হয়।(৫১) এই পরাভব-চেতনার মধ্যেই এই আন্দোলনের প্রকৃত দুর্বলতা।

অবশ্য এই পরাভব-চেতনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে অপরাধী করা চলে না। নূতন ভারতের নব সংস্কৃতির প্রবর্তক বিত্তশালী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বর্ণসঙ্কর জন্মের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এই অস্বাভাবিক জন্মের জন্যই তাহাদের সামাজিক আচরণে, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও কর্মে স্বাভাবিক স্ব-বিরোধ ছিল। তাহার ইঙ্গিতও পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। তাহারা একদিকে সুউচ্চ আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, আবার তেমনি অপরদিকে প্রয়োজনবোধে অত্যাচারকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। একদিকে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতা, অপরদিকে সেই গভর্ণমেণ্টকেই আত্মীয় বলিয়া স্বীকার,—এই দুই বিরোধী ধারার মধ্যে বিদগ্ধ সমাজ-মানস আন্দোলিত হইয়াছে। বঙ্কিম-যুগ এই ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়াছিল, আর একথাও স্বীকার্য যে, এই ঐতিহ্যের বন্ধন অতিক্রম করা বঙ্কিম-যুগেও সম্ভব হয় নাই। সুতরাং, পরাভবের চেতনাও এখানে স্বাভাবিক।

সন্তানদের পরাভবের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের সংকল্পও পুনরায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাঁহার মধ্যে কল্পনার অভাব ছিল না, শক্তির অভাব ছিল না, অনুপ্রেরণার অভাব ছিল না, মানসিক উত্তাপের অভাব ছিল না; অভাব ছিল শুধু প্রয়োজনীয় পরিবেশের। তাঁহার শ্রেয় বোধ বর্তমানের অবরোধ ভাঙ্গিয়া অতীতের স্বর্ণ কুড়াইতে ব্যগ্র ছিল, কিন্তু একটা অস্পষ্ট ইতিহাস-চেতনা তাঁহার কানে কানে গোপনে বার্তা পাঠাইয়া দিয়াছিল যে, সেই যুগ পার হইয়া গিয়াছে, তাহা আর কোনক্রমেই ফিরিবে না। বৈজ্ঞানিক সূত্রানুযায়ী সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয় করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই, এবং সেইজন্যই বর্তমান সমাজ কাঠামোর তত্ত্ব নির্ধারণ এবং ইহার গতিপ্রকৃতি নিরূপণ করিয়া রাজনৈতিক কর্মের বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত দেওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাই বঙ্কিম-মানস অনায়াসে বর্তমানের সীমা অতিক্রম করিয়া অতীতে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তিনি অতীত-পুনরুদ্ধার প্রয়াসকে বিজয়-গৌরব দান করিতে পারেন নাই; অচেতন মনে তিনি এই প্রচেষ্টার অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি 'আনন্দমঠ'-এর চতুর্থ সংস্করণে (৫২) চিকিৎসক মহাপুরুষের উক্তিতে এই কথা কয়টি সংযুক্ত করিয়াছেন,

(৫১) ঐ; পৃ ১৫৯ দ্রষ্টব্য
(৫২) ঐ; পৃ ১৫৮

"তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না।" অবশ্য এখানে পরাভবের জন্য একটি নৈতিক ত্রুটিকে দায়ী করা হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও, পরাভব চেতনা কখনও অস্বীকৃত হয় নাই। সেই চেতনা হইতেই গ্রন্থশেষে চিকিৎসকের আমদানী; বঙ্কিমচন্দ্র অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জন দিলেন। এই পরাভব চেতনার সহিত তাঁহার ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকা ও বিধাতৃপুরুষদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও সংযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। রাজনৈতিক আদর্শবাদ শুধু সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ প্রভৃতি অল্প কয়েকজনের; অন্যান্য সকলেই অত্যাচারের প্রতিশোধে লুটতরাজের প্রত্যাশায় সন্তানদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। কোনরূপ রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা অধিকাংশেরই ছিল না। তাই আকাঙ্ক্ষাকে একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক কর্মের রূপ দেওয়া, অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বহুর কর্মকে সংহত করা হয় নাই, সম্ভবত সে শিক্ষা ছিল না। সুতরাং বলিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মের ভিত্তি তখনও স্থাপিত হয় নাই। ফলে, দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পরাভবের ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন আত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া। সত্যানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি, ভবানন্দ প্রভৃতির আদর্শবাদ, তাহাদের পরার্থপ্রিয়তা, তাহাদের স্বার্থত্যাগ এবং সংযম অভ্যাস তাহাদিগকে এক অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। তাহারা যে কোন কল্যাণধর্মী মানুষের আদর্শ হিসাবে চিত্রিত হইয়াছে। তথাপি একথা স্বীকার্য যে, এই অপার্থিব মহিমার মূল রহিয়াছে বাস্তবজীবনের নৈরাশ্যের মধ্যে। অস্বীকৃত ও লাঞ্ছিত বর্তমানকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইয়া স্বভাবতই মানুষ এক অন্তর্লোকের পৃথিবী সৃষ্টি করে, যেখানে তাহার প্রাধান্য লইয়া কেহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না, যেখানে তাহার ঐশ্বর্য লইয়া কোনরূপ কাড়াকাড়ি নাই, যেখানে সে আপনাতে আপনি সমৃদ্ধ। আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি বৃত্তির চর্চা সামাজিক মানুষের পক্ষে ততখানিই কর্তব্য যতখানি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের পক্ষে অনুকূল; সমাজ-মানুষ হিসাবে বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। কিন্তু আত্মসংযমের জন্যই আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগের জন্যই স্বার্থত্যাগ, অনুশীলনের জন্যই অনুশীলন, এই দৃষ্টিকোণ হইতে যে সাধনমার্গ দেখা দেয়, তাহা, পরাধীন জাতির পক্ষে, নিঃসন্দেহে তেমন মূল্যবান কিছু নয়। অনিশ্চিত

সুখভোগের মানসিক শান্তি ও আনন্দ কতদূর তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু একথা সত্য যে, নিশ্চিত সুখ হইতে বঞ্চনার বেদনা সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না। তাই এই আত্মিক শক্তির বিজয় ঘোষণার মধ্যে বাস্তব অপমানবোধের উচ্ছ্বসিত ক্ষতিপূরণ লাভের চিহ্ন আবিষ্কার করা যায়। আমার বাহিরে বন্ধনদশা, কিন্তু তথাপি মন আমার মুক্ত,—এই স্ব-বিরোধের মীমাংসা হওয়া কঠিন।

আত্মিক শক্তির এই প্রাধান্য ঘোষণা ছাড়াও 'আনন্দমঠ'-এর পরিণতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমন্বয় তত্ত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন রহিয়াছে। মহাপুরুষ সত্যানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সে জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতনধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেকদিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার হওয়া আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।" (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ১৩১) এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় ন্যায়শাস্ত্রের ধারা অনুসরণ করিয়া মনের সংস্কারের সহিত চোখে-দেখা সত্য, অতীতের সহিত বর্তমানের এবং পার্থিবের সহিত অপার্থিবের মিলন ঘটাইলেন।

কিন্তু এই নব সমন্বয়আদর্শের প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রচলিত হিন্দুধর্মাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়। তাঁহার সমন্বয়ের প্রকৃতিতেই ইহা স্ব-অভিব্যক্ত যে তিনি পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সহিত ধর্মতত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছিলেন। সেই মীমাংসাই তাঁহাকে হিন্দুধর্ম সংস্কারে প্রাণোদিত করে। কিছুকাল পরে লিখিত তাঁহার হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত পত্রে তিনি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, এই প্রগতির যুগে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ন্যায় সুপ্রাচীন অতীত

আদর্শে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব নয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে যে আদর্শ কার্যকরী ছিল তাহা বর্তমান সময়ে কার্যকরী না-ও হইতে পারে। তাই তিনি বলিতেছেন, "let us revere the past, but we must, in justice to our new life, adopt new life, adopt new methods of interpretation and adopt the old eternal and undying truths to the necessities of that new life."(৫৩) (Letters on Hinduism, Second Letter) এই প্রয়োজনের তাগিদেই তিনি হিন্দুধর্মকে (তাঁহার মতে) বহুযুগের সঞ্চিত অবাঞ্ছিত জঞ্জালের কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। পশ্চিমের নূতন আলোকে তিনি প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থানে ব্রতী হন। বলা বাহুল্য, এই নির্মাণ কার্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে বহু আদর্শ ধ্বংসও করিতে হয়। ১৮৮২ সালের নভেম্বরে অধ্যাপক হেষ্টির সহিত হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার যে বিতর্ক হয়, তাহাতে তিনি ঘোষণা করেন, "idolatry, though a part of Hinduism is not an essential part even of the popular worship. Idol worship is permitted,......but it is not enjoined as compulsory......A man may never have entered a temple and yet be an orthodox Hindu." এবং "the student must distinguish between the Essentials of Hinduism and its Nonessential adjuncts. Much of the ethical portion is pure Ethics and not religion. The social polity is also nonessential. Caste, therefore, which is the most prominent feature of that polity, is nonessential.(৫৪) বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নূতন আদর্শ প্রচার করিতে থাকেন, এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া নব হিন্দুধর্মবাদীদের একটি গোষ্ঠী দাঁড়াইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন এই গোষ্ঠীর ধর্ম-নেতা, এবং অপ্রত্যক্ষভাবে ছিলেন সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনেরও নেতা। 'আনন্দমঠ' সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, এবং চঞ্চল সমাজ-পরিবেশে ইহা তরঙ্গ তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্কিম-মানসেও 'আনন্দমঠ'-এর সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক ক্রিয়ার স্মৃতি জাগ্রত ছিল। সমকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বুদ্ধির জড়তা ও শৈথিল্য বিসর্জন দিয়া সমবেতভাবে জাগিয়া

(৫৩) Letters on Hinduism ; Centenary edition. P 12.

(৫৪) বঙ্কিমজীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ, ৪৮২-৮৩, এবং ৪৮৫

উঠিবার জন্য এই সময়ে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান, "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী-বিধর্ম্মী অসাড় পরপীড়কদিগের জীবন-চরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে ?

"তুমি লিখিবে, আমি লিখিব. সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই ?

"আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক ; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। একের কাজ নয় সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।" (বাঙ্গালার ইহিাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; পৃ ৩২২) প্রাণের কেন্দ্র হইতে জাগরণের আহ্বান, সমষ্টিগতভাবে কর্মে উদ্বুদ্ধ হওয়ার এই আহ্বান বঙ্কিমচন্দ্রের মত করিয়া আর কেহ জানাইতে পারে নাই। তাই সহজেই তিনি সমাজ-মানসে গতি সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন ; এবং সেই-জন্যই তাঁহার রচনা কালোত্তীর্ণ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার এবং হিন্দুরাজ্য স্থাপনের সংকল্প যে অঙ্কুরেই পরাজয়ের চেতনায় সঙ্কুচিত ছিল, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার নূতন আদর্শ প্রচারের ভিতর দিয়া পতিত হিন্দু সমাজ এবং অনুষ্ঠান-নির্ভর, আত্মগ্লানিতে বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে আঘাত পড়িয়াছিল, আশু লক্ষ্যের পরিধির মধ্যে সেই আঘাতের ফলকে বিধৃত করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মের সংকেতের মতই ইহার ফল ভবিষ্যতের গর্ভে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং, নিজের অগোচরে, হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ, প্রচলিত সামাজিক সম্পর্ক ও ধর্ম-সম্পর্কের বন্ধন অন্তর্হিত হইয়া এই সমাজের অভ্যন্তরেই নূতন শক্তির অভ্যুদয় হইতেছিল। তাহাতে তাঁহার অবদান, তাঁহার আঘাতের প্রভাব, কম নয়।

দুই

কিন্তু ধর্মতত্ত্ব প্রচারের আগ্রহ বঙ্কিমচন্দ্রকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহা 'দেবীচৌধুরাণী' হইতে সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ

বাস্তব সত্যকে অবলম্বন করিয়া বাস্তব কাহিনী রচনা করিতেছিলেন, কিন্তু এই কাহিনীর নায়িকার চরিত্রের মাধ্যমে অনুশীলন পদ্ধতি পরিস্ফুট করার সংকল্প অনুসারে তিনি এই কাহিনীর মধ্যে ব্যক্তিগত সাধন-প্রকরণ এমনভাবে সংগ্রথিত করিয়া দিয়াছেন যে, এই উপাদান দুইটির মধ্যে অর্থাৎ কাহিনী ও সাধন-প্রকরণের মধ্যে কোনরূপ রাসায়নিক মিশ্রণ সংঘটিত হয় নাই; নিছক বাহ্য প্রলেপের মত একে অন্যের পাশাপাশি মিশিয়া রহিয়াছে মাত্র। প্রফুল্লর ব্রহ্মচর্য, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদিতে উপন্যাসের কাহিনী বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হয় নাই; আবার কাহিনীও প্রফুল্লর শিক্ষা-পর্বের প্রতি চক্ষু বুজিয়াই ছিল। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এক্ষেত্রে শিল্পী এমন দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার সৃজনীক্রিয়াকে কোনভাবেই বিকশিত করে নাই; সেই শিক্ষা ছাড়াও দেবীর পক্ষে দস্যুদলের নেতৃত্ব করা অসম্ভব হইত না। দেবীর শিক্ষা-পর্ব যেন প্রেক্ষাগৃহের বিশ্রাম অবকাশের মত, মূল কাহিনীর সহিত সম্পর্কহীন।

অথচ প্রফুল্লর শিক্ষা-শিবিরের চারিপাশে বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনা বিকাশ লাভ করিতেছিল, এবং সেই কাহিনীই বঙ্কিমচন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কল্পনার সাহায্যে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান এবং বৃটিশ শাসনের আরম্ভ এই রাজনৈতিক গোধূলি লগ্নে ফিরিয়া যান, এবং একান্ত সত্যনিষ্ঠার সহিত সমসাময়িক অরাজক পরিস্থিতি চিত্রিত করেন। সে যুগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভৌমিক নীতি ছিল অপরিকল্পিত ও অনিশ্চিত। প্রথমে প্রতি বৎসর সর্বোচ্চ দরে জমিদারী ইজারা দেওয়া হইত এবং পরে পাঁচসালা এবং আরও পরে দশসালা বন্দোবস্তের নীতি গৃহীত হয়। ফলে, যাঁহারা জমিদারী নীলামে ডাকিয়া লইতেন তাঁহারা প্রজাদের নিকট হইতে নিজেদের লভ্যাংশসহ নির্দিষ্ট অর্থ আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর বেপরোয়া উৎপীড়ন চালাইতেন, অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় চাষাবাদের ক্ষতি, সরকারী রাজস্বের অবনতি এবং জমিদার পরিবারদেরও সর্বনাশ হইত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধেই স্থানে স্থানে প্রজাগণ প্রতিরোধের দুর্গ গড়িয়া তোলে। ভবানী পাঠক এবং তাহার অনুচরদের সংগ্রামও সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "ভবানী, ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর দুর্বিসহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, কাছারির কর্ম্মচারীরা বাকিদারদের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া মেঝে খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্রগুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে,

পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্ব্বসমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রাচীন কবির ন্যায় অত্যুন্নত শব্দচ্ছটাবিন্যাসে বিবৃত করিয়া ভবানীঠাকুর বলিলেন, 'এই দুরাত্মাদিগকে আমিই দণ্ড দিই।'" (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ৫৮) বলাবাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার যাদুতে বাস্তব ইতিহাস বহুলাংশে রূপান্তরিত হইয়াছে, দস্যু আদর্শ পুরুষের গৌরবে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে ; একটা সুউচ্চ আদর্শবাদ সমগ্র পরিবেশকে অপূর্ব মহিমায় আলোকিত করিয়াছে। আর ইহাও স্বীকার্য যে, এই চিত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন যুগের প্রতিফলনও বর্তমান।

তৃতীয় পর্বের বঙ্কিম-মানস আত্মবিস্মৃত দেশবাসীকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিল। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন আত্মচেতনাহীন, শ্রেয়বোধহীন আন্দোলন, তাহা রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যাহাই হউক না কেন, কখনও সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। তাই, মুচিরাম গুড়ের জীবন-কাহিনী রচনা করিয়া তিনি সমকালীন বাঙ্গালীবাবুর অন্তঃসারশূন্যতা, কদাচার এবং পরিমিতিহীন নির্বুদ্ধিতাকে নিষ্ঠুরভাবে বাহিরের আলোকে টানিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার এই মনোভাব, এবং বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্লেদপূর্ণ আচরণের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা কালীপ্রসন্ন ঘোষকে (১৮৮৩ সালে) লিখিত একটি পত্রেও অভিব্যক্ত হইয়াছে।(৫৫) তিনি বলিতেছেন, "আমি বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব আর আপনি বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন ? এ ঈর্ষ্যাপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল 'বন্দে উদরং।'" সমকালীন বাবু চরিত্রের এই কালিমার পটভূমিতে দেবীচৌধুরাণী, ভবানী পাঠক এবং তাঁহাদের শিষ্যদের অত্যাচার বিরোধী আন্দোলন নিজস্ব গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। যে মুহূর্তে "এক ফোঁটা গুড় পড়িলে যেমন, সহস্র সহস্র পিপীলিকা তাহা বেষ্টন করে, খালি চাকরীটির মালিক হোম সাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে,"(৫৬) সেই মুহূর্তে উপন্যাসে দেবী ও ভবানী পাঠকের দল দুর্বৃত্ত

(৫৫) বঙ্কিম রচনাবলী, বিবিধ খণ্ড, পৃ ৪১২

(৫৬) মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ১৪

জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে এবং জমিদারের অসদুপায়ে সংগৃহীত অর্থ কাড়িয়া লইয়া দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করিতেছে। একদিকে হীন আত্মপরতা ও শ্রেয়বোধের নিদারুণ অভাব, অপরদিকে অতুলনীয় পরার্থপরতা। বাস্তব জীবনের হীনতা এবং 'দেবীচৌধুরাণী'তে প্রচারিত এই আদর্শবাদের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান, তাহার চেতনায় সমকালীন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে বঙ্কিম-মানসে 'ধর্ম'-অর্থের বিপ্লবাত্মক রূপান্তর হইয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল চরিত্র তাহার উদাহরণ। দেবীচৌধুরাণী প্রকাশিত হওয়ার অল্পকাল পরেই 'প্রচার' ও 'নবজীবন' আত্মপ্রকাশ করে এবং তাহাতে তাঁহার 'হিন্দুধর্ম্ম' ও 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি বলিতেছেন, "যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এইরূপ উন্নতির তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্ম্মেরই সার ভাগ গঠিত। এরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই প্রবল।" "যে ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, যে ধর্ম্মের নীতি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে।"(৫৭) এক্ষেত্রে ধর্ম তাহার সনাতন অতীন্দ্রিয় সত্তা পরিত্যাগ করিয়া একটা ব্যবহারিক সত্তা অর্জন করিয়াছে। বেন্থাম-কোঁৎকে অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটা নূতন সংশ্লেষে (Synthesis) উপনীত হইয়াছেন। প্রফুল্ল সেই সংশ্লেষের দৃষ্টান্ত। প্রথম জীবনে কঠিন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া, ব্রহ্মচর্য, শারীরিক শক্তি ও ব্যায়াম অভ্যাস, নিষ্কাম ধর্মশিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রফুল্ল তাহার শারীরিক মানসিক বৃত্তি সমূহের স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই সাংসারে তাহার কোন কামনা নাই, কিন্তু কাজ আছে। "কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা।" (দেবীচৌধুরাণী, পৃ ১৪৮)। যে নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে সেই অপরের উপলব্ধির পথে সহায়তা করিতে পারে ; যে সত্যকে জানিয়াছে সে আত্মাকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, সে সত্যকে সর্বজনগ্রাহ্য করিতে চায়। প্রকৃত ধর্ম কি এ শিক্ষা যাহার হইয়াছে, সে কখনও আত্মসুখে নিমগ্ন থাকিতে পারে না, সে সমাজের সর্বাঙ্গীন

(৫৭) শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিম জীবনীর 'মসীযুদ্ধ' অধ্যায়ের ৪৫৪-৫৫ পৃষ্ঠায় রাজনারায়ণ বসুর উক্তিতে উদ্ধৃত

কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করে। ব্যক্তিগতভাবে প্রফুল্লর এই দীক্ষা হইয়াছে। শুদ্ধ তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই আদর্শের মূল্য অপরিসীম। আর সেজন্যই ইহার তাৎপর্য ব্যাপক। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, ধর্মের এই সংজ্ঞা এবং ইহার তাৎপর্যকে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব নয়; এখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের অলক্ষ্য ইঙ্গিত ভবিষ্যতের দিকে। তাঁহার এই ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করিয়াই বাংলায় নব-মানবতার উন্মেষ; বঙ্কিমচন্দ্রের যাহা ছিল কল্পনা, তাহাই পরবর্তী কালে বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছিল। সেই মানবতাই বর্তমানকে সৃষ্টি করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে নূতন সংশ্লেষে উপনীত হওয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই অলক্ষ্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিত অনুভব করিতে পারেন নাই। তাঁহার মনের অতীত আকর্ষণ এবং চোখের সম্মুখদৃষ্টির দ্বন্দ্বের সমাধান হইয়া গিয়াছিল, এবং উভয়ের খণ্ডিত সামঞ্জস্য দ্বারা তিনি যে সমন্বয়ে পৌঁছিয়াছিলেন, তাহার আদর্শই তিনি প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু মানুষের মনের সহজাত প্রবৃত্তির আকর্ষণ স্বভাবত প্রবল হওয়ায় তিনি মনের অতীত আকর্ষণের টান সর্বদাই অনুভব করিতেছিলেন। বর্তমান-ভবিষ্যতের যে সংঘাত তাহাকে তিনি বর্তমান-অতীতের সংঘাত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই অতীতকে সৃষ্টি করার প্রেরণা তাঁহার মানসপটে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করিত। সেই প্রেরণাই পুনরায় বাস্তবরূপ ধারণ করিয়া 'সীতারাম'-এ আবির্ভূত হয়।

ঐতিহাসিক চরিত্র সীতারামকে লইয়া তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার এবং "ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের"(৫৮)—সংকল্প করেন। তিনি বর্তমানের দীনতা, শূন্যতা এবং হীনতাবোধকে অতীতের প্রাধান্য ও গৌরব দ্বারা খণ্ডিত করিতে চাহিয়াছিলেন। অতীতের শ্লাঘায় তাঁহার মন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু?...এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি - এ পুতুল কোন্ ছাড়। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসার্থক করিয়াছি।" (সীতারাম, সাহিত্য পরিষৎ

(৫৮) সীতারাম; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পাঠভেদ, পৃ, ১৬৬

সংস্করণ ; পৃ ৪০) সেই হিন্দুকে পুনরায় সৃষ্টি করিয়া তাহার অতীত গৌরবকে ফিরাইয়া আনা এবং ভবিষ্যতে আরও সুমহান কীর্তি স্থাপনের পরিবেশ রচনার সংকল্প লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম লিখিতে বসেন। তাঁহার অনুরাগের অভাব ছিল না, অন্তর্নিহিত শক্তির অপ্রাচুর্য ছিল না, তাঁহার দক্ষতারও অভাব ছিল না, কিন্তু তথাপি ইতিহাসে তাঁহাকে পুনরায় প্রতারণা করিল।

'মৃণালিনী'তে প্রথম যেদিন বঙ্কিম-মানসে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের অঙ্কুর উন্মেষিত হয়, সেইদিনই এই সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্য কতদূর মলিন ছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষণে হেমচন্দ্র-পশুপতির চিত্তদৌর্বল্য ও অক্ষমতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। 'আনন্দমঠ'-এ তাঁহার ইতিহাস চেতনা প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে। 'সীতারাম'-এও তাঁহার মনস্কাম সিদ্ধ হইল না। ঐতিহাসিক পটভূমিতে স্থাপন করিয়া মানুষকে বিচার করার যে অস্পষ্ট স্বীকৃতি তাঁহার মনে ছিল, সেই নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করিতে যাইয়া তিনি দুঃখের সহিত আবিষ্কার করেন, সে যুগও আর নাই এবং সে মানুষেরও মৃত্যু হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে, সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে হইলে যে বীর্য, শক্তি ও সুগঠিত চরিত্রের আবশ্যক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আদর্শ পুরুষদের মধ্যেও তাহা খুঁজিয়া পান নাই। সীতারাম বীরধর্মী কর্মদক্ষ ঐতিহাসিক পুরুষ। কিন্তু তিনিও অন্তরে দুর্বল ; পিতৃআজ্ঞায় নিরপরাধ স্ত্রী শ্রীকে নিশ্চিন্ত মনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং সামাজিক মতে স্ত্রীর প্রতি তাঁহার কর্তব্যও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। উপন্যাসের প্রারম্ভে সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীর অনুরোধেই তিনি অকস্মাৎ এক অভাবনীয় আত্মোৎসর্গের প্রস্তাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠেন। পিতৃ আদেশে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে যতখানি সহজ হইয়াছিল, স্ত্রীর অনুরোধে এক সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়া তাঁহার পক্ষে তেমনি কঠিন হয় নাই। এই উচ্ছ্বাস, এই অস্বাভাবিক উষ্ণতা এবং প্রশ্নহীন স্বীকৃতি তাঁহার চরিত্রের মৌলিক দুর্বলতা এবং ব্যক্তিত্বের অভাবেরই সূচনা করে। পক্ষান্তরে, তাঁহার মহত্ত্বকেও আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরে। যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকে বিশেষভাবে জানার সুযোগে সীতারামের সুপ্ত রূপ-তৃষ্ণা জাগিয়া ওঠে ; শ্রীর অন্তর্ধান সেই তৃষ্ণা নিবারণের আশায় নূতন তরঙ্গ খেলিয়া গেল মাত্র। ইতিমধ্যে গঙ্গারাম সম্পর্কিত গ্রাম্য দাঙ্গাকে কেন্দ্র করিয়া সীতারাম একটি ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন। রাজ্য প্রতিষ্ঠার উত্তেজনা ও কর্ম-কোলাহলের মধ্যে

তাঁহার রূপ-তৃষ্ণা পুনরায় নির্বাপিত হইয়া যায়, এবং তাঁহার নৈপুণ্য ও প্রশান্ত-চিত্ততা আমাদের বিস্মিত করে। এই সুদক্ষ কর্মবীরকেই আমরা পুনরায় দুইজন সন্ন্যাসিনীর (জয়ন্তী ও শ্রী) সাহায্যে তোরাব খাঁর আক্রমণের বিরুদ্ধে একাকী রাজ্য রক্ষা করিতে দেখি। তাঁহার রাজ্য বিস্তৃতিলাভ করে, এবং বৃহত্তর সাফল্যের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। কিন্তু বিজয়ের এই শুভক্ষণেই তাঁহার অধঃপতনের সূত্রপাত। শ্রীর সহিত সাক্ষাৎ তাঁহাকে পুনর্বার উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। তাঁহার মানসিক সাম্য ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইতে থাকে। শ্রী বাঁধা পড়িয়াছে, কিন্তু ধরা দেয় না। আর সীতারামের শরীরের অণুপরমাণুতে শ্রীকে পাওয়ার বাসনা।

রাজা তাঁহার মানসিক সমতা বিসর্জন দিয়া তাঁহার বাসনার পরিচর্যায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। রাজকার্যে শৈথিল্য ধীরে ধীরে রাজভবনে এবং সমগ্র রাজ্যে দুর্নীতির বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। ধর্মরাজ্য পাপরাজ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই পরিবেশে রাজার উপর রাজ্যের দাবী ছিল অনেক, রাজার দায়িত্ব ছিল অসীম। কিন্তু রাজা কর্তব্যবোধ বিসর্জন দিয়াছেন, প্রজা অবরুদ্ধ হইতেছে, রাজকর্মচারী শূলে যাইতেছে এবং হিতৈষী অপমানিত হইতেছে। প্রেম প্রথমে স্বামীর অধিকার প্রয়োগে এবং ক্রমে অধিকার অতিক্রম করিয়া পশুবৃত্তিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। "পাঁচ বৎসর ধরিয়া সীতারাম তাঁহার জন্য প্রায় প্রাণপাত করিয়াছিলেন! এ দুঃখের কি আর তুলনা হয়! ইহাতেই সীতারামের সর্ব্বনাশ ঘটিল। আগে আগুন লাগিয়াছিল মাত্র,—এখন ঘর পুড়িল! সীতারাম আর সহ্য করিতে না পারিয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, শ্রীর উপর বলপ্রয়োগ করিবেন।" (ঐ, পৃঃ ১২২) ততক্ষণে মানুষ পশুতে রূপান্তরিত হইয়াছে। শ্রীকে ফিরিয়া পাওয়ার প্রলোভনে সীতারাম জয়ন্তীকে উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সীতারাম এক হীন পশুতে পরিণত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ঐতিহাসিক পটভূমিতে রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যাহাদের অতুলনীয় শৌর্যবীর্য, চিৎপ্রকর্ষ, অকলঙ্ক পরার্থপরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদের আদর্শ দ্বারা তিনি অনাগত ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করিতে চাহিয়াছিলেন, ইতিহাসের বিচারে তাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। চরম মুহূর্তে তাঁহাদের দুর্বলতা সমস্ত সম্ভাবনাকে এক শোচনীয় ও ভয়াবহ

পরিণতির পথে প্রবাহিত করিয়া দিল। মধ্যাহ্নের সূর্যালোকের উপর অমাবস্যার ছায়াপাতের মতই এই পরিণতি ভয়াবহ।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, যে শ্রী সংযম আত্মত্যাগ ও সন্ন্যাস ব্রতের সাহায্যে নিজেকে অপূর্ব শক্তির আধারে পরিণত করিয়াছিল, সেই শ্রী-ই এই হিন্দুরাজ্য ধ্বংসের মূল কারণ। তাহার শক্তিই সীতারামকে দুর্বল, এবং তাহার দৃঢ়তাই সীতারামকে অব্যবস্থিতচিত্ত করিয়াছিল। তাহাকে জয় করার প্রলোভনেই সীতারাম রাজ্যসংরক্ষণে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাহার শক্তি সীতারামকে রক্ষা করিতে পারে নাই। আর এই আগুনে শুধু সীতারাম নয়, সমগ্র হিন্দু সাম্রাজ্য এবং ইহার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল। শ্রী মানবিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে, কালের সম্পর্কহীন কতকগুলি ধর্মীয় ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ, অভ্যাসের যোগ সমষ্টি। এই পরম ধর্মবোধই এক্ষেত্রে সমস্ত বিপত্তির মূলে। কে জানে, অন্তত অবচেতন মনেও, বঙ্কিমচন্দ্র এই পরম (absolute) ধর্মাচরণের ব্যর্থতা ও নিষ্ফলতার কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কিনা!

'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' এবং 'সীতারাম'-এর আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে যে সংগ্রামের চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ স্থানিক, এবং এই সংগ্রামের কর্মযোগী ও ভাবযোগী নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও স্থানিক বা প্রাদেশিক শ্রেয়বোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত। 'আনন্দমঠ'-এর সন্ন্যাসিগণ বাঙ্গালী, ভবানী পাঠক ও দেবীচৌধুরাণী বাঙ্গালী, সীতারামও বাঙ্গালী রাজা। বাংলার পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী, কল্যাণময় রূপই তাঁহাদের ভাবনা-কল্পনায় অনুরঞ্জিত ছিল। উপন্যাসের ক্ষেত্র ছাড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভাব বা মায়ার জগৎ পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি বুদ্ধির জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনও অধিকাংশক্ষেত্রে শুধু মাত্র বাংলার সমস্যা, বাংলার সমৃদ্ধি, বাংলার স্বাধীনতা (যথা, 'বাঙ্গালা শাসনের কল', 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' ইত্যাদি প্রবন্ধ; এইগুলির নামকরণও লক্ষ্যণীয়) তাঁহাকে চিন্তিত করিয়াছে, ব্যথিত করিয়াছে, আবার দুর্জয় আশায় চঞ্চলও করিয়াছে। কিন্তু বৃটিশ শাসনের অবিসংবাদী ফল রূপে গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা এবং স্থানিক আত্মসর্বস্বতা দূর হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক সমস্বার্থের ভিত্তিতে আধুনিক জাতি গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়াছে। এমন কি ইউরোপের নব-গঠিত

জাতি-সমূহের জীবন্ত ইতিহাসও তাঁহাকে এ ব্যাপারে বিশেষ কোন সহায়তা করে নাই। তাই সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার ধ্যান ধারণায় রূপ পাইয়াছে বলা যায় না, বাংলার সমস্যা যে অবিচ্ছেদ্যরূপে ভারতবর্ষের সামগ্রিক সমস্যার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে তাহাও তাঁহার মানসপটে নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে নাই। অথবা চিন্তাধারার এই অসম্পূর্ণতা হইতেই তাঁহার আদর্শের এবং কর্মনীতির অসম্পূর্ণতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

তিন

এতকাল বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব পরিবেশের সহিত, প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের সহিত, অপ্রতিহতভাবে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন; জীবনকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে নিজের কল্পনা ও অধ্যাস দ্বারা রূপান্তরিত করার জন্য অপরিমেয় শক্তি লইয়া অভিযান চালাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টা নিদারুণভাবে ব্যর্থ হইয়া একটা দুঃখভরা স্মৃতিতে পরিণত হইয়াছে। কল্পলোকে হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপনের আশা নিরাশা ও অসম্ভবে পর্যবসিত হইয়াছে; ব্যবহারিক জীবনে তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ-চেতা ও অমার্জিতবুদ্ধি রাজপুরুষদের নিকট লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে, এবং বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রেও তাঁহার দেশবাসীকে অশেষ অপমান ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। জীবনের কোন প্রবাহেই তাঁহার মনস্কাম চরিতার্থ হয় নাই। কিন্তু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, আত্মশক্তিতে জাগিয়া ওঠার সংগ্রামে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। জীবন সংকটকে তিনি জয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সংকটের নিকট তাঁহাকে শোচনীয় পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাঁহার উৎসাহ গিয়াছে, উদ্দীপনা গিয়াছে, এমন কি অতীতকে সৃষ্টি করার প্রেরণাও আর বর্তমান নাই। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান-ভবিষ্যৎ সংকটকে বর্তমান-অতীত সংকট বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, এবং অতীতকে পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু 'সীতারাম'-এর ভয়াবহ ব্যর্থতার পর তাঁহার এই সংকল্পও বিলুপ্ত হয়। পূর্বে প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার যেরূপ গৌরব ও মমত্ববোধ ছিল, তেমনি সেই সংস্কৃতিকে পুনর্বার সৃষ্টি করার আগ্রহ উদ্দীপনাও ছিল প্রবল। এখন সেই আগ্রহ উদ্দীপনা বিলুপ্ত হইয়া শুধুমাত্র বিমূর্ত (abstract) গৌরব ও মমত্ববোধটুকু অবশিষ্ট রহিল। এমন কি, সংযম, আত্মত্যাগ ও অনুশীলন দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া যেখানে তিনি বাস্তব

সত্যকে পরিবর্ত্তিত করিয়া অধ্যাসের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন (যথা আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম-এ), সেখানে তাঁহার সংগ্রামশীলতা অন্তর্হিত হইয়া বর্তমানে শুধু সংযম, আত্মত্যাগ ও অনুশীলনের সুখানুভূতিটুকু লইয়াই তাঁহাকে পরিতৃপ্ত হইতে হইল। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' তিনি ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,

"১। মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।" (কৃষ্ণচরিত্র, উপক্রমণিকা ; সাঃ পঃ সং ; পৃ ১০)

এবং "জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।" (ধর্ম্মতত্ত্ব, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; পৃ ৬৮) ব্যক্তিগত জীবনে এই মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করা, এবং এই তত্ত্বানুশীলনের সুখানুভূতিই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই তাঁহার পরবর্তী সাহিত্যজীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। জাতীয় জীবনের বৃহত্তর পরিসরে এই আদর্শকে উপলব্ধি করার পরিবর্তে নিজের জীবনে ইহার রূপহীন আবেদন অনুভব করার ভিতর দিয়াই তাঁহার কর্মময় জীবন পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৃহত্তর জীবনের গতিশীল প্রবাহ হইতে নিজেকে সরাইয়া আনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিজেকে বাহিরে প্রসারিত করার পরিবর্তে নিজের মনোরাজ্যে নিজেকে সঙ্কুচিত করেন। ইহার আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

এই পরাভব এবং সৃষ্টিশীল সংগ্রাম বর্জনের চিহ্ন আশ্চর্য গতিশীল ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ'-এও (১৮৯৩ সালের "পুনঃপ্রণীত" সংস্করণ) দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ'-এর বিজ্ঞাপনে এই উপন্যাস রচনার পেছনে উদ্দেশ্য কি, তাহা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, "এই উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরেজসাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের

বাহুবলই আমার প্রতিবাদ্য।" রাজপুত ইতিহাসের কয়েকটি গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম ও সাহিত্য জীবনের ইতিহাসে এই প্রথম তাঁহার আদর্শ পুরুষ ইতিহাসের বিচারে উত্তীর্ণ হইলেন। আর শুধু রাজসিংহই নয়, তাঁহার কল্পনার বর্ণরসে যে সব চরিত্র জন্মলাভ করিয়াছে, অর্থাৎ চঞ্চলকুমারী, নির্ম্মল, মাণিকলাল প্রভৃতি, তাহাদের দৃঢ়সংযত আচরণ, স্থির সত্যবুদ্ধি, এবং জাতিগত দম্ভের ভিতর দিয়াও অপূর্ব শক্তি ও প্রাণচাঞ্চল্য ব্যঞ্জনালাভ করিয়াছে। নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবকে বলিতেছে, "জানি গোরুর পাল সম্মুখে রাখিয়া লড়াই করিয়াই মুসলমান হিন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে নহিলে রাজপুতের বাহুবলের কাছে মুসলমানের বাহুবল, সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ।" নির্ম্মলকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শিল্পীর অন্তরে অপরিসীম শক্তি ও দার্ঢ্য না থাকিলে নির্ম্মল স্বয়ং ঔরঙ্গজেবের মুখের উপর এই কথা বলিতে পারিত না। রাজপুতদের ধূর্ত রণকৌশল, দুঃসাহসিক অভিযান, স্বাজাত্যবোধ, এবং শিল্পীহৃদয়ের রস ও শক্তি-ঢালা যুদ্ধ বর্ণনার মধ্য দিয়া রাজপুত বাহুবলের প্রাধান্য ও গৌরব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, মানবিক ক্ষেত্রেও সেই শ্রেষ্ঠতার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। "হিন্দু ক্ষুধার্ত্তের অন্ন যোগান পরমধর্ম্ম বলিয়া জানে। অতএব হিন্দু, শত্রুকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহে না।" (রাজসিংহ, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ; পৃ ১৭২) রাজসিংহের দ্বিতীয় পুত্র ভীমসিংহ সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত রাজসিংহের অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু পীড়িত প্রজাগণ রাজসিংহকে অনুরোধ করায় "করুণ-হৃদয় রাজসিংহ তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভীমসিংহকে ফিরাইয়া আনিলেন।" (ঐ, পৃ ১৯৯)

কিন্তু রাজসিংহ "দয়ার অনুরোধে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিলেন না।" (ঐ; পৃ ১৯৯) বঙ্কিমচন্দ্রও উপন্যাসের মত কোথায়ও রাজসিংহকে হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপনের অথবা মুঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিয়া হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আদর্শে অনুপ্রাণিত বলিয়া চিত্রিত করেন নাই। রাজসিংহের সুমহান হৃদয়বৃত্তি, তাঁহার মহানুভবতা ও আত্মসম্মান বোধ, তাঁহার পারদর্শিতা ও রণকৌশল, এবং সুস্থ নীতিবোধ উপন্যাসের গতিধারার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন একজন ঐতিহাসিক পুরুষের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুসাম্রাজ্য ও হিন্দুধর্ম পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার আদর্শ [illegible] করিলেন না কেন, এবং তাঁহার চরিত্রকেও তদনুসারে রূপায়িত করিলেন না কেন, বঙ্কিম-মানসের সহিত আমাদের পূর্ব-পরিচয়

হইতে সে প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থাপন করা যাইতে পারে। রাজা সীতারামকে যে গৌরব দানের চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন, রাজসিংহকে সে গৌরবে মণ্ডিত করার কোনরূপ প্রচেষ্টা তিনি করিলেন না কেন? গ্রন্থের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।" (ঐ পৃঃ ১৯১) "বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন," ইহাই এখানে প্রধান কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই, উদ্দেশ্যকে তিনি এমনভাবে সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন কেন, অথবা শুধুমাত্র বাহুবল প্রতিপাদনেই তিনি সন্তুষ্ট হইলেন কেন। পূর্বের ন্যায় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলেন না কেন। এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, ব্যবহারিক জীবনের ন্যায় তিনি আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই প্রতিষ্ঠার আর কোন মোহ ছিল না। আর এই উক্তির তাৎপর্য অনুসরণ করিয়া আমরা পুনরায় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই, বঙ্কিমচন্দ্রের সংগ্রামশীল, সৃষ্টিশীল প্রেরণা ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে, এবং এই চেতনা তাঁহার মানস-পটে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সেই স্বর্ণ-অতীতকে আর নির্মাণ করা যাইবে না; কালের প্রবহমান ধারায় যাহা মিলাইয়া গিয়াছে, তাহাকে অনন্তকালের মধ্যে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাই তাহার মধুর স্মৃতিটুকু লইয়াই অতৃপ্ত মনকে সান্ত্বনা দিতে হইবে।

অবশ্য এই স্মৃতিটুকু যে মূল্যবান তাহা অনস্বীকার্য, কিন্তু অশ্রুঝরা নয়নে ঐ চিত্রটির পানে তাকাইয়া প্রতিপক্ষকে নিজ প্রাধান্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হইতে বলার মধ্যে একটা নেতিধর্মী শ্রেষ্ঠতাবোধেরই স্বাক্ষর মিলে। কারণ, ইহাতে সংগ্রামের পরিবর্তে আছে সংগ্রাম বর্জনের প্রেরণা, বাস্তব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করার সংকল্পের পরিবর্তে আছে বাস্তব-সম্পর্ক-শূন্য বিমূর্ত আনন্দের আস্বাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারিক জীবনেও এই সময়ে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। "তিনি কৌষিক বস্ত্র পরিধান করিতেন, নামাবলী গায়ে দিতেন, হবিষ্যান্ন ও ফলমূল ছাড়া অন্য কিছু আহার করিতেন না। কয়েক মাস এইভাবে কাটাইয়া যখন দেখিলেন, হবিষ্যান্ন কোন মতেই তাঁহার শরীরে সহ্য হইল না, তখন তিনি আবার পূর্ব্ববৎ আহার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মন তখন শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সমর্পিত,

হৃদয় ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণ। ভগবৎ-চরণে সমস্ত হৃদয়টুকু লুটাইয়া দিয়া তিনি বলিতেন,—

'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" (৫৯)

এই আত্মসমর্পণের মধ্যেই তাঁহার কর্ম ও সাহিত্য জীবনের পরিসমাপ্তি।

কিন্তু এই আত্মসমর্পণের মধ্যেও 'রাজসিংহ'-এর কাহিনী যেরূপ অস্বাভাবিক গতিবেগের সহিত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার অন্তরের অমিত শক্তি ও উষ্ণতার পরিচায়ক। উপন্যাসের বহু গ্রন্থিই অবিশ্বাস্যতার চোরাবালিতে আবৃত; যথা মাণিকলালের কীর্তিকলাপ, নির্মলের মুঘল রাজপ্রাসাদে প্রবেশ, মাণিকলাল কর্তৃক মবারকের পুনর্জীবন দান, ছদ্মবেশে মবারকের বাদশাহী সৈন্য শিবিরে গমন, যুদ্ধক্ষেত্রে দরিয়ার আবির্ভাব, ইত্যাদি ইত্যাদি। যে কোন মুহূর্তে এখানে যেকোন গ্রন্থি ছিঁড়িয়া কাহিনী টুকরা টুকরা হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এমন দ্রুতগতিতে এই চোরাবালির উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন যে, তাহার পদস্খলনের কোন অবসর ছিল না।(৬০) প্রথম কাহিনীতে (দুর্গেশনন্দিনী) যে আশ্চর্য প্রাণপ্রাচুর্য ও গতিবেগের স্বাক্ষর ছিল, তাহার সর্বশেষ কাহিনী 'রাজসিংহ'-এ (১৮৮২ সালে যে ক্ষুদ্র 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হয় তাহা নয়, ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত বর্ধিত 'রাজসিংহ' সম্পূর্ণ অভিনব) সেই স্বাক্ষর অমলিন। ইহার একমাত্র তাৎপর্য এই যে, যে শক্তি লইয়া তিনি কর্মজীবনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা ক্ষুদ্র ছিল না; সামাজিক সম্পর্কের ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া যে শক্তি আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, তাহা উপেক্ষণীয় নয়। সম্পূর্ণ প্রতিরোধ্য এক শক্তির আপাত বিজয়ে প্রতিহত হইয়া তাহা নিশ্চিত ভবিষ্যৎ বিজয়ের জন্য মনেপ্রাণে প্রস্তুত হইতেছিল মাত্র।

(৫৯) বঙ্কিমজীবনী—শচীশ চট্টোপাধ্যায়, পৃ ৪৪২

(৬০) তুলনীয়: "যেন রেলপথের মাঝে মাঝে এমন এক আধটা ব্রিজ আছে যাহা পুরা মজবুত বলিয়া বোধ হয় না—কিন্তু চালক তাহার উপর দিয়া এমন দ্রুত গাড়ি লইয়া চলে যে, ব্রিজ ভাঙ্গিয়া পড়িবার অবসর পায় না।" রবীন্দ্রনাথ, রাজসিংহ, আধুনিক সাহিত্য।

রূপায়িত মানুষ

ভারতে বৃটিশ বিজয়ে পুরাতন পচনশীল ভারতীয় সমাজের অন্তর ভেদ করিয়া ভারতে কি ভাবে নূতন সমাজের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এই নূতন সমাজের নব সংগঠিত অর্থ নৈতিক শ্রেণীর সহিত পূর্বতন সমাজের বর্ণভেদসম্মত শ্রেণীর কোনরূপ সংযোগ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। নূতন সমাজের ভূস্বামী শ্রেণীর সহিত পূর্বতন সমাজের ভূস্বামী শ্রেণীর, নূতন বণিকশ্রেণীর সহিত পুরাতন বণিকশ্রেণীর, এমন কি নূতন শিক্ষা-গর্বী বুদ্ধিজীবীদের সহিত পূর্বতন বুদ্ধিজীবীদের কোনরূপ বংশপরম্পরাগত যোগসূত্র অথবা সাদৃশ্য নাই বলিলেই চলে। এই সমাজ পুরাতনের অন্তর-নিসৃত হইলেও তাহা পুরাতন নয়, নূতন। বৃটিশ অভিযানের আগে হইতেই যে ভয়াবহ সামাজিক সংকট দেখা দেয়, এবং বৃটিশ বণিকশ্রেণীর আবির্ভাবে যে সংকট ঘনীভূত হয়, সেই সংকটের মধ্যেই নূতন ভূস্বামী, বণিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাব, এবং এই সংকটের মধ্যেই তাহাদের পরিপুষ্টি। আবার তাহারাই এই নূতন সমাজের নব সংস্কৃতির প্রবর্তক। ইহাও স্মরণযোগ্য, দেশীয় সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় এই নূতন শ্রেণীগুলির আবির্ভাব হয় নাই বলিয়াই পুরাতন দেশীয় সমাজের সহিত তাহাদের বিরোধ জন্মগত। নূতন ভাবাদর্শ ও শক্তির অভিঘাত সহ্য এবং উপেক্ষা করিয়াও পুরাতন সমাজ কাঠামোর যে ধ্বংসাবশেষ বৃহত্তর জনসাধারণের জীবনকে অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া আসিয়াছিল এবং যাহা প্রাণপণ আত্মসংরক্ষণের চেষ্টা করিতেছিল, তাহার সহিত এই নূতন শ্রেণীর ব্যবধান ছিল বিস্তৃত। সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে সৃষ্ট বলিয়াই তাহারা নিজেদের সাম্রাজ্যিক শাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে ভাবিতে শিখিয়াছিল। তাই তাহাদের এই উৎকেন্দ্রিক অবস্থিতির জন্য তাহারা একদিকে ছিল বৃহত্তর জনসাধারণের সহিত সম্পর্কহীন, ও অন্যদিকে ছিল সবরকমের সামাজিক দায়মুক্ত। আত্মসর্বস্বতাই ছিল তাহাদের জীবনাচরণের প্রধান লক্ষ্য। আর যে সামাজিক সম্পর্ক তাহাদিগকে ধারণ এবং লালন করিয়াছিল, তাহার মূল

কথা ছিল বিদেশী বণিকতন্ত্রের সহিত তাহাদের আত্মীয়তা বোধ।

কিন্তু দেশী গণ-জীবনের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইলেও দেশীয় সমাজের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের সমস্যা ছিল; আবার বণিকতন্ত্রের সম্পর্ককেও অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদ ছিল। এই দ্বিবিধ সমস্যার স্ব-বিরোধের তরঙ্গে তৎকালীন সংস্কৃতিবান শিক্ষিত সমাজ-মানস কিভাবে আলোড়িত হইয়াছিল, তাহাও ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলেও এই বিরোধের মীমাংসা হয় নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আত্মসচেতন বিদগ্ধ-মানস তখনও বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রবাহ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে, গভীর ও স্থিতিশীল সম্পর্কে নিজেকে বাঁধিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলিতেছেন, "...এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেকচর, এড্রেস, প্রোসিডিংস্, সমুদায় ইংরাজিতে।... এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই।... সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায় সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না।" (৬১) গণ-জীবনের সহিত এবং ব্যাপক অর্থে সমাজ-জীবনের সহিত তখন পর্যন্তও কোনরূপ সংযোগ ও দৃঢ়ীভূত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অথচ যে সম্পর্ক তাহাদিগকে এতকাল ধারণ করিয়া আসিয়াছিল অর্থাৎ বিদেশী বণিকতন্ত্রের আত্মীয়তাবোধের সম্পর্ক, সে সম্পর্কও উত্তরোত্তর শিথিল হইতে শিথিলতর হইতেছিল। রাজপুরুষগণের পিতৃস্নেহ উচ্চ রাজপদাভিলাষী শিক্ষা-গর্বী মধ্যবিত্তের উপর আর ঠিক একইভাবে বর্ষিত হইতেছিল না, এবং সাধারণভাবে ইঙ্গ ভারতীয় সমাজ-সম্পর্কও অত্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছিল। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, "ইংরেজের আমলের প্রথম সাহেবেরা অনেক পরিমাণে এদেশীয় আচার ব্যবহার পালন করিতেন।...তখনকার সাহেবেরা পান খেতেন, আলবোলা ফুঁকতেন, বাইনাচ দিতেন ও হুলি খেলতেন। সেকালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে, শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া,

(৬১) বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা : বিবিধ প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃ [illegible]

কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন। এখন সেকাল গিয়াছে। এখনকার সাহেবদিগকে দেখিলে, তাঁহাদিগের সেই সকল সাহেবদের হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। ইঁহাদের আর এদেশীয়দের সহিত সেরূপ ব্যথার ব্যথিত্ব নাই, তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের সেরূপ স্নেহ নাই, সেরূপ মমতা নাই।"(৬২) শুধু সামাজিক সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাবোধই নয়, ব্যবহারিক কর্মজীবনে কি ভাবে মধ্যবিত্তের আশা হতাশায়, সম্ভাবনা অতীত-স্মৃতিতে, পর্যবসিত হয় তাহাও পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এই হতাশা সেই যুগেই এমন ভয়াবহ পরিণতি লাভ করিয়াছিল যে, রাজনারায়ণ বসু আক্ষেপ করিয়াছিলেন, ইংরাজী শিক্ষা না করাও বরং ভাল ছিল।(৬৩) বয়সে প্রবীণ মধ্যবিত্তের জীবন ইতিহাসই নয়, অপেক্ষাকৃত তরুণ দেশী পুঁজিপতিরাও চলতি সাম্রাজ্যিক সম্পর্কের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না ; বাধা নিষেধের চক্রে তাহাদের প্রতিও শুধুমাত্র কনিষ্ঠ অংশীদাররূপে সুখী থাকার নির্দেশ ছিল। সুতরাং, নূতন সমাজের প্রাণকেন্দ্রেও অভিনব সংকট দেখা দেয়। নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, অথচ পূর্বতন সম্পর্ক অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। এই সংকটে মানস-রূপান্তরও তাই স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভে যে সমাজবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ব্যক্তি-মনের উন্মেষ হইতে থাকে। পূর্বতন সমাজবিন্যাসে পরিবারগত অথবা গোষ্ঠীগত সত্তা ছাড়া ব্যক্তির স্বতন্ত্র কোন সত্তা ছিল না। তাই পরিবার বা গোষ্ঠীর অনুশাসন অনুযায়ী স্বীয় জীবনাচরণ নির্ধারিত করাই ছিল ব্যক্তির একমাত্র দায়। অর্থাৎ তখনকার সময় ক্ষেত্র বিশেষে পরিবার এবং ক্ষেত্র বিশেষে গোষ্ঠীকেই একক ধরা হইত। কিন্তু এই সমাজ বিপ্লবের ফলে সমাজ সংগঠন আমূল রূপান্তরিত হয় এবং ব্যক্তি-মন পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে থাকে। পরিবার ও গোষ্ঠীগত অনুশাসনের অবমাননা করিয়া সম্পূর্ণ একক ভাবে, স্বতন্ত্র বৃত্তি অনুসরণের অবকাশ দেখা দেয়। ব্যক্তিই নূতন সমাজ ব্যবস্থার একক (unit)। পুরাতন সম্পর্ক অবলুপ্ত হইয়া ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, এবং স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে প্রকাশ করার, উপলব্ধি করার, ঘোষণা করার অধিকারও স্বীকৃত হয়। এই নব ব্যবস্থা ও মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি নূতন আলোকে নিজেকে উপলব্ধি

(৬২) সেকাল আর একাল ; রাজনারায়ণ বসু, পৃ ৩-৪

(৬৩) ঐ ; পৃ ৭৯

করিতে আরম্ভ করে; পরিবার বা গোষ্ঠীর সকলের মধ্যে, সকলের সহিত সম্পর্কিত হইয়া সে এক নয়, সে আপানাতে আপনি সমৃদ্ধ, আত্মগতভাবেই সে এক। সুতরাং, নিজেকে অন্যান্যদের সহিত সম্পর্কিত না করিয়া, নিজেকে বিশেষ ভাবধারায়, বিশেষ আন্তর প্রেরণায়, বিশেষ সৌন্দর্যে মণ্ডিত দেখিতে পাওয়া ব্যক্তির পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। রুসোর বিখ্যাত উক্তি "I am not like anybody else I see; if I am not better at least I am different," দ্বারা ব্যক্তি-মানসের এই নবচেতনার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। নূতন সমাজ-বিন্যাসের ভিতর হইতে ব্যক্তির এই ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্যের অভ্যুদয় হইতেছিল। পুরাতনের অবরোধ এইভাবে অকস্মাৎ দূর হওয়ায় ব্যক্তি যেমন একদিকে একটা অপূর্ব অনন্য-নিরপেক্ষতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইতে থাকে, আবার তেমনি নিজ সত্তার মধ্যে সে অখণ্ড অপরিমেয় শক্তির উৎস আবিষ্কার করিয়া চমকিত হইয়া ওঠে। যেখানে আগে তাহার পক্ষে নিজেকে জানারও অবকাশ ছিল না, সেখানে এখন সে আকাশকে জানার স্পর্ধায় মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

বাংলাদেশে রামমোহন হইতে মধুসূদন পর্যন্ত মানস-বিবর্তনের ইতিহাসে ব্যক্তিমানসের জাগরণ, সংগ্রাম ও অভিব্যক্তির সুন্দর নিদর্শন রহিয়াছে। রাম-মোহনে ইহার জাগরণ, বিদ্যাসাগরে ইহার সংগ্রাম এবং মধুসূদনে ইহার অভিব্যক্তি। রামমোহন স্বীয় জীবনাচরণের যে মূল্যমান সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা সর্ববিধ সংস্কার ও আচ্ছন্নতার কলুষ-মুক্ত ছিল। সেই বলিষ্ঠ যুক্তিবাদকে অব-লম্বন করিয়াই তিনি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে পরিশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন দর্শন ছিল বাস্তব ব্যবহারিক জীবনের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই আলোকেই তিনি "অতিসূক্ষ্ম অধ্যাত্মবাদের সন্ন্যাস বৈরাগ্য ও সর্ব্বপ্রকার গুহ্য-সাধনার" (৬৪) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; সেই আলোকেই তিনি বাস্তব জীবনের সাফল্য ও কল্যাণের পরিমাপে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে রঞ্জিত করিতে চাহিয়াছিলেন। রামমোহনের এই প্রতিবাদ বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ জীবনের অকুতোভয় স্বীকৃতির মধ্যে পূর্ণতর প্রকাশ লাভ করে। বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবন, কর্ম ও রচনার ভিতর দিয়া নির্ভয়ে একথাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, এই ব্যবহারিক জীবনই পরম; অতীন্দ্রিয় কোন জীবন থাকিতেও

(৬৪) উক্তিটি শ্রীযুক্ত মোতিলাল মজুমদারের। বাংলার নবযুগ ও কবি শ্রীমধুসূদন; শনিবারের চিঠি, ভাদ্র, ১৩৫০, পৃ ৩৩২

পারে, না থাকিতেও পারে, কিন্তু কোন সময়েই এই পারমার্থিক জীবনের চিন্তা অথবা মুক্তি চিন্তা তাঁহাকে বিব্রত করে নাই; তিনি জীবনকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। তাই রামমোহনের প্রতিবাদ বিদ্যাসাগরের সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। মানুষের আত্মোপলব্ধির যে সম্ভাবনা আছে, তাহার অণুপরমাণুতে যে সৃজনীশক্তি, যে কর্মশক্তি, যে ভোগের শক্তি আছে তাহার অম্লান উন্মেষসাধনেই তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। সর্বভাবে জীবনের উপলব্ধি ও পূর্ণতা সধানই একমাত্র কাম্য; ইহাই জীবনের চরম ও পরম জিজ্ঞাসা। ইহার বাহিরে দৃষ্টি ক্ষেপণ করা অপ্রয়োজনীয়। বিদ্যাসাগরের এই বিশুদ্ধ জীনববেদ আত্ম-চেতনা ও আত্মপ্রকাশ লাভের অজস্র আনন্দে মাইকেল মধুসূদন দত্তে অভিব্যক্তি লাভ করে। ব্যক্তি মানস পরিপূর্ণভাবে নিজেকে জানিয়াছে, তাহার অন্তর্গূঢ় শক্তিব সন্ধান পাইয়াছে এবং সেই শক্তির অনির্বাণ আলোকে সে জয় করিতে চাহিয়াছে সমগ্র পৃথিবীকে। সে স্পর্ধা করিয়াছে আকাশেব নীলকে, অতলস্পর্শী সমুদ্রের অন্তরকে, যাত্রা কবিতে চাহিয়াছে দুর্লঙ্ঘ্য প্রান্তরে, আবোহণ করিতে চাহিয়াছে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গে। তাঁহার 'মেঘনাদবধ' এই অখণ্ড ভাবের অভিব্যক্তি এবং সেজন্যই তাঁহার ইন্দ্রজিৎ মরিয়াও অমর। ব্যক্তি-মানসের এই প্রাণশক্তি এবং ভ্রূক্ষেপহীন অভিযানেব পথে বঙ্কিমযুগে বিঘ্ন দেখা দেয়। যে উৎস-কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্তি-মন নিজেকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল, তাহার রস ক্রমেই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। প্রচলিত সম্পূর্কের সহিত ব্যক্তি-মনের আর কোনক্রমেই সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভব হইতেছে না।)

সমাজ-সম্পর্কের এই অবনতি বিদগ্ধ সমাজেব পক্ষে আরও বেশী করুণ, আরও বেশী মর্মান্তিক। পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণী নিজের বর্ণসংকর জন্মের জন্য এমনিতেই সঙ্কুচিত ছিল, নিজ পরিধির বাইরে দেশী সমাজের অন্যান্য অংশের সহিত তাহার কোন সংযোগ ছিল না। সমাজ-বিবর্তনের ফলে গোষ্ঠীগত ও পরিবারগত দায়ও তাহার শিথিল হইয়া গিয়াছে; তাব ওপর সাম্রাজ্যতন্ত্রের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিন্ন হইতে চলিয়াছে। তাহার ব্যবহারিক জীবনের সমৃদ্ধিও অস্বীকৃত হইতে চলিয়াছে। সবদিকেই সম্পর্ক হারাণোর ফলে স্বাভবতই বৈদগ্ধ-পরায়ণ ব্যক্তি-মন নিজেকে নিঃসঙ্গ এবং একা না ভাবিয়া পারে না; আর সমাজের আর কাহারো মতও নয়, সে স্ব-তন্ত্র। এই নিঃসঙ্গতাবোধ ও এককবোধ হইতে একান্ত ব্যক্তিগত যে সব সমস্যা, চিন্তা আশা-নিরাশা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সহজাত দুঃখবোধ জন্মলাভ করে, তাহা অকৃপণভাবে

ও অসঙ্কোচে অন্যের অনুভূতিগত করিয়া সান্ত্বনা ও পরিতৃপ্ত লাভের সম্ভাবনা তাহার কম, কেন না সে একা; স্ব-তন্ত্র বলিয়াই অপরকে সহ-দরদী করার কথা অন্তত মনে মনেও সে সাধারণত আমল দিতে চায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনেও এই বৈশিষ্ট্যের বিলক্ষণ নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহার জীবন লিপিকারগণ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য, একাকীত্ব ও দুঃসহ নিঃসঙ্গতাবোধের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। গভীর সাংসারিক ও মানসিক অশান্তির মধ্যেও তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং হিতৈষীর নিকট নিজেকে উন্মুক্ত করিতেন না। এই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার অস্বাভাবিক আত্মসংযম এবং প্রকাশ্যে শোক জ্ঞাপনে অনিচ্ছা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই অভিমানী ব্যক্তি-মনটিই নিজেকে প্রকাশ করার জন্য, নিজেকে ঘোষণা করার জন্য, নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য অন্তরের অনির্বাণ আগুনে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের অভ্যাস দ্বারা বাস্তবকে রূপান্তরিত করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। একদিকে নিদারুণ নিঃসঙ্গতাবোধ, অপরদিকে অপরিমিত প্রাণশক্তি, এই দুই মনোভাবের তরঙ্গে সমকালীন ব্যক্তি-মানস উদ্বেলিত হইয়াছিল। চারিদিকে বাধা নিষেধের জাল, অগ্রগমনের পথ অবরুদ্ধ, আর এই অবরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করার সঙ্কল্পে ব্যক্তি-মানসের উদ্দামতা,—এই দুই শক্তির সংঘর্ষে সমকালীন সমাজ আলোড়িত হইয়াছিল। আর আত্মঘোষণার এই ভ্রূক্ষেপহীন যাত্রাই তৎকালীন সংগ্রামশীল মানুষকে অসামান্য মহিমা দান করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই যে তিনি এই মানুষকে, যে মানুষ অন্তরের অপরিসীম নিঃসঙ্গতা সত্ত্বেও অম্লান জয়যাত্রার পথে নিজেকে বিকশিত করার সংগ্রামে ব্রতী হইয়াছে, এই মানুষকে তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার রোমান্স এবং উপন্যাসে এই মানুষের সঙ্গেই আমরা পরিচিত হই। সামাজিক উপন্যাসে হউক, আধা ঐতিহাসিক আধা কাল্পনিক কাহিনীতে হউক, অথবা বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসেই (রাজসিংহ) হউক, সর্বত্রই তাঁহার নায়ক নায়িকার মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যধর্মিতা, বেদনা এবং বাস্তব জীবনের সমবেদনাহীন পরিবেশের বিরুদ্ধে একটা অব্যক্ত বিদ্রোহের ভাব দেখা যায়। জীবনের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ প্রবল, জীবনকে উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের অপরিসীম, এবং বাঁচিয়া থাকা বা বাঁচিয়া থাকার প্রচেষ্টাই তাহাদের নিকট যেন কত আনন্দময়, কত মধুর। তাহারা এমন এক সামাজিক পরিবেশের সন্তান যে পরিবেশে বাঁচিতে জানা, বাঁচিতে শিখার জন্য সর্বাঙ্গীণ

প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে, অর্থাৎ, এমন এক সৃষ্টিশীল, নব অনুপ্রাণনায় চঞ্চল পরিবেশে তাহাদের জন্ম, যেখানে নূতন সংস্কৃতি, নূতন জীবন-দর্শন গড়িয়া উঠিতেছিল। এই পরিবেশে জীবনকে জানা, দেখা, উপভোগ করাই প্রধান কথা। এই কর্মটাই যেন পরম বিস্ময়ের বস্তু। বঙ্কিমচন্দ্র এই মানুষকে তাঁহার সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; তাঁহার মানস-জাত নায়ক নায়িকা প্রত্যেকেই জীবনের অপূর্ণ আস্বাদের কথা, জীবনকে সৃষ্টি করার চাঞ্চল্যের কথা আমাদের কানে কানে বলিয়া যায়। জীবন তথা সংস্কৃতি সেখানে সৃষ্টির পথে। তাই, বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলির সহিত বর্তমান পচনশীল সমাজের অথবা শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলির পার্থক্য বিরাট। বর্তমান সমাজের মানুষ জীবনের ভারে পঙ্গু; মন তাহার অবসন্ন; সমাজের যুক্তিহীন প্রাণহীন জীবনধারা তাহাকে নির্মম ভাবে ব্যঙ্গ করিতেছে; সেই ব্যঙ্গে সে নিজের সম্পর্কেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে, সম্ভবত তাহার নিজের কর্মও সমাজের অন্যবিধ কর্মধারার ন্যায় ভয়াবহ; সে তাই কর্ম-ভীরু, নিজের মানসিক ব্যাধিকে গোপনে লালন করিতে এবং সম্ভবস্থলে তাহা সংক্রমণ করিতেই তাহার বিকৃত আনন্দ। সমাজ মানুষকে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে যে জীবনে তাহার আনন্দ নাই, মৃত্যুতেও তাহার বিশ্বাস নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের ব্যর্থতা ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে আরম্ভ করিলেও মানুষ জীবনের প্রতি আকর্ষণ অথবা জীবনের স্বাদ বিস্মৃত হয় নাই। তাহারা নিরঙ্কুশভাবেই জীবনকে চায়, জীবনের অবলুপ্তিকে নয়, জীবনকে যে তাহারা ভালবাসিয়াছে, সেই কথাটাই তাহারা সকলকে জানাইতে চায়। প্রাণশক্তির তাহাদের অভাব নাই; মন তাহাদের বিকারগ্রস্ত বা পঙ্গু নয়, দেহ তাহাদের দুর্বল নয়, জীবনের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ দিনের হাসি ছড়ানো বর্ণের মতই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমের চরিত্রগুলির মধ্যে কেহই দুর্বলচরিত্র বা কাপুরুষ নয়। এবং কাহারও মধ্যেই ব্যক্তিত্ব বা পৌরুষের অভাব নাই। ব্যক্তি বিশেষ কোনও কারণে কোনও সময় নিন্দিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে ক্ষুদ্র নয়, হীন নয়, আত্মাবমাননায় ম্রিয়মান নয়। চরিত্র গঠনের এই বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা সেই যুগধর্মেরই লক্ষণ, আর সেজন্য বঙ্কিম-চন্দ্রের মানস-চরিত্রগুলিও ক্ষুদ্র অথবা হীন অথবা শক্তিহীন হইতে পারে না। উদার মানবিক গুণে তাহারা সমৃদ্ধ। ভোগে যেমন তাহাদের আনন্দ আছে, চরম মুহূর্তে তাহা অস্বীকার করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস ও রোমান্সে জীবনের প্রতি এই আকর্ষণের, বাঁচার এই আনন্দের পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবনের এই চেতনায় প্রাণবন্ত। এই দিক হইতে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য বাইরের অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক হইতে যতখানি, ভাবের দিক হইতে, মানস জীবনের দিক হইতে তাহা অনেক পরিমাণে বেশী। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রচলিত সামাজিক সম্পর্ক এই মানুষকে আত্মস্ফূর্তির উপযুক্ত অবকাশ দিতেছে না, এবং তাহার মনুষ্যত্বকে উদার অভ্যর্থনা জানাইতেছে না। তাই ব্যক্তিমন পরিবেশের সঙ্গে তাহার কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না। নিজেকে এক হৃদয়হীন পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ দেখিতে পায়, যে পরিবেশ তাহার সুখসমৃদ্ধি ও মনোবেদনার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আপনভাবে স্ব-নিয়মে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই প্রবাহের মধ্যে নিজের জীবনের কোনরূপ স্ফূর্তি দেখিতে না পাইয়া সহজেই সে এই প্রবাহ হইতে দূরে সরিয়া থাকে, এবং আত্মস্ফূর্তির আকুতিতে চঞ্চল হইয়া উঠে। তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকের নায়ক-নায়িকার মনোজীবন আলোচনা করিলেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

কতলু খাঁর কাম-কণ্টকিত প্রাসাদের বিলাস-ব্যসনের মধ্যেও আয়েষা স্বাতন্ত্র্যধর্মী; তাহার হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের স্থান নাই, এবং তাহার এই একাকিত্বই একদিন জগৎসিংহের নিকট নিজেকে প্রকাশ করিয়া ফেলে। অথচ রাজপ্রাসাদের দুর্নীতির মধ্যে আত্মনিমজ্জন করা তাহার পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা তাহা করিতে পারে না। এমন কি, ওসমানও নিঃসঙ্গ; আয়েষাকে সে বলিতেছে, "আমি আশা-লতা ধরিয়া আছি, আর কত কাল তাহার তলে জল সিঞ্চন করিব?" হেমচন্দ্র তাহার প্রেমাস্পদকে হারাইয়া দিক্‌ভ্রান্ত, আর "কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।" তিলোত্তমা, ভ্রমর, শৈবলিনী, রজনী, রোহিনী, কুন্দ প্রত্যেকেই তাহাদের নিজ নিজ পরিবেশের মধ্যে একা, আত্মীয়হীন; তাহাদের সকলের কথাই রোহিণীর এই উক্তির মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে, "রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখে শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।" আর অমরনাথ বলিতেছে, "আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারি না কেন? জড়জগৎ জগৎ, অন্তর্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্যজগতে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি বা নাই? আমার অন্তরে যা আছে, তাহা তোমার বাহ্যজগৎ

দেখাইবে, সাধ্য কি?" বহুবিধ কর্মে এবং আত্মজয়ের সংগ্রামে নিয়োজিত প্রতাপের মনের গোপন কথাও ইহাই। এই নিঃসঙ্গতাবোধ সমষ্টি-ক্রিয়ায় নিয়োজিত আনন্দমঠের সন্তানদের মধ্যেও সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের একটি গানের একটি লাইন এই, "তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে।" শ্রী এবং প্রথমদিকের সীতারামও তেমনি নিঃসঙ্গ মনে আপনার সুখস্বপ্ন রচনা করিয়া চলিয়াছে। সর্বোপরি কমলাকান্ত, যাহার সহিত বঙ্কিম-মানস ওতপ্রোত-ভাবে একীভূত হইয়া আছে, সেও একা। "আমি একা...এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোত মধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্বুদ-সমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই?...আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?" তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন মানুষের নিঃসঙ্গ জীবনের অপ্রকাশিত কাহিনীটি অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে কথা আর কাহাকেও বলা যায় না, যে কথা মনই মনকে বারংবার শোনাইতে চায় এবং শোনাইয়া সান্ত্বনা লাভ করে, সেই কথাই, জীবনের প্রতি অনাবিল মোহসঞ্জাত এই দুঃখবোধই বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার মধ্যে কখনো বা স্ফুট কখনো বা অস্ফুটভাবে প্রাণ পাইয়াছে। তাহাদের এই একাকিত্বের মধ্যে সহজেই বঙ্কিমযুগের মানুষকে আবিষ্কার করা যায়, যাহার সহিত প্রচলিত সমাজ-সম্পর্কের বিরোধ চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, এবং যে-মানুষ বাহিরে নিজেকে প্রসারিত করার পর্যাপ্ত সুযোগ না পাইয়া নিজের মনে মনে তাহার একাকিত্বকে অনুভব করিতে শিখিতেছে। কিন্তু জীবনের প্রতি মোহেই তাহার শক্তি, আর তাহার একাকিত্ববোধ সেই শক্তিকে প্রচণ্ড এবং দুরন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

তাহাদের প্রত্যেকের জীবনেই কল্পনা ও বাস্তবের বিরোধ। অধিকাংশের জীবন না-পাওয়ার বেদনায় ধূসর, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার চাপে মুহ্যমান। আর যাহারা কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে সুখের স্পর্শ লাভ করিয়াছে অথবা যাহাদের জীবন ভবিষ্যৎসম্ভাবনার ইঙ্গিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে, তাহারাও দীর্ঘদিনের রিক্ততা বঞ্চনা এবং কঠোর পরীক্ষার পর শিল্পীর একান্ত পক্ষপাতিত্বের জন্যই অনেক সময় এই পুরস্কার লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা ও দুঃখভোগের ভিতর দিয়া, সীতারামের মাধ্যমে শিল্পীর এই আকুতি "হায়! তোমার আমার কি নূতন মিলিবে না? তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না?" অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের

পুরুষ চরিত্রগুলি শক্তিমান, বীর্যবান, বুদ্ধি ও তেজে প্রদীপ্ত, অঙ্গসৌষ্ঠবে তাহারা আকর্ষণীয়; আর তাঁহার স্ত্রী-চরিত্রগুলিও অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সহজভাবে পাঠককে আকৃষ্ট করে। তাঁহার পাত্র-পাত্রী প্রত্যেকেই সৃজনী শক্তিতে উদ্বেল। তাহাদের মধ্যে যে ভোগের শক্তি রহিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে যে প্রেম এবং ত্যাগের শক্তি রহিয়াছে, এক কথায় জীবনকে উপলব্ধি করার যে প্রেরণা রহিয়াছে, তাহা নিজেকে প্রকাশ করার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উপলব্ধির পথে দুর্জয় বাধা আসিয়া তাহাদিগকে তাহাদের লক্ষ্য হইতে বহু দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। এই বাধা অতিক্রম করা যাইবে না, ইহা দুর্লঙ্ঘ্য, এই রূপ একটা গোপন চেতনাও তাহাদের অনেককে সর্বদা পীড়িত করিতেছে। আর এই চেতনা হইতেই জন্ম লইয়াছে তাহাদের দুঃখবাদ; কি যেন নাই, কি যেন মরীচিকার মত দূর হইতে আকর্ষণ করিতেছে, অথচ তাহা যেন কোন কালেই উপলব্ধির স্তরে আসিয়া ধরা দিবে না, কোথায় যেন এক অজানা অসম্পূর্ণতা গোপনে জীবনকে অসার করিয়া রাখিয়াছে, পৃথিবীর অনন্ত ঐশ্বর্যকে ভোগ করার কোন সুযোগই যেন কোন কালেই আর আসিবে না, জীবনের মূল্য যেন অস্বীকৃত,—এই চেতনা তাঁহার পাত্রপাত্রীকে নিজের সম্পর্কে এবং প্রতিকূল পরিবেশ সম্পর্কে সজ্ঞান করিয়া তুলিতেছে।

কিন্তু এই চেতনা তাহাদিগকে কখনও অবসন্ন করিতে পারে নাই। তাহাদের অন্তর্গূঢ় মুক্তি-চেতনা এবং সীমাহীন প্রাণ-প্রাচুর্য তাহাদিগকে এই প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত করিয়াছে, এবং প্রতিবেশের বুকে অম্লান স্বাক্ষর স্থাপন করিয়া নিজেকে প্রকাশ করার প্রেরণায় উত্তেজিত করিয়াছে। উপন্যাসে এই সংগ্রাম ব্যক্তি বনাম প্রচলিত সামাজিক ধর্ম ও বাধা নিষেধের সংগ্রামে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য এক্ষেত্রে শিল্পীর অন্তর্নিহিত সংরক্ষণশীলতা প্রচলিত সমাজ ধর্মকে নির্দোষ এবং পবিত্র বলিয়া চিত্রিত করায় ব্যক্তির সংগ্রাম যথার্থ মর্যাদা লাভ করে নাই; এবং নীতি-বিরুদ্ধ আচরণ রূপেই তাহা অঙ্কিত হইয়াছে (যথা, কুন্দ-নগেন্দ্র, রোহিণী-গোবিন্দলাল, প্রতাপ-শৈবলিনী সম্পর্ক)। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কুন্দর অব্যক্ত আকৃতি, রোহিণীর অবিচল সংকল্প এবং প্রতাপের অকলঙ্ক আত্মত্যাগের মধ্যে একটা নূতন আবেগ, নিগূঢ় আত্মঘোষণার সুরই ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে। রোমান্সের ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম শাসকের বিরুদ্ধে শাসিতের, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের, বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে স্বদেশ প্রেমিকের, সংগ্রামে পরিণত

হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অস্পষ্ট ইতিহাস চেতনা পূর্বাহ্নেই এই সংগ্রামের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল; তাই অতীতকে সৃষ্টি করার এবং বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করার প্রেরণা পরিণামে দুঃখভরা বর্তমানের স্বীকৃতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এই স্বীকৃতির মধ্যেও সংগ্রামশীল দেশপ্রেমিক বীরের বীরত্ব এবং মনুষ্যত্ব খর্ব অথবা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অসীম প্রাণশক্তির জোরে সত্যানন্দ এবং তাহার সহকর্মীরা পরিবেশকে জয় করিয়াছিল, এবং বাস্তবের বুকে নিজস্ব অধ্যাসকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং অজেয় শক্তিকে স্বীকার করিয়া তাহাদের প্রতিষ্ঠা বিসর্জন করিতে হইয়াছে। তথাপি তাহারা ক্ষুদ্র নয়, প্রতিকূল এবং প্রবল শক্তিমান প্রতিবেশের বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রামটাই গৌরবের।

উপন্যাসের ক্ষেত্রেই হউক, অথবা রোমান্সের ক্ষেত্রেই হউক, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকে তাহার এই সংগ্রামশীল মহিমায় আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পরাভবকে যেমন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তেমনি তাহার শক্তিকেও অনুভব করিয়াছিলেন। যাহার চাওয়ার ও পাওয়ার ক্ষমতা আছে, তাহাকে আবার হারানোর জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হয়; কিন্তু এই পরাজয়ের মুখে সে আত্মগ্লানি, অপরাধ অথবা অক্ষমতার জন্য শোক বা বিলাপ করিতে বসে না, অথবা বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়ে না। তাহার পরাজয় চেতনা এই অনুভূতি হইতেই জন্ম নেয় যে যাহার নিকট তাহার পরাজয় তাহাকে জয় করা তাহার ক্ষমতার অতীত; সুতরাং তাহার পরভাবের জন্য সে নিজে দায়ী নয়। সংগ্রামের মধ্যেই সে শক্তিমান। কাহিনীর পরিণাম-ফল নিরপেক্ষভাবে বঙ্কিম-সাহিত্য মানুষের এই শক্তিরই ব্যঞ্জনা। পূর্বে বঙ্কিমসাহিত্যে মানুষের জীবনলালসার কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহার একান্ত আনুষঙ্গিক গুণ রূপেই তাহাদের মধ্যে অপূর্ব কর্মচেতনা ও কর্মপ্রিয়তা রূপ পাইয়াছে। তাহাদের কর্ম-মোহ জীবনমোহের মতই বলিষ্ঠ ও সৃষ্টিধর্মী।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, রোমান্স কাব্যধর্মী; অর্থাৎ ইহা বহুলাংশে শিল্পীমনের একক উৎস হইতে রস আহরণ করে। সেজন্যই কবিতার ভিতর দিয়া যেমন সহজে কবি মনকে আবিষ্কার করা যায়, রোমান্সের মধ্যেও তেমনি সহজে শিল্পী মনের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সের মধ্যেও, রোমান্সের পাত্র পাত্রীর সংগ্রাম, আত্মোপলব্ধির প্রেরণা, সৃজন প্রয়াসী মনের সীমাহীন আকুতির মধ্যে আমরা বঙ্কিম-মানসেরই

আকৃতি অনুভব করিতে পারি। আবার তাঁহার সামাজিক উপন্যাসসমূহও বহুলাংশে কাব্যধর্মী। ফলে, উপন্যাসের বিষয়গত পরিবেশে আমরা তাঁহার শিল্পীমনের আত্মগত পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হই। শিল্পী ব্যক্তিগতভাবে যে জীবন-চেতনা, যে আত্মস্ফূর্তির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং ব্যবহারিক জীবনের অনাত্মীয় প্রতিবেশকে জয় করার অভিযান চালাইয়াছেন, সেই চেতনা এবং প্রেরণাই তাঁহার উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের ভিতর দিয়া অনায়াস অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

উপন্যাসের প্রত্যক্ষ নায়কনায়িকার মধ্যে শিল্পীর আত্ম-চেতনার স্বাক্ষর পাওয়া কঠিন নয়। কারণ, তাহাদের মধ্যে শুধু যে একটা রূপগত মিল ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় তাহা নয়; তাহাদের ভাব-ও উপলব্ধিগত ঐক্য আরও বেশী লক্ষ্যণীয়। সেজন্যই একথা বলা যায়, সামগ্রিকভাবে বঙ্কিম-সাহিত্য যেন একান্তই বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মকথা; শুধু কমলাকান্ত নয়, বীরেন্দ্রসিংহ, আয়েষা, তিলোত্তমা, হেমচন্দ্র-মৃণালিনী, রজনী, প্রতাপ, সত্যানন্দ জীবানন্দ শান্তি, প্রফুল্ল, রাজসিংহ, মাণিকলাল, এমন কি কুন্দ, অমরনাথ প্রভৃতির ভিতর দিয়াও যেন বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকেই প্রকাশ করিয়াছেন। যেসব স্বতন্ত্র, বিভিন্ন অণুপরমাণু অর্থাৎ মানুষ লইয়া সমাজ গঠিত, তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের দৃষ্টিমার্গ হইতে যেন এই সাহিত্য গড়িয়া ওঠে নাই, বিভিন্ন চরিত্রের এবং অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শিল্পী যেন নিজেকেই ঘোষণা করিয়াছেন। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তিনি যেন নিজের অন্তর বেদনাকেই রূপ দিয়াছেন। অর্থাৎ বিশেষ এখানে নির্বিশেষে, ব্যক্তি জাতি রূপে (type) পরিণত হইয়াছে।

অন্যের মধ্যে, সমাজ-মানুষের মধ্যে নিজের ধারণা-কল্পনা, ও জীবন-চেতনার এই প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া, এবং সমাজ মানুষের মাধ্যমে এই চেতনাকে অভিব্যক্তি দান করার একটা আশ্চর্য ফল এই হইয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমবেদনা ও সহানুভূতির পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে; তাহা আত্মগত পরিধির সীমা অতিক্রম করিয়া নিজের বাহিরে প্রসারিত হইয়াছে। এই বিস্তৃতির গুরুত্ব কোথায় এবং কেন, সমকালীন মানস-সংকটের বিশেষ একটা দিক সম্পর্কে সামান্য আলোচনাতেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। রামমোহনের যুগে যে ব্যক্তিত্বের জাগরণ এবং মধুসূদনে যাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি, তাহা যে স্বাতন্ত্র্য-ধর্মী ছিল তা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এই ব্যক্তিমন আর কাহারো মত নয়, কাহারো সহিত ইহার কোন মিল নাই। এই চেতনা হইতে স্বভাবতই একটা

আত্মগর্ব অথবা অভিমান আত্মপ্রকাশ করে। তাহাতে শক্তি যেমন আছে, তেমনি দুর্বলতাও আছে। ইহার দুর্বলতা এইখানেই যে, ব্যক্তি-মন অন্যের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলে, অন্যের মধ্যে তাহার জীবন অভিযানের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাইয়া সঙ্কুচিত হয়। ফলে, আদর্শগত মূল্যমানেও বিকৃতি আসে। ব্যক্তিত্ববোধের প্রথম জাগরণের দিনে ইহার মধ্যে যে একটা সর্বাঙ্গীণতা ছিল, সামাজিক কল্যাণবোধ ছিল, বৃহত্তর স্বার্থবোধ ছিল, তাহা ক্রমেই সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতে থাকে। শ্রেণীহিসাবে হইলেও সামগ্রিক কল্যাণবোধ ব্যক্তিগত স্বার্থবোধে, মানব-ধর্ম আত্ম-ধর্মের রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। এমনি একটা ব্যবহারিক স্বার্থবোধ যে সেযুগে রীতিমত প্রাধান্য লাভ করিতেছিল, তাহার স্বাক্ষর সমকালীন সাহিত্য ও চিন্তাধারায় রহিয়াছে। রামদাস সেন নামক বহরমপুরের জনৈক কবি সে যুগের সমাজসেবী বাঙ্গালী আত্মাভিমানীকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,

"পীযুষ বর্ষণ মুখে হৃদে ক্ষুরধার
মরি কি বঙ্গের স্থত চরিত্র তোমার॥" (৬৫)

বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার 'লোকরহস্য'-এ অতি নিষ্করুণভাবে সেযুগের "বাবু"র স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান প্রণালী এবং অপূর্ব দূরদৃষ্টির সাহায্যে আদর্শ মানবধর্মের এই ফলিত রূপ অর্থাৎ ব্যক্তিধর্মের সঙ্কীর্ণতা এবং ইহার মানসিক ব্যাধির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেজন্যই নির্ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই প্রতিবাদের ভিতর দিয়াই তাঁহার শ্রেয়বোধ এবং প্রীতি আত্মাকে ছাড়াইয়া পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। বঙ্গদর্শন সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছিলেন, বঙ্গদর্শন "যদি কোন প্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।" (৬৬) এই প্রবন্ধে, 'সাম্য'-এ এবং বিশেষ করিয়া কমলাকান্তের 'বিড়াল'-এ তিনি যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার বিষয়গত বিপ্লবাত্মক সংকেতের কথা চিন্তা করিয়া আজ পর্যন্তও আমরা বিস্ময় বোধ করি। এমন কি, শেষ জীবনে যখন তিনি বিমূর্ত তত্ত্ব লইয়া নিমগ্ন

(৬৫) সেকাল আর একাল ; রাজনারায়ণ বসু, পৃ ৬৮

(৬৬) বঙ্গদেশের কৃষক ; বিবিধ প্রবন্ধ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ২৪২

ছিলেন, তখনও তাঁহার সার্বিক শ্রেয়বোধ এবং প্রীতির সর্বগামিতা অক্ষুণ্ণ ছিল; অবশ্য তাহা ব্যবহারিক পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সামগ্রিক কল্যাণ, ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ অপেক্ষা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শ হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার সমকালে রাজা দিগম্বর মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতিরা যখন গণশিক্ষার প্রচলন হওয়া উচিত কি উচিত নয়, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয়ান্বিত ছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন, "ছয় কোটি ষাট লক্ষের ক্রন্দন-ধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে, বাঙ্গালার লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।" (৬৭) শুধু শিক্ষা বা বাস্তব সুখদুঃখের পরিমণ্ডলেই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে, জীবনাচরণের বিশিষ্ট ভঙ্গীর মধ্যে কোথায়ও যাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব খণ্ডিত না হয়, যাহাতে পূর্ণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোন বাধা তাহার পথরোধ করিয়া না দাঁড়ায়, এমনি একটা সংবেদনশীল চিন্তা তাঁহাকে প্রতিনিয়ত ক্ষুব্ধ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেজন্যই তাঁহার সমকালীন মানুষকে জানা, তাহাকে তাহার বাস্তব জীবন- সংগ্রামের মধ্যে দেখিতে পাওয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। ভবিষ্যতের প্রতি এবং মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি আস্থা না থাকিলে সংস্কারের এবং আত্মোপলব্ধির সংগ্রামের প্রেরণা দেখা দিতে পারে না। এই চেতনাই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের মূলে।

এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মুক্তি-পপাসাকেই সমকালীন মানুষের গোচরীভূত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তৎকালীন মানুষের অনুভূতিকে জাগাইয়া, তাহার বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করিয়া, তাহার জড়তা ও আচ্ছন্নতাকে নির্মমভাবে আঘাত করিয়া তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন। সমাজের গতিধারা, অতীত-বর্তমান ঃ বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্পর্ককে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসূত্র দ্বারা আবিষ্কার করিতে এবং নির্ধারণ করিতে না পারিলেও অস্পষ্টভাবে, সম্ভবত অবচেতন মনে, তিনি এই প্রবহমান ধারার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই ধারার মধ্যে সমাজ-মানুষ হিসাবে তাঁহার ব্যক্তিগত দায়িত্ব কি, তাহাও তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। উপলব্ধি হইতে আসিয়াছে তাঁহার কর্মজ্ঞান। আর শিল্প-কর্ম, প্রচলিত সমাজধর্মের সমালোচনা এবং ভবিষ্যৎকে নিজস্ব ভাবাদর্শ, ভাবনা-কল্পনা দ্বারা রূপায়ণ করার

(৬৭) লোক শিক্ষা; বিবিধ প্রবন্ধ

কর্মের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার মুক্তি প্রেরণাকেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই কর্ম না করিয়া তাঁহার উপায় ছিল না। কেন না, জাতীয় জীবন প্রবাহের এক সংকট-কালে ইতিহাসের গতি-ধারার মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আপন কর্মকে অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন; ইতিহাসের প্রবাহের সহিত তাঁহার নিজস্ব কর্ম সংযোজিত না হইলে ইতিহাসের গতি নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হইবে না, এই চেতনা তাঁহাকে উদ্বেল করিয়াছে। সুতরাং তাঁহার কর্মও তাঁহার মুক্তি প্রেরণার এক স্বচ্ছ প্রকাশ।

এই মুক্তির অনুপ্রাণনা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা এবং সাহিত্য রীতিতেও ছন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পীর প্রকাশভঙ্গী এক জটিল মিশ্রপদার্থ; তাহা যতখানি শিল্পীর আপনার ব্যক্তিগত, ঠিক ততখানিই তাহা সমাজগত। কেন না, যে মন ও মানস ভাষাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশলাভ করিয়াছে, তাহা সমাজের জটিল আবর্তের রস আস্বাদন করিয়া নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছে, এবং পক্ষান্তরে, সেই পরিবেশকে পুনর্বার সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। শিল্পীর এই কর্মের বৈশিষ্ট্য ও গৌরব লইয়াই তাঁহার ভাষা ও সাহিত্য-রীতির ব্যঞ্জনা। সুতরাং শিল্পীকে বিশেষ এক ঐতিহ্যের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াও সেই ঐতিহ্যকে নূতন ছাদে, নূতন সুরে পুনরায় সৃষ্টি করিতে দেখি।

ইতিপূর্বে দুর্গেশনন্দিনীর আলোচনায় প্রচলিত দুইটি বিরোধী সাহিত্যরীতি অর্থাৎ বিদ্যাসাগরী ও আলালী রীতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইয়াছে এবং সে সময়ে আদর্শ সাহিত্যরীতি কি হইতে পারিত তাহাও তাঁহার মতামত হইতে বিশ্লেষিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই রীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন, এবং এই সমন্বয়ই তাঁহার মতে আদর্শ বাংলা। রোমান্স এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ভাবসত্তার দিক হইতে যাহা করিতে-ছিলেন, ভাষা সংস্কারের মাধ্যমেও তিনি তাহাই অর্থাৎ তাঁহার সমকালীন মানুষকেই নবতরভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভাষা বিবর্তনের মধ্যেও রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় একটা ক্রমবিকাশমান স্ফূর্তি, গতিবেগ এবং কার্যকুশলতা দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দচয়ন, শব্দার্থের বিশিষ্ট প্রয়োগ, বিভিন্ন শব্দ সমন্বয়ের ভিতর দিয়া ভাবচিত্রের সমাবেশে নূতন জীবন-চেতনা, নূতন রূপ-রস-গন্ধের আস্বাদ প্রাণ পাইয়াছিল। তাঁহার সমন্বয়ে এই রূপান্তর কিরূপ পরিপূর্ণতা অর্জন করিয়াছিল তাহা তাঁহার অব্যবহিত পূর্বগামী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার সহিত তুলনা করিলেই প্রতিভাত হইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য,

প্যারিচাঁদ মিত্রের বিদ্রোহ বাংলা গদ্যসাহিত্যের স্বাভাবিক প্রবাহের মধ্যে এক অভাবনীয় ও বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া মাত্র। সুতরাং তাঁহার গদ্যরীতিকে সাধারণ বিবর্তন ধারার পরিমাপক বলিয়া গণ্য করা যায় না।

বিদ্যাসাগরের গদ্য ঃ "সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ, দেখুন দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্য প্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি, হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে, এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিনীতীরবর্ত্তী তপোবন ; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন।"

(সীতার বনবাস)

বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য ঃ "রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুনগুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে ; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা।" (কৃষ্ণকান্তের উইল)

এই দুইটি পরিচ্ছেদের পার্থক্য স্ব-অভিব্যক্ত। বিদ্যাসাগরে একটা রসঘন মাধুর্য রহিয়াছে সত্য, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রে সেই মাধুর্যের সহিত অপূর্ব গতি সংযোজিত হইয়াছে। যে মাধুর্য পূর্বে ছিল আত্মসমাহিত, তাহা এখন দিকে দিকে সঞ্চারিত হইতে চলিয়াছে। এই চলমানতাই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য রীতির প্রাণ। যে নূতন জীবন চেতনায় সমকালীন মানুষ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, যে মুক্তি পিপাসা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, জীবনের প্রতি যে একটা অপরিমিত মোহ তাহাকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই চেতনা এবং উপলব্ধি, সেই গতি ও প্রাণময়তাই শব্দনির্বাচন এবং সাহিত্য রীতির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে। এখানে তাই পরিচিত শব্দও অপরিচিত অর্থে ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত। জানা এখানে অজানার মাধুর্য ধারণ করিয়াছে ; অর্থাৎ নূতন চোখ লইয়া মানুষ

জীবনকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছে, নূতন সঙ্গীতে, নূতন ভঙ্গীতে। সুতরাং সাহিত্যের ভাষাও নবতর এবং অতিরিক্ত গতিসম্পন্ন না হইয়া পারে না।

সংস্কৃতানুগামী ভাষার উপযোগিতা যতখানি ছিল শুধুমাত্র চর্চায়, ব্যবহারে ততখানি ছিল না। পাঠাগারের নির্জন বিদগ্ধ আবহাওয়ায় তাহার অনুশীলন করা চলে, কিন্তু বাইরের প্রশস্ত রাজপথে তাহা সঞ্চারিত করার প্রস্তাবে সংস্কৃতাভিমানী কখনও সম্মত হইতেন না। বিদ্যাসাগর হইতেই সংস্কৃতাভিমানীর এই নিরঙ্কুশ একচেটিয়া অধিকারে হাত পড়ে, আর বঙ্কিমচন্দ্রে তাহার এই অধিকার চিরকালের জন্যই খর্ব হইয়া যায়। মধ্যযুগের সাধক কবীর যখন কাশীতে চলতি ভাষায় প্রচলিত ধর্মগত ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করিতেছিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে চলতি ভাষা ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে কবীর বলেন, "সংস্কৃত হৈ কূপজল ভাষা বহতা নীর।" (সংস্কৃত হইল কূপের জল, ভাষা প্রবাহিত স্রোত ধারা) বাংলাগদ্যের প্রথম যুগে ভাষা সংস্কৃতানুগামী ছিল বলিয়া তাহাতে গতি ছিল না। বিদ্যাসাগরের সংস্কারের পর বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া ভাষা নদীধারার ন্যায় বহিতে আরম্ভ করে। যাহা ছিল শুধুমাত্র চর্চার সামগ্রী, তাহা পূর্ণ ব্যবহারিক উপযোগিতা লইয়া আবির্ভূত হয়। তাহা আত্মাকে ছড়াইয়া বাহির বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছে ; তাহা সামাজিক লেন দেন, এবং ভাবের আদানপ্রদান ও শিক্ষার অমূল্য উপকরণে পরিণত হয়। সমকালীন জীবন বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার ভাষাও তাহার উপযুক্ত বাহনরূপে সর্ববিধ উপযোগিতার গুণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ, যথার্থই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার সহিত "নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন" করিয়াছিলেন। ভাবের সহিত ভাষার এই মিলন এতই গভীর এবং ব্যাপক হইয়াছে যে, মায়াকে কায়া হইতে অথবা রূপকে রস হইতে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন। এইখানেই শিল্পীর চরম অভিব্যক্তি এবং সার্থকতা।

আবার ইহাও স্মরণযোগ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরীতি ত্রুটিশূন্য নয়। ইহার দুই একটি দুর্বলতা অনায়াসেই পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা অনেক সময়েই অকারণ উচ্ছ্বাসে নাচিয়া ওঠে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার পাত্র পাত্রী বিশেষ ঘটনায় বা বিশেষ ভাবের স্পর্শে অস্বাভাবিকভাবে সাড়া দেয়। অর্থাৎ, তাহাদের মানস-প্রতিক্রিয়া উপস্থিত গরজের সহিত সমতা রাখিতে পারে না। "দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতে লাগিল," "ভাই এমন দিন কি হইবে

তুচ্ছ বাঙ্গালি হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীরপাত করিব?"(আনন্দমঠ) "হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডাষ্ট্রীয়ল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়।"(সীতারাম), ইত্যাদি লাইন এবং বিশেষ করিয়া 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর কোন কোন অংশ স্পষ্টতই উপস্থিত প্রসঙ্গের প্রেরণা অপেক্ষা অতিশয় ভাব-বর্ণে রঞ্জিত। তাই মনে হয়, ভাবের আতিশয্যে ঐসব অংশ যেন দুর্বল; যেন আত্মশক্তির অস্বাভাবিক চেতনায় তাহা চপল। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যথায় ঋজু এবং শক্তিমান গদ্য-রীতির মধ্যে এইগুলিকে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কিন্তু এই দুর্বলতার কারণ কি, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবত কঠিন নয়। প্রারম্ভেই আলোচিত হইয়াছে যে, যাঁহারা নব-ভারতের নব সংস্কৃতির প্রবর্তক, তাঁহাদের অস্থিমজ্জা দেশীয় জলবায়ুতে গঠিত হয় নাই, এবং তাঁহাদের মানস-প্রকরণের সহিতও দেশীয় সমাজ-মানসের সঙ্গতির অভাব ছিল। সম্ভবত তাঁহাদের এই অস্বাভাবিক মানস সংগঠনও এই দুর্বলতার জন্য দায়ী হইতে পারে। তবে, এই দুর্বলতার ভিতর দিয়া সমকালীন জীবনাচরণের বিবিধ অসঙ্গতি এবং চিন্তাধারার বৈষম্যই নূতনভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

স্বদেশধর্ম

এক

বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন মানুষকে সম্মুখে রাখিয়াই শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার জীবনাচরণের বিভিন্ন অসঙ্গতি সম্পর্কে তাঁহার বিদ্রূপ, চলতি রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও সামাজিক রীতিনীতির উপর তাঁহার আক্রমণও এই মানুষের কল্যাণের জন্য। এই সমালোচনার ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার কালের মানুষকে জীবন সম্পর্কে একটা নিশ্চিত সমাধানে পৌঁছানোর পথ দেখাইতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকর্মের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, শিল্পীর মনস্তত্ত্ব বহুবিধ প্রবাহকে আত্মসাৎ করিয়াই গড়িয়া উঠে। এক্ষেত্রেও তাঁহার রাজনৈতিক ভাবধারা ও কর্মাদর্শ, ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং প্রয়োগ ফল আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার রাজনৈতিক কর্মধারা ও স্বদেশধর্ম সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতা উভয়েরই পরিচায়ক। ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় পাদের পূর্বেই দেশে জাতীয় মনোভাবের ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল, এবং এই মনোভাবকে একটা সুসংগঠিত রূপদানের চেষ্টাও হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, ভার্ণাকুলার প্রেস আইন বিরোধী আন্দোলন, চৈত্রমেলার সংগঠন, এবং আন্দোলনকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের শক্তির এবং ক্রমবর্ধমান আত্মচেতনার পরিচয় দিয়াছে। আবার, পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজ-প্রবাহের গতি নিরূপণ করিতে না পারা, এবং প্রচলিত ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের শেষ আকর্ষণটুকু ছিন্ন করিতে না পারার মধ্যে সমকালীন রাজনৈতিক ভাবধারার দুর্বলতাও পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ব্যর্থতার ফলে সে যুগের চিন্তানায়কগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চিত্ত-বিভ্রমই সামাজিক ও রাজনৈতিক অকল্যাণের মূলে। তাই, সেযুগে দেশের জনশক্তির উদ্বোধনের চেষ্টার পরিবর্তে বিদেশী শাসকের দরবারে দরখাস্ত

প্রেরণের এত বহর ছিল। আশা ছিল, বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী শেষপর্যন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভিমান খণ্ডন করিয়া তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নানাভাবে এবং নানা দিক হইতে তাঁহার কালকে অতিক্রম করিতে পারিলেও তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারার মৌলিক রূপ কালের পূর্বোক্ত বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ অনুসরণ করিয়া দেশী বিদেশী শাসক ও শোষকের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন, তাঁহার রাষ্ট্রীয় চিন্তা সমকালীন চিন্তাধারার তুলনায় আশ্চর্যরকম বলিষ্ঠ ছিল; রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবেদন-নিবেদনের শোচনীয় ব্যর্থতার কথা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তিনিই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কর্মনীতির অনুদার সঙ্কীর্ণতা বুঝিতে পারিয়া বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, এবং জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণকে রাজনৈতিক কর্মের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার সার্থকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিগূঢ় অন্তদৃষ্টি, তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র-কন্যার অপূর্ব আত্মত্যাগ, পৌরুষ, পরার্থপ্রিয়তা এবং সংগ্রামকুশলতার মধ্যে তাঁহার শক্তি ও সংকল্পের দৃঢ়তার স্বাক্ষর রহিয়াছে। এই দূরদৃষ্টি ও আত্মত্যাগের পরোক্ষ ফল তাঁহার কালকে অতিক্রম করিয়া কালান্তরের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু, পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, তিনি চোখের দৃষ্টিকে মনের আচ্ছন্নতা দ্বারা খর্ব করিয়াছিলেন, আর এখানেই তাঁহার চরম দুর্বলতা। সেজন্য, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ আশ্রয় করিয়া তিনি যেখানে বাংলা দেশের কৃষকের জীবন পর্যালোচনা করিয়া তাহার শোচনীয়তা ও সীমাহীন হাহাকারে কাঁদিয়া উঠিয়াছেন, সেইখানেই, সেই প্রবন্ধেই, তাঁহাকে যুক্তিবাদের লাগাম টানিয়া ধরিতে হইয়াছে। এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইয়াছে যে, চিত্ত-বিভ্রমই সামাজিক সমস্যা ও দুর্নীতির মূলে। লিখিতে হইয়াছে, "আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারত মণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। যেদিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব।"(৬৮) এবং এই একই প্রবন্ধে তাঁহাকে জমিদারগোষ্ঠী সম্পর্কেও

(৬৮) বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ পৃঃ ২৭৩

প্রয়োজনমত সাধুবচন উচ্চারণ করিতে হইয়াছে। অপরপক্ষে, সরকারী কর্মচারী হিসাবেই হউক, অথবা রামমোহন রায়ের আমল হইতে পাওয়া বৃটিশ শাসনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবশেই হউক, অথবা বৃটিশ শাসনের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বংশানুক্রমিক আত্মীয়তার বন্ধন হইতেই হউক, বঙ্কিমচন্দ্রকে শাসক-গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের প্রতি সামান্য দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে। ১৮৭২ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তিনি শম্ভুচন্দ্র মুখার্জিকে এক পত্রে লেখেন, I won't take up politics, because then I would be sure to rouse the indignation of Anglo-Saxonian against 'Mookherjee.' That is why Bangadarsan has so little of politics in it." (৬৯) এই সঙ্কোচ তাঁহার পূর্বাপর বর্তমান ছিল। আনন্দমঠের আলোচনায় তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিজেকে রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করার ব্যবহারিক অসুবিধা অবশ্য ছিলই ; কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবধারা হইতে এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, পূর্বকালের কোম্পানীরাজ-নির্ভর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহিত বৃটিশ কর্তৃপক্ষের আত্মীয়বন্ধনের শেষ গ্রন্থিটি তখনও ছিন্ন হয় নাই। তবে গ্রন্থিসূত্র যে দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল, তাহা অনস্বীকার্য। আর ইহাও অনস্বীকার্য যে, এই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর-হইতে-থাকা সূত্রটি অবলম্বন করিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন পর্যন্তও সুখস্বপ্ন রচনা করিতেছিল। ইংরেজের শক্তিমত্তা এবং ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধাই সম্ভবত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে একদিকে একটা পরাভব-চেতনায়, এবং অপরদিকে, ইংরেজের আশ্রয়ে থাকিয়া সামাজিক কল্যাণ-লাভের আশায় উদ্দীপ্ত করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলিতে এই অনুভূতি ও পশ্চাৎ-আকর্ষণ একটা অস্পষ্ট ঐতিহাসিক চেতনার রূপ লইয়া দেখা দেয়। এই চেতনার রূপ,—সমাজ-বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে বৃটিশ শক্তি অজেয়, তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করিতেই হইবে, আর এই স্বীকৃতির মধ্যেই কল্যাণ। এই মনোভাব, বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার রাজনৈতিক কর্মাদর্শের পরিধি সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য

(৬৯) Bengal Past and Present, 1914, April-June, P. 279. পরবর্তী জীবনের আরও একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখযোগ্য। ঝাঁসির রাণী সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছা হয় একবার সে চরিত্র চিত্র করি কিন্তু এক আনন্দমঠেই সাহেবেরা চটিয়াছে তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।" বঙ্কিম-প্রসঙ্গ; সুরেশ সমাজপতি সঙ্কলিত ; পৃ ১৯৭

করিয়াছে। 'বঙ্গদেশের কৃষক' হইতে উপরে যে উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্যও ইহাই। শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রত্যক্ষ কর্মের আসর হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেন, তখন তিনি এই পরাভবকেই একটা লোকোত্তর মহিমায় রূপায়িত করিতে চেষ্টা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিতেছেন, "মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহি, ইংরেজের হইয়া লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেন না, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইংরেজের অধীনে ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভুভক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে হিন্দু দুর্ব্বল বলিয়া কৃত্রিম প্রভুভক্ত।"(৭০) স্পষ্টই বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র অতি-প্রাকৃত শ্রেষ্ঠতার সাহায্যে অস্বীকৃত বর্তমানের ক্ষতি-পূরণের চেষ্টা করিতেছেন। তাহা ছাড়াও, বৃটিশ শাসনের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এবং সমকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আকর্ষণ যে নিঃশেষে অবলুপ্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণও এখানে পাওয়া যাইতেছে।

চোখের দৃষ্টিকে খর্ব করার ফলেই পরিণামে তিনি স্বদেশধর্মের বিমূর্ত তত্ত্বে উপস্থিত হন। তত্ত্ব যখন শুধুমাত্রই তত্ত্ব, তখন তাহার মূল্য নিতান্তই কম। কিন্তু তত্ত্ব যখন ব্যবহারিক সত্যের মর্যাদা লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহার পূর্ণ সার্থকতা, তাহার যথার্থ উপযোগিতা। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশধর্মের চিন্তায় ও ব্যবহারিক কর্মের মধ্যে সঙ্গতির অভাব আছে বলিয়া মনে হয়। এখানে তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক কার্যকারিতার মধ্যে পারস্পরিক অমিল দেখা যায়। সামান্য কয়েকটি উক্তির সাহায্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ প্রীতির তাত্ত্বিক চিত্র দেওয়া যাইতে পারে। 'ধর্ম্ম তত্ত্ব'-এর চতুর্বিংশ অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, "সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্ম্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজ ধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্ম্ম ধ্বংস।...... যদি তাহাই হইল, যদি সমাজ ধ্বংসে ধর্ম্মধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস তবে, সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। এইজন্য Herbert Spencer বলিয়াছেন, 'The life of the social organism must, as an end, rank above the lives of its units. অর্থাৎ আত্ম-

(৭০) ধর্ম্মতত্ত্ব; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ; পৃ ১১৬

রক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এবং এই জন্যই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন।

"যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সেই কারণেই ইহা স্বজনরক্ষার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

"আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজন রক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, কেন না ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়।

"ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন ; এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বর ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।

"আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।·· ···সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।" (ধর্ম্মতত্ত্ব, উপসংহার) বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র বলিয়াছেন, ঈশ্বরানুবর্তিতাই মনুষ্যত্ব, এবং এই মনুষ্যত্ব অর্জনই মানুষের একমাত্র কাম্য সাধনা। বলা বাহুল্য, তাঁহার স্বাদেশিকতা অথবা দেশপ্রীতি মূলতত্ত্বের দিক হইতে এই বৃহত্তর সাধনারই একটা অপরিহার্য অঙ্গ। অন্যান্য প্রীতির ন্যায় ঈশ্বরপ্রীতিতেই ইহার পরিণতি। কিন্তু তাঁহার ধর্ম-সাধনার চরম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা আত্ম-পর ভেদাভেদ শূন্য ; তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির প্রেরণাও ইহাই। তিনি বলিতেছেন, "জাগতিক প্রীতি এবং সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্যেরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্টসাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও তেমনি ইষ্টসাধন করিব।······পর সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারও আপনার সমাজের অনিষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশ-প্রীতির সামঞ্জস্য।" (ধর্ম্মতত্ত্ব, স্বদেশপ্রীতি)

মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রীতি, জগৎপ্রীতি, আত্মপর ভেদশূন্যতার চেতনা, ইত্যাদি শব্দগুলি পরম (absolute) অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। পরম অর্থে এই প্রীতি দেশাতীত, কালাতীত, সামাজিক সম্পর্ক নিরপেক্ষ শাশ্বত সত্য ; অর্থাৎ, ইহা স্থানকালের উর্দ্ধে। এই অর্থে এই তত্ত্ব অনায়াসে যুগ হইতে যুগান্তরে

পরিভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু যাতায়াতের কোন ক্লান্তি ইহাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, মানুষের কোন কর্মই, তাহা ব্যবহারিক কর্মই হউক অথবা চিন্তাই হউক, হ্রদের জলের মত স্থিতিশীল নয়, নদীর জলের মত গতিশীল। মানুষ তাহার কর্ম ও চিন্তার ভিতর দিয়া নিরন্তর নিজেকে রূপান্তরিত করিয়া চলিয়াছে। তাই, যুগে যুগে অর্থাৎ স্বতন্ত্র সামাজিক পরিবেশের অন্তরে স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও তত্ত্বের আবির্ভাব হয়; আর কাল যখন অনিবার্যরূপে কালান্তরে প্রবেশ করে তখনই সেই চিন্তাধারা ও তত্ত্বেরও রূপান্তর হয়; মানুষের চিন্তার স্বরূপ বদলায়। সুতরাং বিশেষ কোন এক যুগে যে তত্ত্ব সত্যতার দাবী লইয়া আবির্ভূত হয়, সেই তত্ত্বই পরবর্তী যুগে তাহার সত্যতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রখিতে পারে না। কারণ, যে মানুষ তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে, ইতিমধ্যে সেই মানুষেরই রূপান্তর হইয়া গিয়াছে। সম্ভবত, বঙ্কিমচন্দ্র ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তত্ত্ব কালবিধৃত ও পরিবর্তনশীল, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে কোন তত্ত্বই পরম নয়, আপেক্ষিক। উদাহরণ স্বরূপ, পরম মানবিক তত্ত্বের দিক হইতে জীব হত্যা পাপ, অথবা গুরুতর সামাজিক অপরাধ। কিন্তু এই তত্ত্ব কি সর্বদা প্রযোজ্য? মনে করা যাক, বনের হিংস্র জীবজন্তুগুলি একদিন সংঘবদ্ধ হইয়া মানুষের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যদি মানুষ এই জীবগুলিকে হত্যা করে, তাহা হইলে ইহা কি পাপ বলিয়া বিবেচিত হইবে? কোন সামাজিক মানুষকেও আক্রমণকারীর ভূমিকায় স্থাপন করিয়া এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। এই প্রশ্নের একটি মাত্রই উত্তর আছে, এবং তাহা নেতিবাচক। ইহা স্বীকার করিলে তত্ত্বের পরম সত্তা আর থাকে না; ইহাকে খণ্ডিত অর্থাৎ আপেক্ষিক অর্থেই গ্রহণ করিতে হয়। ব্যক্তিক জীবনে যাহা সত্য, বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় জীবনে যেখানে একটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের ধ্বংস ও অবলুপ্তির উপর আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, অথবা সামাজিক ক্ষেত্রে যেখানে শ্রণীবিশেষ অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীর নিশ্চিত ধ্বংসের উপর আপন সমৃদ্ধির বনিয়াদ রচনা করিতেছে. সেখানেও, আত্মরক্ষার জন্য. অত্যাচারকে চিরকালের জন্য নির্মূল করার জন্য অত্যাচারীকে অত্যাচার করার, শোষণকারীকে ফিরিয়া শোষণ করার অধিকার সমভাবে স্বীকার্য। সুতরাং কোন ক্ষেত্রেই কোন তত্ত্বকে পরম অর্থে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু এই যুক্তি বর্জন করিয়া যদি আত্মপর

ভেদশূন্যতার পরম চেতনায় বশীভূত হওয়া যায়, এবং মৃত্যুর প্রতিরোধে অগ্রসর না হওয়া যায়, তাহা হইলে অম্লান আনন্দে মৃত্যু বা ধ্বংসকেই বরণ করিতে হয়। ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী শাসক ও শোষক এবং দেশীয় শোষিতের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা চলে না, সামাজিক অত্যাচারকেও আত্মার বিশুদ্ধতার দোহাই দিয়া উপেক্ষা করিতে হয়, আর নিজের অদৃষ্টকে দোষারোপ করিয়া দুঃখ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কেননা, যে অত্যাচার করিতেছে এবং যে অত্যাচারিত হইতেছে, পরমাত্মার প্রতিবিম্বিত স্বরূপ হিসাবে, তাহারা এক, অভিন্ন। সুতরাং, কে কাহাকে প্রতিরোধ করিবে? 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে বলিতেছেন, "যার ধর্ম্ম নিষ্কাম, সে কার মঙ্গল খুঁজিলাম, তত্ত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।" (সা, প, সং; পৃ ১১৩) এই পরম সত্য অনুসরণ করিলে অনিবার্যরূপে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, শোষণ ও অত্যাচারে শোষণকারীর ও অত্যাচারীর অধিকার রহিয়াছে এবং তাহাদের শোষণকার্যে বাধা দেওয়া অন্যায়; কেন না, অত্যাচারে এবং শোষণেই তাহাদের স্বার্থসিদ্ধি, তাহাদের মঙ্গল, আর মঙ্গলই তো একমাত্র কাম্য। আর এই সত্যের অনুরোধে এমন কার্যক্রমও গৃহীত হইতে পারে যাহাতে অত্যাচার ও শোষণ স্থায়ী প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। যেমন, "বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। সেদিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব।" ইত্যাদি। ফলে, যে ব্যবস্থাকে অন্যায়, নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া জানি, তাহাকে রদ বা প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তাও আর থাকে না। পরাধীনতাও পরাধীনতা থাকে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চিন্তাধারার ঊর্ধ্বগামিতা সম্পর্কে নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি বলিতেছেন, "ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে। যে কয়জন বুঝে তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত্র শাসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলন ধর্ম্ম যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশী ভরসা আমি এখন রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে মনস্বীগণ কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হইলে, ইহা দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে। জাতীয় ধর্ম্মের মুখ্যফল অল্প

লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণফল সকলেই পাইতে পারে।" (ধর্ম্মতত্ত্ব—প্রীতি) তাঁহার উক্তি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এই ধর্মাচারণ মার্জিত রুচি, বিদগ্ধ সমাজের পক্ষেই সম্ভব, যাহাদের জীবনে সমস্ত বাস্তব দ্বন্দ্বের নিরসন হইয়াছে অথবা যাহারা প্রত্যক্ষভাবে এই সংগ্রামে লিপ্ত নয়। সম্ভবত এই ধর্মাচরণের অবসর লৌকিকজীবনে অপেক্ষাকৃত কম; কেন না, সেখানে নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করিতে হয়। আর এখানে আত্মপর বৈষম্যের চেতনাও গভীর। যে শাসক অন্যায়ভাবে এখানে অত্যাচারের যন্ত্র নিঃশঙ্কচিত্তে চালাইয়া যাইতেছে, তাহার সহিত শাসিতের একাত্মবোধ অভাবনীয় এবং অসম্ভব। আর এই সমদর্শন বহুক্ষেত্রেই প্রকৃত সমদর্শনের সহায়ক না হইয়া বিশেষ গোষ্ঠীগত অথবা শ্রেণীগত স্বার্থের ধারক ও বাহকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইউরোপে ধনতন্ত্র বিকাশের সময় পুঁজিপতিদের হাতিয়ার রূপে ধর্মের দুর্গতিকে এখানে নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে ধর্ম যে বহুবিধ সামাজিক দুর্নীতি ও অন্যায়ের মূলে তাহাও সবিশেষ স্মরণযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কেও বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন, এবং সে জন্যই প্রচলিত হিন্দু ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন স্বদেশসেবার ক্ষেত্রেও তিনি যে ধর্মের অনুশাসন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহা পরম এবং বিমূর্ত কল্যাণকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে বলিয়াই বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না, এবং দেশের জনসাধারণও তাহা হইতে বহু দূরেই পড়িয়া রহিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারিক রাজনৈতিক আদর্শেও জগৎ-প্রীতির আদর্শের ছাপ অনুপস্থিত। তাঁহার রাষ্ট্রীয় চিন্তা বাংলাদেশের সুখসমৃদ্ধির ও ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলার দাবী এখানে যতখানি স্বীকৃত, ভারতের দাবী ততখানি স্বীকৃত নয়। অথচ রামমোহন রায়ের আমল হইতে যে রাজনৈতিক আদর্শ চলিয়া আসিতেছে, তাহার পূর্ব-পারম্পর্য স্মরণ রাখিলে বঙ্কিম-চন্দ্রের চিন্তায় সর্ব-ভারতীয় কর্মাদর্শের অসম্পূর্ণতাকে একটা অপ্রত্যাশিত ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে হয়। রামমোহন রায়ই প্রথম স্থানিক ও প্রাদেশিক সীমা ছাড়াইয়া বৃহত্তর ভারতীয় আদর্শ স্থাপনে উদ্যোগী হন। শুধু তাহাই নয়, তৎকালীন বিশ্বের গণতান্ত্রিক অভিযানগুলির প্রতি তাঁহার সহানুভূতিশীল মনোভাব, ভারতীয় আন্দোলনের সহিত ঐ সব আন্দোলনের সম্পর্ক আবিষ্কার ইত্যাদি কর্মের মধ্য দিয়া রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং গভীরতার

পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনায় জগৎ-প্রীতির আদর্শ স্বীকৃত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারিক রাজনৈতিক চিন্তায় সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টিকোণের অভাব নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে মনকে পীড়া দেয়। ভারতে ধনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার অনিবার্য ফলরূপে বাংলার স্বার্থ যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িতেছিল, এবং সর্বভারতীয় সমস্যা সমাধানের উপরই বাংলার সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল, সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; অথবা সমকালীন ইংরেজ রাজপুরুষগণ শিক্ষিত বাঙ্গালী "বাবু" এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্পর্কে যে অনুদার নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন, তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবেও এই স্বাজাত্যাভিমান দেখা দিয়া থাকিতে পারে; এবং তৎকালে মনুষ্যত্বের উদার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া যে আত্ম-চেতনা দেখা দিয়াছে, বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের যে চেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার প্রভাবও ত্রুটির জন্য দায়ী হইতে পারে। আসল কথা, ইহার উৎস-কেন্দ্র যাহাই হউক না কেন, ইহাকে চিন্তাধারার দুর্বলতা বলিয়াই বোধ হয়। কেন না, ইহা বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত করিলেও ক্ষেত্র বিশেষে ইহা যে বৃহত্তর স্বার্থবোধের প্রতি অকারণ চোখ বুজিয়াও থাকিবে না, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। পরবর্তী কালে রাষ্ট্রীয় জীবনে এই চিন্তাধারা যে একেবারেই কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই, তাহাও পরিপূর্ণ সত্য নয়।

চোখের দৃষ্টিকে খর্ব করার এক অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইয়াছে যে সমাজ-সংকটের মূল কেন্দ্র সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে। সমস্যাকে তাহার মৌলিক কার্যকারণ-পরম্পরা অর্থাৎ মূল সামাজিক-অর্থনৈতিক বিন্যাস ও তাহার প্রতি-ক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার না করিয়া শুধুমাত্র মানসিক দুর্বলতা, আচ্ছন্নতা এবং চিন্তা-বিভ্রান্তি বলিয়া গণ্য করা হয়। সমাজ সংগঠনে এবং তাহার প্রবাহের মধ্যে কোনরূপ অসঙ্গতি বা আবিলতা নাই, শুধুমাত্র চিত্ত-বিভ্রমের ফলেই মানুষ সমস্ত অশান্তি ও সংকট ডাকিয়া আনিয়াছে, এমনি ভাবধারা জন্মগ্রহণ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নানাদিক হইতে অনিষ্টকর হইলেও ইংরেজরা যখন 'সত্য প্রতিজ্ঞা' করিয়া তাহা প্রবর্তন করিয়াছে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদিগকে ইহা প্রত্যাহার করিতে বলিবেন না; কিন্তু জমিদারবর্গ যদি তাহাদের অসামাজিক আত্মপরায়ণ আচরণ পরিত্যাগ করিয়া সদাচার

অবলম্বন করেন, তাহা হইলে এই চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যেও প্রজাদের নানাবিধ সুখ সুবিধা হইতে পারে। শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুরা ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে যে অনাচারের কলুষ ঢালিয়া দিয়াছেন, চিন্তার বিভ্রান্তিই তাহার মূলে ; সর্বোপরি, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের অদূরদর্শী নীতির ফলে যে সংকট এবং আন্দোলন ডাকিয়া আনিয়াছেন, তাহার মূলেও সেই একই চিন্তা-বিভ্রাট। সুতরাং প্রত্যেকেই যদি স্ব স্ব জীবনে ও চিন্তায় এই বিভ্রান্তি দূর করিতে পারেন, অনাবিল স্বচ্ছ দৃষ্টিতে জীবন ও সমাজকে বিচার করিতে পারেন, তাহা হইলে বর্তমান সামাজিক কাঠামোকে বহাল রাখিয়াও, এবং প্রচলিত ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক অটুট রাখিয়াও সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর সমাজকেও সমস্ত সংকট হইতে মুক্ত করা সম্ভব। অর্থাৎ সমগ্র সমস্যাকে তিনি হৃদয়ের কোণ হইতে দেখিয়াছেন, সামাজিক কোণ হইতে নয়। ফলে, তাহা শুধু মানুষের মনের উপরি ভাগকেই স্পর্শ করিয়াছে, অন্তঃপুরের গভীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

কিন্তু স্বদেশপ্রীতিকে সূক্ষ্ম ধর্মাচরণের রূপ দান করিয়া দেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা তাঁহার ব্যর্থ হইলেও এবং তাঁহার চিন্তাধারায় উপরোক্ত দুর্বলতা থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র যে পরবর্তী-কালের রাজনৈতিক আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তাহা সন্দেহাতীত। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ এবং 'আনন্দমঠ'-এ তিনি দেশের অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের যে মোহময় মায়াময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার অনুপ্রাণনা আমাদের কালেও আমরা অনুভব করিয়াছি। অবশ্য তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দর্শনকে নানাভাবে বিকৃত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে দায়ী করা চলে না। তিনি তাঁহার কালকে এবং তাঁহার সমকালীন সমাজকে সম্মুখে রাখিয়াই চিন্তা করিয়াছিলেন, এবং সেই সমাজেরই নব রূপায়ণের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তার ও কর্মের ভবিষ্যৎ ফল সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান আশা করা অনুচিত এবং অমার্জনীয়।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতার আদর্শ এবং রোমান্সে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে ধর্ম-বৈরিতার প্রশ্ন জড়িত। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে কতখানি বড় করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সামাজিক ধর্ম-সাধনায় জাতিবৈরিতার স্থান কতখানি

ছিল, সে সম্পর্কে বুঝিয়াই হউক অথবা না বুঝিয়াই হউক পরবর্তী কালে বহু বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই বহু আলোচিত প্রসঙ্গও পুনর্বিচার ও পুনরালোচনার দাবী রাখে।

বঙ্কিমচন্দ্র গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সনাতন ধর্মের আবহাওয়ায়ই লালিত হন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন,"গৃহে দেবোপম পিতা, দেবীপ্রতিমা মাতা, জাগ্রত দেবতা রাধাবল্লভ। ভট্টপল্লীর দেশপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা নিয়ত আসিয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেন; প্রসিদ্ধ কথকেরা মধ্যে মধ্যে ভাগবত পাঠ করিতেন। পূজার দালানে হোম, চণ্ডীপাঠ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন; উঠানে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা; দুর্গোৎসব, রথ, রাস প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ; ক্ষুদ্র পল্লীর গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, মন্দিরে মন্দিরে স্তোত্রপাঠ।"(৭১) বাল্যজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিবেশ হইতে রস টানিয়াছেন, এবং এই ঐতিহ্যের প্রভাব তাঁহার উপর অনস্বীকার্য। মধ্য জীবনে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার ফলে তিনি ঘোরতর সংশয়বাদী হইয়া উঠিলেও এই ঐতিহ্যের আকর্ষণ তিনি পরিপূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। ব্যক্তিগত জীবনে তিনিও বহু সাধু সন্ন্যাসীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এবং তাঁহাদের দ্বারা সংশয়াতীতরূপে প্রভাবিত হইয়াছেন। তাঁহার জীবনীকারগণ তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বঙ্কিম-মানসে এই ঐতিহ্য এবং সাধুসজ্জনের প্রভাব যতই প্রবল হউক না কেন, ইহা নিঃসন্দেহ যে, ধর্ম সম্পর্কে প্রথমত তাঁহার অনুরাগ মুখ্যত ছিল একজন সুপণ্ডিত বুদ্ধিজীবীর অনুরাগ। বুদ্ধির আলোকেই তিনি ধর্মের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা বিচার করিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহিয়াছিলেন। সমকালীন পরিবেশও এই অনুসন্ধিৎসার অনুকুল ছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খৃষ্টধর্ম প্রচার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির বিভিন্নমুখী ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, আর্য-সমাজ এবং শশধর তর্কচূড়ামণির সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচার, ইত্যাদি ভাবধারা এবং তাহার বিচিত্র তরঙ্গের মধ্যে মানুষের সার্থক ও সুসঙ্গত সামাজিক আচরণ সম্পর্কে মূলগত প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিরূপ আচরণ অনুসৃত হইলে ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং বিভিন্ন ধর্মমতের বিরোধ দূর হইতে পারে, তাহার গবেষণাও একান্তই প্রাসঙ্গিক। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি ও মনোভাব লইয়াই এই তরঙ্গে অংশ

(৭১) বঙ্কিমজীবনী—শচীশ চট্টোপাধ্যায়; পৃ ৪৪১

গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুধর্মকে অবলম্বন করিয়া একটা যুগোপযোগী মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ তিনি কোন্ মূলতত্ত্ব বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাতে শারীরিক বৃত্তিগুলির স্ফুরণ, অনুশীলন এবং পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানকেই সুখ, ধর্ম ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই অনুশীলনের মূলে আছে ঈশ্বরানুবর্তিতা; আবার ঈশ্বর সর্বলোকে বিরাজমান; অতএব সর্বলোকে প্রীতি ধর্মের মূলে। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সার্থক ও সুসঙ্গত জীবনাচরণ; সমগ্র পৃথিবীতে আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, সর্বলোকে এবং আত্মায় অভেদ, এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে, তবেই প্রকৃত জ্ঞান, কর্ম এবং ধর্মাচরণ সম্ভব। এই জ্ঞান হইতেই ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমষ্টিগত জীবনে শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপিত হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে একমাত্র হিন্দুধর্ম সূত্র হইতেই এই চেতনার উদ্বোধন সম্ভব, এবং হিন্দুধর্মে ব্যক্তির আচরণের যে নির্দেশ রহিয়াছে, ব্যক্তি-সমাজ, স্বজাতি-পরজাতি সমস্যা সমাধানের যে ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহার সহিত আর কোন ধর্মসূত্রের কোন তুলনা হয় না। তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করিতেছি, "কেবল হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?"(৭২) সুতরাং তাঁহার ধর্মাচরণ সার্থক জীবনাচরণের উপায়স্বরূপ, ইহা আপাতদৃষ্টিতে কোনক্রমেই পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষমূলক নয়, অথবা উগ্র স্বধর্ম প্রচারের মনোবৃত্তিজাতও নয়। বুদ্ধির চর্চায় তিনি যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাকে ঘোষণা করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে তিনি জীবনাচরণের এমন কয়েকটি সূত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন, যাহা, তাঁহার মতে, অমূল্য, এবং এই সূত্রগুলি তিনি আর কোন ধর্মমতের মধ্যে খুঁজিয়া পান নাই। সুতরাং হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার আনুগত্য তাঁহার বুদ্ধির সংকট এবং প্রয়োজন হইতেই জন্ম নেয়। বলাবাহুল্য, বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনায় তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ যে সমদর্শনকে তিনি সার্থক জীবনাচরণের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে জাতি-বৈরিতা, ধর্ম-বৈরিতা অথবা বিদ্বেষের কোন স্থান ছিল না। অপরকে বর্জন করিয়া নয়, অপরকে আলিঙ্গন করার মধ্যেই তাহার পরিপূর্ণতা।

(৭২) ধর্মতত্ত্ব; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ; পৃ ২৪

ব্যবহারিক জীবনে এই তাত্ত্বিক সত্যের প্রয়োগ কিরূপ হইয়াছে, এইবার তাহার বিচার করা যাক। 'মৃণালিনী', 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ' ইত্যাদি রোমান্স ও ঐতিহাসিক উপন্যাসে এবং 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা' ইত্যাদি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান রাজা রাজপুরুষ এবং ইতিহাসকার সম্পর্কে যে চিত্র অঙ্কিত এবং যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাকে তাঁহার সচেতন জাতি-বৈরিতার নিদর্শন স্বরূপ এবং ইহা সাম্প্রদায়িক ভেদবিচার প্রণোদিত বলিয়া বলা হইয়া থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, ইতিহাসকার মিন্‌হাজ্ উদ্দীন সম্পর্কে তাঁহার যে অভিযোগ তাহা ব্যক্তিগতভাবে মিন্‌হাজ্ উদ্দীনের উপর নয়, তাঁহার কয়েকটি উক্তি সম্পর্কে। তাঁহার ঐ সব উক্তিকে বাঙ্গালী চরিত্রের উপর কালিমা লেপনের উপকরণ স্বরূপ পরবর্তী কালে ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়াই বঙ্কিমের ক্ষোভ। ব্যক্তি মিন্‌হাজ্ উদ্দীন এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, শুধুমাত্র তাঁহার উক্তিগুলিই বঙ্কিমচন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়াছে। 'আনন্দমঠ'-এর আলোচনাকালে বর্তমান সংস্করণের সহিত পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক সত্যতার জন্য এবং প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য গোপন করিবার জন্য তাঁহার পক্ষে একটা আবরণ অপরিহার্য ছিল। আনন্দমঠের বর্তমান সংস্করণের যুদ্ধ-পরিচ্ছেদের 'যবন' শব্দগুলি এই আবরণের কাজ করিয়াছিল। এই শব্দটিকে তিনি কখনও মুসলমান সম্প্রদায়কে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করেন নাই। এবং কোন ক্ষেত্রেই তাঁহার তাত্ত্বিক সত্য ও সমদর্শনের আদর্শ তিনি বর্জন করেন নাই। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। 'রাজসিংহ'-এর উপসংহারে তিনি বলিতেছেন, "গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দুমুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না······রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল।······অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।।"

'সীতারাম'-এর বর্তমান সংস্করণে পরিত্যক্ত একটি পরিচ্ছেদ হইতে কয়েকটি

লাইন উদ্ধৃত করিতেছি, "ফকির বলিল, 'বাবা! শুনিতে পাই তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দুমুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দুমুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্ম্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে।"(৭৩) আর হিন্দুরাজ্যের সংস্থাপক সীতারাম এই চাঁদশাহ ফকিরের পরামর্শেই তাঁহার ধর্মরাজ্যের নাম রাখিয়াছিলেন "মহম্মদপুর"। সীতারামের রাজত্বের চরম ধ্বংসের সময় সীতারামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া চন্দ্রচুড় ঠাকুর এবং চাঁদশাহ ফকির রাজ্যত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যাইবার মুখে তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন হয়;

"ফকির জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরজি, কোথায় যাইতেছেন?"

চন্দ্র। কাশী।—আপনি কোথায় যাইতেছেন?

ফকির। মোক্কা।

চন্দ্র। তীর্থযাত্রায়?

ফকির। যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।"(৭৪)

এই সব দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার তাত্ত্বিক সত্যকে ব্যবহারিক দৈন্যের দ্বারা কখনও খণ্ডিত হইতে দেন নাই। তাই সত্য ও সত্যের প্রয়োগের মধ্যে কোনরূপ অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। বরং যে সব স্থানে মনে কখনও কোন সন্দেহ জাগিতে পারে, সেই সব স্থানে অত্যন্ত সতর্কভাবে তিনি তাঁহার বক্তব্য ঘোষণা করিয়াছেন এবং সন্দেহের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে বুদ্ধির জগতে স্থাপন করিয়াই ধর্মাচারণের বিচার করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধির আঘাত-সহা বিশ্বাসভিত্তি রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্যই নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি হিন্দুধর্মেরও দেশাচার ও লোকাচারের বিরুদ্ধে, এবং অযৌক্তিক শাস্ত্রীয় অহমিকা ও নিষ্প্রাণতার বিরুদ্ধে এমন আঘাত হানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুদ্ধির প্রয়োজনে অনুপ্রাণিত না হইলে এবং শুধুমাত্র মোহের অচ্ছন্নতা দ্বারা পরিচালিত হইলে তাঁহার পক্ষে হিন্দুধর্মের রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কোন কালেই সম্ভব হইত না। অবশ্য তাঁহার কোন কোন উক্তি সাময়িক

(৭৩) সীতারাম, সহিত পরিষৎ সংস্করণ, পাঠভেদ, পৃ, ১৭৮

(৭৪) ঐ; পৃ, ১৬৭

উত্তেজনা ও উপস্থিত গরজের তাগিদে একটু অতিরিক্ত রঞ্জিত। সেই সব উক্তির অন্যরকম ব্যাখ্যাও সম্ভব। কিন্তু, তাঁহার সামগ্রিক জীবনদর্শনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে জাতি-বৈরিতার অভিযোগে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা চলে না।

এই ধর্মসঙ্গত দেশপ্রীতির ভিতর দিয়া তিনি মানুষকেই দেখিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইহার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি হইবে সেই আশাই তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ, কাল ও সামাজিক সম্পর্কের উর্ধ্বে সংস্থাপিত এই ধর্মাচরণ যে মানুষকে পরিত্যাগ করিয়া শুধুমাত্র একটি বিমূর্ত তত্ত্বে পরিণত হয়, তাহার আভাসও ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও হইয়াছে তাহাই। মানুষ তাহার মানবিকতা বর্জন করিয়া শুধু মাত্র কয়েকটি তাত্ত্বিক সূত্রে পরিণত হয়। তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা ব্যর্থতা বরণ করে। বঙ্কিম-মানসের ক্রমবিবর্তনের আলোচনায় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেই ইহার ব্যবহারিক নিদর্শন পাইয়াছি। কল্পনার বর্ণে ও রঙে যে শিল্পী বাস্তবকে রূপান্তরিত করার সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন, সমাজের নব রূপায়ণের আশায় যিনি ছিলেন উদ্দীপ্ত, তিনি শেষ জীবনে বিশুদ্ধ ধর্মাচরণের প্রভাবে সেই সংগ্রাম হইতেও নিরস্ত হন, সেই আশাও তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হয়। দেশকাল-বিধৃত মানুষ দেশকালাতীত কয়েকটি তত্ত্বে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সুতরাং, এই ধর্মসম্মত জীবনাচরণের প্রত্যাশিত ফল যাহাই হউক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁহার সমকালীন সমাজ ও ঐতিহ্যের সীমা পরিপূর্ণ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। আর তাঁহার আদর্শের ব্যর্থতাও এইজন্যই।

ভাবীকালের ইশারা

জীবনের সার্থক ও পূর্ণ চিত্র আঁকিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শুধু মানুষ সৃষ্টি করার কথা কল্পনা করেন নাই, সেই মানুষের আবির্ভাব, বিকাশ এবং জীবনাচরণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির পরিকল্পনাও তাঁহার ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন পরিবেশ তাহার অনুকূল ছিল না, এবং যে ধারায় ইহা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছিল, তাহার বিরামহীন, নিয়ন্ত্রণহীন পরিণতিও সেই মানুষের আবির্ভাবের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেজন্যই তিনি প্রাচীন সংস্কৃতি এবং অতীতের মোহময় পরিবেশের প্রতি ফিরিয়া তাকাইয়াছিলেন। এই আগ্রহ ও আকূতি হইতেই তাঁহার হিন্দু সাম্রাজ্য ও হিন্দুধর্ম সংস্থাপনের প্রচেষ্টা। কিন্তু বর্তমান কালকে যেমন তিনি আত্মস্ফূর্তি এবং আত্মবিকাশের উদার পরিবেশ বলিয়া গণ্য করিতে পারেন নাই, তেমনি তাঁহার অস্পষ্ট ইতিহাস-চেতনা হইতে তিনি ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, অতীতকে পুনরায় সৃষ্টি করার পরিকল্পনাও অচল, তাহাও ব্যর্থতার পূর্ব-চেতনায় সঙ্কুচিত। অতীতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিতে রাখিয়া তাঁহার আদর্শ চরিত্রগুলির পরীক্ষা লইয়াছেন, কিন্তু তাহারা আশানুরূপ কর্মক্ষমতা, স্থির সত্যনিষ্ঠা এবং সদাজাগ্রত কল্যাণবুদ্ধির কোন পরিচয় দিতে পারে নাই। তাঁহার হিন্দুরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনার উন্মেষের প্রথম দিনেই তাই ছিল অকাল মৃত্যুর আশঙ্কা। এই ব্যর্থতার চেতনা হইতে তিনি নূতন মীমাংসা, নূতন সমাধানে উপনীত হইতে বাধ্য হন। বর্তমান এবং অতীত কোনটাকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিয়া তিনি উভয়কেই একটি একক সূত্রে সংগ্রথিত করার চেষ্টা করেন। প্রাচীন ধর্মাদর্শ এবং সমাজ-ধর্মকে তিনি আধুনিক কালের প্রলেপ দিয়া সমকালীন মানুষের ব্যবহারোপযোগী করার চেষ্টা করেন। আর এই প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই তিনি নূতন মানুষ এবং নূতন পরিবেশ জন্মলাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, তাঁহার এই সমন্বয়ে তিনি চোখের দৃষ্টিকে মনের

আচ্ছন্নতা দ্বারা খণ্ডিত করিয়াছিলেন। সমাজ-মানসের বিবর্তনের এমন এক স্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব, যখন ব্যক্তি-মন সর্বদিকে সর্বভাবে নিজেকে উপলব্ধি করার সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল; বহু বৎসরের অচল অনড় ভারতীয় সমাজ পুনর্বার চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সমাজ-মানসের সর্বাঙ্গীণ জাগরণের এই শুভলগ্নে আবির্ভূত হইয়া এবং তাহার অফুরন্ত প্রাণকেন্দ্র হইতে জীবনের রস আহরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে মানুষের সংগ্রামের মাহাত্ম্য, তাহার আত্মঘোষণার প্রেরণার মহিমা অস্বীকার করা, অথবা তাহার প্রতি অচেতন থাকা, সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার রোমান্স এবং উপন্যাসের প্রাণপ্রাচুর্যের কথা বঙ্কিম-মানসের বিবর্তনের ইতিহাসে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এই জীবনবাদ, যাহা শুধু নিজকে উপলব্ধি করাতেই ব্যস্ত, যাহা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বাইরে দৃষ্টিপাত করিতে প্রস্তুত নয়, যাহা পারমার্থিক আদর্শকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, এই জীবনবাদকে অস্বীকার করা সম্ভব না হইলেও তাহাকে পুরোপুরি স্বীকার করাও সম্ভব হইল না। তেমনি বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবাদ—বর্তমানকে অস্বীকার করা এবং তাহার দাবীর প্রতি উদাসীন থাকাই যাহার একমাত্র মূলধন,—তাহাকেও তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই। একদিকে দেহ-সর্বস্বতা এবং অপরদিকে মন-সর্বস্বতা, এই দুই বিরোধী তরঙ্গে বঙ্কিম-মানস আন্দোলিত হইয়াছিল, এবং এই দুই তরঙ্গকেই একত্র সংমিশ্রিত করিয়া তিনি জীবনাচরণের নূতন সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃত জীবনাচরণ শুধু দেহ-চর্চার মধ্যেই নয়, অথবা শুধুমাত্র অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মবাদের মধ্যেই নয়, দেহ-চর্চাকে অধ্যাত্মবাদের নিয়ম দ্বারা মার্জিত করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার সমাধান। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই তিনি সনাতন ধর্মকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। স্মরণযোগ্য, এই সমাধানের মধ্যে জীবনের স্বীকৃতিই ছিল প্রধান। আদর্শ যাহাই হউক না কেন, সত্যের রূপ যাহাই হউক না কেন, তাহাকে এই জীবনে, বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে উপলব্ধি করা চাই, তবেই তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে, তবেই তাহার মূল্য স্বীকৃত হইবে। যাহাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে উপভোগ করা সম্ভব হইবে না, তাহাও সেই পরিমাণেই মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। তাঁহার মধ্যে জীবনের স্বীকৃতি বলিষ্ঠ ছিল বলিয়া, স্বল্পকালের জন্য হইলেও, তিনি তাঁহার সমকালীন মানুষকে একটা স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মবিশ্বাস ও শক্তির জোরে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রোমান্স ও উপন্যাসগুলিতে জীবনের সুখ এবং দুঃখ উভয়কেই একত্র সংগ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার রোমান্স এবং উপন্যাসে কাব্য এবং কাহিনী মিলিত হইয়াছে। কাহিনী কালে বিস্তৃত, আর কাব্য তুলনায় কালাতীত। তিনি কালকে কালাতীতে এবং কালাতীতকে কালে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সেই সমাধানেরই নিখুঁত চিত্র আঁকিয়াছেন। এই সংমিশ্রণের ভিতর দিয়াই জীবনেই বাস্তব রূপ, এবং কল্পনার আদর্শ পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া প্রাণ পাইয়াছে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নব-উন্মেষিত মানুষকে যে পরিবেশে সংস্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাস্তবকে রূপান্তরিত করার সংগ্রামে তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবকে অতীতের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে চান নাই, বর্তমানের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে অতীতকেই নূতনভাবে সাজিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। অর্থাৎ, তিনি সেই স্বর্ণ-অতীতকে দেশকালাতীত পরম তত্ত্ব বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই চেতনা হইতেই এই পরমকে যে কোন কালে, যে কোন দেশে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসই তাঁহার ধর্ম রূপায়ণের মূলে। হিন্দুধর্ম এবং সমাজের গতি ও স্থিতি সম্পর্কে স্যার হেনরি কটন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতামত আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন,

"দ্বিজেন্দ্রবাবু বুঝাইয়াছেন যে সমাজের স্থিতি ও গতি উভয় ভিন্ন মঙ্গল নাই ; ... ...গতির বেগ অধিক হইলে স্থিতির ধ্বংস হয়, বিপ্লব উপস্থিত হয়।......

"কটন সাহেবেরও ঐ কথা। তিনিও বলেন, "Better is Order without Progress, than Progress with Disorder."

"এখন এই বিষম সমস্যার উত্তর কি ?... . দ্বিজেন্দ্রবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা ; তাঁহার ভরসা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর ।......কটন সাহেবের ভরসা হিন্দুধর্ম্মে ।......

"উভয় লেখকের মতে, আমাদের সমাজের স্থিতিবল প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে, গতিবল আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায়।......এক্ষণে ইংরেজী শিক্ষা বলবতী হইয়া স্থিতি ধ্বংস করিবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে।......এ পর্য্যন্ত দেশী ও বিদেশী লেখকে—ব্রহ্মবাদী ও পজিটিভিষ্টে একমত। প্রভেদ এই যে, দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভরসা ব্রাহ্মধর্ম্মে, কটন সাহেবের ভরসা নব্য হিন্দুধর্ম্মে। বলা বাহুল্য, 'প্রচার'-লেখকেরা এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতাবলম্বী না হইয়া কটন

সাহেবের মতাবলম্বী হইবেন। তবে একটি কথা সম্বন্ধে উভয় লেখক হইতে আমার একটু মতভেদ আছে। তাঁহারা ধর্ম্মকে কেবল স্থিতিরই ভিত্তি মনে করেন। আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ যে ধর্ম্ম তাহা সমাজের স্থিতিগতি উভয়েরই মূল। কিন্তু শিক্ষাও আমার বিবেচনায় ধর্ম্মের অন্তর্গত। আমরা যাহাকে ইংরেজী শিক্ষা বলি, তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুশীলন-পদ্ধতি। অতএব ধর্ম্মের এই আংশিক সংস্কার হইতেই সমাজের আধুনিক গতির উৎপত্তি।......ইংরাজী শিক্ষাও নব্য হিন্দুধর্ম্মের অংশ বলিয়া আমি স্বীকার করি। অতএব স্থিতি ও গতি ধর্ম্মের বলে। উভয়েরই বল যখন এক মূলোদ্ভূত বলিয়া সমাজের হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং তদনুসারে কার্য্য হইতে থাকিবে, তখন আর স্থিতি ও গতিতে বিরোধ থাকিবে না। Order ও Progress এক হইয়া দাঁড়াইবে।" [শ্রীমোহিতলাল মজুমদার কর্ত্তৃক উদ্ধৃত, শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৫১]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইংরেজী শিক্ষা যে পরিমাণে প্রাচীন সামাজিক আদর্শের মধ্যে গতি সঞ্চার করিতে পারিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই পরিমাণেই তাহার মূল্য স্বীকার করিতেছেন। ইহার উপযোগিতা এই জন্যেই যে, ইহার স্পর্শে প্রাচীন অচলায়তন পুনর্বার চলমানতা অর্জন করিয়াছে, এবং এই উপযোগিতার বিচারেই তিনি ইংরেজী শিক্ষাকে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে এবং ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ও পরিচর্যার ভিতর দিয়া যে সংস্কার বিবর্জিত নূতন মানস এবং নূতন সংস্কৃতির সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র উহার সমন্বয়ে সেই নূতন সংস্কৃতি ও মানসকে স্বীকার করেন নাই, ইউরোপীয় শিক্ষার আলোকে তিনি বিস্মৃত পুরাতনের দিকেই মোহময় দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাঁহার আদর্শ বর্তমানের নব রূপায়ণ নয়, নবরূপে অতীতেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এবং ইহাই তাঁহার নিকট ভবিষ্যৎ। অচলকে সচল করিবেন, প্রাণহীনকে প্রাণদান করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার স্বপ্ন।

কিন্তু প্রাচীন সমাজ-ধর্মের সহিত এই নয়া যুক্তিবাদের মিশ্রণে শিল্পী নিজেই নিজের চিন্তাধারার কয়েকটি গ্রন্থির মধ্যে জড়াইয়া পড়েন। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে তাঁহার মতামত উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে, বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার স্বীকার করিলেও সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন জীবিতাবস্থায় যাহারা স্বামীকে প্রকৃত ভালবাসিয়াছে, তাহারা স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করে না।

ইহা হইতে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, যে বিধবা বিবাহের অধিকার প্রয়োগ করে, সে তাহার প্রথম স্বামীকে প্রকৃত ভালবাসে নাই, অথবা ভালবাসিয়া থাকিলে তাহার দ্বিতীয়বারের বিবাহ ভোগ-লালসার অভিপ্রকাশ মাত্র। আর ভোগলালসা সমাজধর্মের বিচারে অন্যায়, পাপাচার। যেদিক হইতেই হোক, পুনর্বিবাহের অধিকার প্রয়োগ করিলে সমাজধর্মের বিচারে পাপাচারী বলিয়া নিন্দিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং, যে অধিকার প্রয়োগ করিলে উপরোক্ত কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইবে, সে অধিকার স্বীকার করা বা না করার মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্যই। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই অধিকার স্বীকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগে কুণ্ঠিত ছিলেন। সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বাদ বিসর্জন দিয়া চিত্তশুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার 'সাম্য' প্রবন্ধ হইতে একাধিক উদ্ধৃতি করিয়া উপরে দেখান হইয়াছে, তিনি জমিদারদের চিত্তশুদ্ধি দ্বারাই সমাজ সমস্যার মীমাংসা সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, তাঁহার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ পদে পদে খণ্ডিত হইয়াছিল। তাই, অনুভূতিকে আনুভূতিক সত্যের মানদণ্ডে, এবং সমাজ সমস্যাকে সামাজিক প্রবাহের নিয়মে বিচার না করিয়া আত্মশুদ্ধির বিকৃত মানদণ্ডে বিচার করিয়াছিলেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমাধানতত্ত্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ত্রুটি এই যে, বঙ্কিম-মানসে সমাজ প্রগতির প্রবহমানতার চেতনা বিশেষ গভীর ছিল না। তিনি প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের কতকগুলি সত্যকে চরম ও পরম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। বিশেষ কালে বিশেষ সামাজিক বিন্যাসে যে ইহাদের আবির্ভাব, এবং যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সেই সত্যের রূপান্তর হয়, সেই চেতনা এবং স্বীকৃতি তাঁহার রচনায় অস্পষ্ট। তাই ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে তিনি প্রাচীনকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন সামাজিক বিন্যাস এবং সামাজিক অঙ্গাবরণ (super-structure) দেশকালাতীত সত্য নয়, অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় সমাজ, জীবন এবং প্রকৃতি সম্পর্কে যে সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, জানা গিয়াছে, তাহাও চরম জানা বা পরম সত্য নয়। এই নবলব্ধ সত্যকে আশ্রয় করিয়াই নূতনতর সত্য আবিষ্কৃত হইবে, মানুষের জানার পরিধিও বিস্তৃত হইবে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে এবং যতখানি যুক্তিবাদ এবং যতখানি অধ্যাত্মবাদ লইয়া তাঁহার সমন্বয় সাধন করুন না কেন,

তাঁহার আনুপাতিক ভারসাম্য কালক্রমে বিনষ্ট হইতে বাধ্য। কেন না, তাঁহার অধ্যাত্মবাদ স্থির থাকিলেও মানুষের জানার আকাঙ্ক্ষা, যুক্তিবাদের প্রবাহ কখনও নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিবে না। তাহা নব নব সত্যে উপনীত হইবে এবং সেই সত্যের আলোকে তাঁহার সমন্বয়ের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে। তাই তাঁহার পুরাতনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পরিরকল্পনাও অচল। ঐতিহাসিক প্রবহমানতা সম্পর্কে তাঁহার চেতনা গভীর ছিল না বলিয়াই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র উহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, সমসাময়িক সমাজ-সংকট এবং জীবন-সংকট সম্পর্কে সমাজের অগ্রগামী অংশ অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই কেবল চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, এবং সাধারণভাবে সমাজের বৃহত্তর অংশ তখনও কোনরূপ চলমানতা অর্জন করে নাই। সুতরাং চাঞ্চল্যটা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর এই চাঞ্চল্যের সামাজিক কারণ কি, বিক্ষোভের মূল উৎস কোথায়, তাহা আমরা আগে আলোচনা করিয়াছি। ব্যবহারিক জীবনের ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ স্বরূপই শিক্ষিত সম্প্রদায় সেদিন আত্মপ্রতিষ্ঠার নূতন কেন্দ্রের সন্ধান করিয়াছিল। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র জীবনাচরণের যে ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন, তাহাও যে সর্বসাধারণের অনুশীলনোপযোগী নয়, সে কথা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং অচলায়তনকে সচল করার পরিকল্পনাকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মাভিমান-প্রসূত প্রতিক্রিয়া বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অবশ্য, ইহার আকৃতি-প্রকৃতি এবং উৎস-স্থল যাহাই হোক না কেন, সমাজপ্রবাহের উপর তাহার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন এই, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সমকালীন চিন্তানায়কগণ প্রাচীনের আকর্ষণ, প্রাচীনকে বর্তমানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আকর্ষণ অনুভব করিলেন কেন? রামমোহন রায়ের ব্যবহার-বুদ্ধি-প্রণোদিত বিদ্রোহ, বিদ্যাসাগরের ব্যবহারিক সংগ্রাম, এবং মাইকেল মধুসূদনের রসঘন জীবনবাদের ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সেই ঐতিহ্যকে অগ্রগামী করাই স্বাভাবিক ছিল। রবীন্দ্রনাথে ঐ ধারার স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সমকালীন চিন্তা-নায়কগণ অতীতের এই আকর্ষণে

আন্দোলিত হইয়াছিলেন। ইহাকে ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে হয়। তথাপি এই ব্যতিক্রমের কারণ আবিষ্কার করা কঠিন নয়।

প্রথমত, নবভারতের নূতন সংস্কৃতির যাঁহারা প্রবর্তন করেন, তাঁহাদের সুদৃঢ় সামাজিক ভিত্তি ছিল না। তাঁহাদের এই উৎকেন্দ্রিক অবস্থিতি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের পক্ষে সুখকর ছিল না, এবং দেশের সামগ্রিক কল্যাণ বা স্বার্থের পক্ষেও ফলপ্রসূ ছিল না। দেশীয় জনসাধারণ হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলার প্রাথমিক আনন্দোচ্ছ্বাস কাটিয়া যাওয়ার পর এই দেশীয় সমাজের মাটিতেই স্থির ও দৃঢ়ভিত্তি স্থাপনের জরুরী প্রয়োজন দেখা দিতে আরম্ভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিবাদ অনুসরণ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা এবং সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে যে সামাজিক মূল্য অর্জিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্থায়ী ফললাভ করিতে হইলে দেশীয় সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। আর মনের দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছিলেন পুরাতন স্বদেশী সমাজকে ; তাই বর্তমান কালের জটিল ক্রম-রূপান্তরশীল সমাজকে তিনি দেখেন নাই, আবিষ্কার করেন সুদূর অতীতকে। সেই অতীত হিন্দু-অতীত। কিন্তু এই হিন্দু-অতীত যে বহুবিধ সমাজ-বিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাতে এবং বহু প্রতি-বিপ্লবকে আত্মসাৎ করিয়া একটি মিশ্র সত্তায় পরিণত হইয়াছে, তাহার সূক্ষ্মবিচার তিনি করেন নাই। সেই হিন্দু-অতীতকেই তিনি বিদেশী-বর্তমান দ্বারা সচল করিতে চাহিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ব্যবহারিক জীবনের ব্যর্থতার পরিণামে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় পরাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, এবং জাতীয় মুক্তি-চেতনারও উন্মেষ হইতেছিল। তাহাদের বর্তমান অস্বীকৃত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সুতরাং পরশাসিত জাতি হিসাবে অতীতের কোন একটি গৌরবময় পৃষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া অহঙ্কারে গর্বিত হওয়া এবং আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা অপ্রত্যাশিত নয়। ইহা যেন বর্তমানের জন্য একটা ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ। যে বর্তমান তাহাদের জীবনকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারাও প্রতিদানে সেই বর্তমানকেই অস্বীকার করিতে শিখিয়াছে। এই অস্বীকার-কর্মে তাহারা ভবিষ্যতের অজানা পথে পা ফেলিতে পারে না কেন না, তাহা অনিশ্চিত ; অতীতের পরিচিত প্রান্তরেই তাহারা বিচরণ করিতে পারে, কেন না তাহা নিশ্চিত। সর্বতোভাবে এই নিশ্চিতের প্রাধান্য ঘোষণা করা এবং তাহাকে পুনঃস্থাপন করার সঙ্কল্পকে কেন্দ্র করিয়া মনের মায়াজগৎ সৃষ্ট হইতে থাকে।

তৃতীয়ত, বর্তমান কর্তৃক অস্বীকৃত হইয়া পুনরায় তাহাকেই অস্বীকার করার কর্মের ভিতর দিয়া পুরাতন চিন্তাসূত্র এবং নূতন ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। সমাজদেহে যেমন এককালের ক্রিয়াশীল, সৃষ্টিশীল প্রগতি পরবর্তীকালের প্রতি-ক্রিয়ায় পরিণত হয়, এবং তাহার অভ্যন্তরেই নূতন সৃষ্টির প্রবাহ আত্মপ্রকাশ করে, এবং সমাজ যেমন এই দুইয়ের সংঘর্ষে বিবর্তিত হয়, ব্যক্তি-মানসেও তেমনি পুরাতন স্মৃতি-শ্রুতি, বিশ্বাস এবং নূতন সত্তার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, এবং এই দুই প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতেই ব্যক্তি-মানসের বিকাশ। তাহার অন্তরেও পুরাতন বিশ্বাস ও নূতন সত্তার বিরোধ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন পরিবেশে নূতন আলোকপাওয়া ব্যক্তি-মানসের সহিত প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের বিচ্ছেদ দেখা দিয়াছিল, এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে পুরাতনের অন্তর ভেদ করিয়া নূতন মানুষের আবির্ভাব হইতেছিল। ভবিষ্যৎ সমস্ত সম্ভাবনা ও পরিমিতিহীন আশা লইয়া বর্তমানের দুয়ারে করাঘাত করিতেছিল। নূতন সত্তা ও ধ্যানধারণা ব্যক্তির মানস-সংগঠনের অবরুদ্ধ দুয়ারে আঘাত করিতেছিল। কিন্তু মন সেই আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কেন না, তাহার সহজাত প্রবৃত্তি, অভ্যাস এবং পরিচিত ঐতিহ্যের আকর্ষণই সাধারণতঃ তাহাকে গভীরভাবে জড়াইয়া ধরে, সেই আকর্ষণকেই তাহার মনে হয় অমোঘ। ফলে, বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্পর্ককে সে বর্তমান-অতীত সম্পর্ক বলিয়া ভুল করিয়া বসে। ভবিষ্যতের পদধ্বনিকে সে অতীতের পদ-স্মৃতি বলিয়া মনে করিয়া অতীতকেই সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হয়।

কিন্তু তাহার মানসের এই অতীত-চিত্র কখনও বিশুদ্ধ অথবা পূর্ণাঙ্গ অতীত হইতে পারে না; কারণ ইহা তাহার বর্তমান কালের চেতনায় রঞ্জিত। বর্তমানকে অস্বীকার করিতে যাইয়া বর্তমান হইতে সে যে রস আহরণ করিয়াছে, সেই রসের সৌষ্ঠব দিয়াই সে অতীতের চিত্র আঁকে। ফলে তাহার অতীত-সৃষ্টি প্রচেষ্টা হইতে এক অভিনব পদার্থ জন্মগ্রহণ করে, যা বর্তমান নয়, অতীত নয়,—যাহা ভবিষ্যৎ। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে ইহার স্বাক্ষর রহিয়াছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁ যুগে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির প্রতি মানুষের নজর পড়িয়াছিল একটু অতিরিক্ত মাত্রায়। কিন্তু তথাপি সেই সংস্কৃতির পর্যালোচনা হইতে প্রাচীন গ্রীস অথবা রোম পুনরুদ্ধৃত হয় নাই, নূতন পৃথিবীরই আবির্ভাব হইয়াছে। রোমান ক্যাথলিকবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যাঁহারা ইহাকে সংস্কার করিয়া আদিম খৃষ্টধর্মের পুনঃপ্রবর্তন আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা

আদিম খৃষ্টধর্মের পরিবর্তে আধুনিক প্রোটেষ্ট্যাণ্টবাদেরই জন্ম দেন। বর্তমান হইতে অতীতে আসা যাওয়ার এই কার্যক্রমের ভিতর দিয়াই ভবিষ্যৎ জন্মগ্রহণ করে।

বঙ্কিম-মানসেও ভবিষ্যতের করাঘাত অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু সমাজের অন্তরে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের আগ্রহ এবং প্রাচীন চিন্তা-সূত্রের আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে প্রবল হওয়ায় তিনি এই করাঘাতকে অতীতের কারাঘাত বলিয়াই ভুল করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অতীত-চিত্র ছিল তাঁহার বর্তমানের চেতনায় অর্থাৎ তাঁহার যুক্তিবাদের আলোকে পরিমার্জিত ও পরিশোধিত। তিনি প্রাচীন স্থিতিকেই ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের গতি দ্বারা চলমান করার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সুতরাং অতীতকে বর্তমান দ্বারা খণ্ডিত করার মধ্যে নূতনের আবির্ভাবেরই সংকেত ছিল। অতীতকে সৃষ্টি করিতে যাইয়া তিনি ভবিষ্যৎকেই সৃষ্টি করেন। কারণ, যিনি হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনায় কর্মচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনিই, আপনার অগোচরে, জাতীয়তাবাদী-ভারতের অন্যতম স্রষ্টারূপে আবির্ভূত হন। যিনি সনাতন ধর্মের সংস্কার করিয়া উহাকে কালোপযোগী করার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনি, নিজের অগোচরে, তাঁহার সমালোচনার মাধ্যমে সেই ধর্মেরই সর্ববিধ সংস্কার ও আকর্ষণ হইতে আধুনিক কালের মানুষের মুক্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং বাংলাদেশে আধুনিক যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাকে সুগম করিয়াছেন। যিনি আধুনিক গতি দ্বারা প্রাচীন স্থিতিকে সচল করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি প্রাচীন স্থিতির পরিবর্তে নূতনের আবির্ভাবেরই সহয়তা করিয়াছেন। তাঁহার কর্মের এই গতিপ্রাণতার জন্যই তাঁহার সাহিত্য তাঁহার কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল।

এই অর্থেই বঙ্কিম-প্রতিভা কালোত্তর।

পরিশিষ্ট

সমকালীন ঘটনার পরিবেশে বঙ্কিমজীবনী

১৮৪৮ সাল : ফ্রান্স, ইটালী, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে ব্যাপক বিদ্রোহ। সাধারণতন্ত্রী আদর্শবাদের প্রসার; স্বৈরাচার ও পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ; জাতীয় মনোভাবের বিকাশ ও ইউরোপে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি রচনা।

কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ কৃত 'কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো'র প্রথম প্রকাশ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদী ভাবধারার বিস্তৃতি।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ফ্রান্সে নব জাতীয় পরিষদ গঠন, ও গণমতের চাপে ফ্রান্সকে রিপাবলিক বলিয়া ঘোষণা।

১৮৪৯ সাল : রোমে ম্যাটসিনির নেতৃত্বে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা, এবং পরবর্তীকালে তৃতীয় নেপোলিয়ানের আক্রমণে ইহার ধ্বংস। ম্যাটসিনির ১৮৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইয়ং ইটালি' সংঘের প্রভাবে ইটালিতে নব জাগরণের অনুপ্রাণনা।

কলিকাতার বাইরে মফঃস্বলের বিচারালয় হইতে শ্বেত-কৃষ্ণ বিচার বৈষম্য বিদূরণের জন্য গভর্ণমেণ্ট কয়েকটি আইনের প্রস্তাব করেন। কলিকাতার ইউরোপীয় সমাজ ও সংবাদপত্র সংঘবদ্ধভাবে এই প্রস্তাবিত আইনের প্রবল বিরোধিতা করিতে থাকেন, এবং ইহার নামকরণ করেন 'ব্ল্যাক এ্যাক্ট'। খসড়া অবস্থাতেই এই আইন প্রত্যাহৃত হয়।

হুগলি কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবেশ।

১৮৫০ সাল : প্রশিয়ার ফ্রেডারিক উইলিয়ামের নেতৃত্বে আটাশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেটের একত্রীকরণ। প্রাশিয়ার রাজনীতির পটভূমিতে ধীরে ধীরে বিসমার্কের আবির্ভাব। তাঁহার সঙ্কল্প : **We all wish that the Prussian eagle should spread out its wings as guardian and ruler from Munich to the Donnersberg, but free we will have him, not bound by a new Regensburg Diet.**

Prussians we are and Prussians we will remain." গণতান্ত্রিক পথে নয়, চণ্ডনীতিতে জার্মাণীকে ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্কল্প লইয়া কর্মক্ষেত্রে বিসমার্কের অনুপ্রবেশ।

১৮৫১ সাল : কলিকাতায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা। পূর্ববর্তী-কালের সভাগুলি হইতে অর্থাৎ ১৮৩৭ সালের জমিদার সভা ও ১৮৪৩ সালের বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি হইতে এই নূতন সভার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে; এখানে প্রাচীন ও নবীন পন্থী, সনাতন ব্রাহ্মণ ও বিদ্রোহী ব্রাহ্ম সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন এবং এই সংঘের কোন ইউরোপীয় সদস্য ছিল না, অথবা নেওয়া হয় নাই।

১৮৫৩ সাল : ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের পুনর্বিবেচনার সময় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন পার্লামেণ্টে এক আবেদনপত্র পেশ করেন। এসোসিয়েশনের দাবী : বিচার-বৈষম্য, রাজস্ব আদায়ের কঠোরতা, লবণ ও আফিংএর উপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার, ইত্যাদি দূর করা, এবং ভারতে শিল্পায়ণ, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি, উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয় নিয়োগের অনুরোধ। পার্লামেণ্ট ও বড়লাটের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করা ও তখনকার চারিটি প্রদেশ হইতে তিনজন করিয়া বেসরকারী প্রতিনিধি সমেত নূতনভাবে ব্যবস্থা পরিষদ গঠনের দাবীও এসোসিয়েশন জানান।

বলা বাহুল্য, পার্লামেণ্ট এই দাবীর প্রতি বিশের কর্ণপাত করেন নাই।

'সংবাদ প্রভাকর'এর কবিতা প্রতিযোগিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের পুরস্কার লাভ।

১৮৫৪ সাল : স্যার চার্লস্ উডের 'এডুকেশন ডেস্‌প্যাচ'। শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার; দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি স্বীকার, অবশ্য নিম্নশ্রেণীগুলিতে এই নীতি অনুযায়ী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম।

যে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দুর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হওয়ার অধিকার লাভ।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, এবং ইটালি ও জার্মাণীর জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধি।

১৮৫৫ সাল : বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবা বিবাহ' প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তিকার আবির্ভাব।

১৮৫৬ সাল : হুগলি কলেজ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আগমন।

১৮৫৭ সাল : সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নহে, ইহা ভারতীয় সামন্তরাজদের আত্মকর্তৃত্ব রক্ষার শেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু তথাপি বিদ্রোহের বিস্তৃতিতে ইহা কোন কোন অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী লোক-সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। পরবর্তীকালের রাজনৈতিক সংগ্রামে ইহার প্রভাব অনস্বীকার্য।

কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর প্রকাশ।

১৮৫৮ সাল : ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবলুপ্তি ; ইংল্যাণ্ডাধিপতির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ভারত শাসনের কর্তৃত্ব গ্রহণ। রাজ-ঘোষণায় অন্যান্য প্রতিশ্রুতির সহিত ভারতীয়দের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক যোগ্য ভারতীয়কে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

সংঘবদ্ধ ভারতীয় বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ('স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?' ইত্যাদি)-এর আবির্ভাব। স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়া যশোহরে ২৩শে আগষ্ট কার্যভার গ্রহণ করেন।

যশোহরে দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' পত্রের আবির্ভাব।

১৮৫৯ সাল : জন ষ্টুয়ার্ট মিলের On Liberty পুস্তকের প্রকাশ।

যশোহর নদীয়া পাবনা জেলার আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ দরিদ্র, নিরক্ষর, নীল-চাষীর বিদ্রোহ ও ধর্মঘট। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার পত্রিকায় তেজোদৃপ্ত ভাষায় নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী ও নীল-চাষীদের পরিমিতিহীন দুর্দশার কাহিনী জনসমক্ষে প্রচার করিতে থাকেন।

চার্লস ডারউইনের Origin of Species গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ।

রাজপদে ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে বরণ করিয়া ইটালিতে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন; ইটালীয় গণ-মানসে স্বাদেশিকতার প্লাবন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনের আবির্ভাব।

১৮৬০ সাল: ইটালি একীকরণ আন্দোলনের বিস্তৃতি; গ্যারিবল্ডি ও তাঁহার সহস্র সহকর্মীর বিস্ময়কর সিসিলি অভিযান, ও অভিযানের অস্বাভাবিক দ্রুত সাফল্য।

ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ান কর্তৃক ফরাসী সিনেট ও ব্যবস্থা পরিষদকে সরকারী বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে বিতর্কের অধিকার দান এবং পার্লামেন্টের বিতর্কের রিপোর্ট প্রকাশে স্বীকৃতি। সুপ্ত গণতান্ত্রিক মনোভাবের অভিব্যক্তি লাভ।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণের' প্রকাশ, এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অভ্যুদয় (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য)।

এই বৎসর জানুয়ারীতে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর জেলার নেগুয়াঁতে বদলি হন। "যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়াঁ মহকুমাতে (এক্ষণে উহাকে কাঁথি মহকুমা বলে) ছিলেন, তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবু মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত।' (পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৭৩-৪)।

১৮৬১ সাল: রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার বিলোপসাধন।

আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত। এই যুদ্ধ ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত চলে।

হার্বার্ট স্পেন্সারের Education: Intellectual, Moral, Physical" গ্রন্থের প্রকাশ।

'নীলদর্পণ' গ্রন্থ ইংরাজীতে প্রকাশ করার অপরাধে পাদ্রী লং সাহেবের কারাদণ্ড। তাঁহার এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডও হইয়াছিল; কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় এই টাকা দান করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রকাশ।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ। সরকারী অনাচারে সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষ ও আর্তের সেবাকার্যের মাধ্যমে সমকালীন মানস একজাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল।

মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর 'সুরাপান নিবারণী সভা' ও 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'র প্রতিষ্ঠা।

বৃটিশ পার্লামেণ্টে 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্‌ট' পাশ। এই আইনে ভারতের ব্যবস্থা পরিষদ পুনর্গঠনের ব্যবস্থা হয়; স্থির হয়, পরিষদের বে-সরকারী সদস্যদের অর্ধেক হইবেন ভারতীয়।

এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮৬২ সাল : হার্বার্ট স্পেন্সারের First Principles-এর প্রকাশ।

পার্লামেণ্ট সার্বভৌম, এই দাবীতে প্রাশিয়ায় উদারনৈতিকদের সংগ্রাম এবং জনগণের মত লইয়া রাজস্ব, পররাষ্ট্রনীতি এবং সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণের দাবী। বিসমার্কের চণ্ডনীতি অনায়াসেই এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। কারণ, তাঁহার মতে, জার্মাণী ইংল্যাণ্ড নয়; সুতরাং, স্বৈরাচারের পথেই এখানে একীকরণের কার্য চলিবে।

আমেরিকার নিগ্রোদের মুক্তি সম্পর্কে আব্রাহাম লিঙ্কনের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘোষণা।

ভারতে হাইকোর্ট ও বাংলার ব্যবস্থা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসন সম্পর্কে শুধুমাত্র সুপারিশ করার অধিকার এই পরিষদের ছিল, কোনরূপ ভোটাধিকারও ছিল না।

এই সময়ে (১৮৬১-৬২) বঙ্কিমচন্দ্র মরেলগঞ্জের নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দমনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। "বাইশ তেইশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই সময়ে একজন নীলকর সাহেব, হাতীর শুঁড়ে মশাল বাঁধিয়া একখানি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তখন বেঙ্গল পুলিশের সৃষ্টি হয় নাই, ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে পুলিশ কাজ করিত। দারোগাগণ ঐ সাহেবটিকে কোনমতে ধরিতে পারিল না, কেননা, তাহার নিকট সর্বদা গুলিভরা পিস্তল থাকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন।" (পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৪৭-৮) শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বঙ্কিমজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে মারিবার জন্য

ষড়যন্ত্র চলিতেছে বলিয়া খুলনায় গুজব উঠিয়াছিল (পৃঃ ৯৩)।

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' প্রথম খণ্ডের প্রকাশ।

১৮৬৩ সাল : জন ষ্টুয়ার্ট মিলের Utilitarianism গ্রন্থের প্রকাশ।

প্যারীচরণ সরকার কর্তৃক কলিকাতায় মদ্যপান নিবারণের জন্য একটি সভা স্থাপন।

লাসালের নেতৃত্বে জার্মাণীতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির ভিত্তি স্থাপন।

১৮৬৪ সাল : কার্ল মার্ক্সের First International-এর আবির্ভব।

রাশিয়ায় শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রসার, এবং জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কর্তৃক জেলা ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠনে স্বীকৃতি দান।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বীরবাহু' কাব্যগ্রন্থের আবির্ভাব।

বঙ্কিমচন্দ্র ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর মহকুমায় বদলি হন।

১৮৬৫ সাল : আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসান।

মিলের Comte and Positivism গ্রন্থের প্রকাশ।

ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও স্পেনের মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে বেনিটো ওয়ারেজের নেতৃত্বে মেক্সিকোর প্রজাতন্ত্রীদের ক্রমবর্ধমান সাফল্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক জীবনে গোলযোগ। তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উইল করিয়া কাঁটালপাড়ার ভদ্রাসন মধ্যমপুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হন।

১৮৬৬ সাল : জার্মাণীর একীকরণের জন্য বিসমার্কের নূতন পদক্ষেপ ; অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ।

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের প্রাণনাশের চেষ্টা।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ; চল্লিশ লক্ষ অধিবাসীর গৃহে হাহাকার ও আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু। ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতির এই দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তথ্যালোচনা। বিদ্যাসাগর-প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির প্রশংসনীয় সেবাকার্য। একাত্মবোধের বিকাশ।

১৮৬৭ সাল : চৈত্র বা হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা। জাতীয় ভাবধারার উদ্বোধনে নবগোপাল মিত্রের উদ্যম। উত্তেজনার প্রাবল্যে তাঁহার নূতন নামকরণ হয়, 'নেশনাল নবগোপাল' অথবা 'নেশনাল মিত্র'।

১৮৬৮ সাল : কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুগামী ব্রাহ্মদের নগর কীর্তন :

'তোরা আয়রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হলো অবসান
নগরে উঠিল ব্রাহ্মনাম।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত-বিচার।' ইত্যাদি

যশোহরের পোলুয়া-মাগুরা হইতে শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ।

১৮৬৯ সাল : জন ষ্টুয়ার্ট মিলের Subjection of Women গ্রন্থ প্রকাশ।

১৮৭০ সাল : ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ।

আইরিশ হোম রুল লীগের প্রতিষ্ঠা, ও আইরিশ জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রসার। আয়ারল্যাণ্ডকে ইংল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও আয়ারে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা।

ইটালিতে পোপ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের সংঘর্ষ ও চরম জয় লাভ। ইটালি একীকরণের কার্যের সুসমাধান।

রাশিয়ায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

সাঁওতাল পরগণায় অরাজকতা ও ব্যাপক কৃষি-বিদ্রোহ।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুর আগমন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট'-এ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত সঙ্গীত' প্রকাশ।

১৮৭১ সাল : ফ্রান্সের পরাজয় ; প্যারিসে শ্রমজীবী জনসাধারণের বিদ্রোহ এবং "প্যারিস কমিউন" প্রতিষ্ঠা ; ব্যাপক অরাজকতা ও রক্তক্ষয়ের মধ্যে কমিউনের ধ্বংস ; ঐক্যবদ্ধ জার্মাণী আন্দোলনের চরম সাফল্য ও নূতন জার্মাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

চার্লস্ ডারউইনের Descent of Man গ্রন্থের প্রকাশ।

ওয়াহাবী নেতা আমীর খাঁর যাবজ্জীবন নির্বাসন। কলিকাতায় আবদুল্লা নামক জনৈক আততায়ীর ছোরার আঘাতে প্রধান বিচারপতি নরম্যান সাহেবের মৃত্যু ; ইউরোপীয় সমাজে চাঞ্চল্য।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহু বিবাহ' প্রথম পুস্তকের প্রকাশ।

পোলুয়া-মাগুরা হইতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা।

১৮৭২ সাল ঃ হার্বার্ট স্পেন্সারের Principles of Psychology গ্রন্থের প্রকাশ।

আন্দামানে শের আলি নামক জনৈক কয়েদীর হস্তে বড়লাট লর্ড মেয়োর প্রাণ বিসর্জন।

রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' বক্তৃতা।

কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে হিন্দুধর্ম অস্বীকার করিয়া সিবিল ম্যারেজ এ্যাক্ট পাশ। ফলে প্রতিক্রিয়া এবং রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় আদি ব্রাহ্মের "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্পর্কে বক্তৃতা দান।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বহু বিবাহ" দ্বিতীয় পুস্তকের প্রকাশ।

কলিকাতায় 'নেশনাল থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠা।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হওয়ার পর বহরমপুরেই রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয়।

১৮৭৩ সাল ঃ ভার্ণাকুলার প্রেস সম্পর্কিত বিতর্কে দেশী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মত জ্ঞাপন ; ফলে, বিভিন্ন মহলে তাঁহার কঠোর সমালোচনা ; তন্মধ্যে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' অন্যতম। 'পত্রিকা'র মন্তব্যের একটি লাইন ঃ

> Before concluding this we would make the remark regarding Bunkim Baboo which the late Mr. Anstey made of Mr. Paul when eulogising Lord Mayo. "I hope my learned colleague will meet his reward in after life as surely as he is to receive the reward here."—23 Octr. 1873

বহরমপুর অবস্থানকালেই ১৮৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল ডাফিন কর্তৃক অপ্রত্যাশিতভাবে লাঞ্ছিত হন। ঘটনার বিবরণ 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' এইরূপে লেখা হয়:

> We are grieved to learn from the *Moorshidabad Patrika* that Babu Bunkim Chunder Chatterjee, the Dy. Magt. while returning home from office on the 15th Dec. last, was assaulted by one Lt. Colonel Duffin of the Berhampore Cantonment and received several violent pushes at his hands. It appears that the Babu was passing in a palkee across a cricket ground where Mr. Duffin and some Europeans were playing. This was deemed a great *beadube* on the part of the Babu and Mr. Duffin felt himself justified in chastising him with blows. 8 Jany. 1874

বঙ্কিমচন্দ্র ডাফিনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিলেন, এবং পরে ডাফিন প্রকাশ্য আদালতে দেশীবিদেশী সহস্রাধিক দর্শকের সম্মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্র মোকদ্দমা প্রত্যাহার করেন।

এই মোকদ্দমা বহরমপুরে অত্যন্ত চাঞ্চল্য আনিয়াছিল। শচীশ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "বিচার দেখিতে নগর ভাঙ্গিয়া লোক আসিতে লাগিল। বাঙ্গালী, সাহেবের নামে নালিশ করিয়াছে; তা আবার যে সে সাহেব নয়,—একটা সেনাদলের কর্ত্তা, গোটা কর্ণেল। তখনকার দিনে এই দৃশ্য নূতন।

"এই মোকদ্দমার একটু বিশেষত্ব ছিল। বহরমপুরে সে সময় দেড়শত উকীল মোক্তার ছিলেন। এই দেড়শত উকীল মোক্তার উপযাচক হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ওকালতনামায় দস্তখত করিলেন। সেই হেতু কর্ণেল সাহেব বড় বিপদে পড়িলেন, তিনি যে উকীলের কাছে যান, সেই উকীলই বলেন, 'আমি বঙ্কিমবাবুর ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছি।' অবশেষে তিনি উকীল

ছাড়িয়া মোক্তারের দ্বারস্থ হইলেন। সেখানেও তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল।" (বঙ্কিমজীবনী ; পৃঃ ১০১-১০২)

১৮৭৪ সাল : সিবিল সার্বিস হইতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতাড়ন, এবং প্রতিকারের আশায় তাঁহার বিলাত যাত্রা ; ৪ঠা জানুয়ারী বঙ্কিমচন্দ্র ছুটি লইয়া বহরমপুর ত্যাগ করেন। বহরমপুরের জনসাধারণ বহরমপুর ত্যাগ না করার জন্য তাঁহাকে সবিশেষ অনুরোধ করে, এবং তাঁহার বিদায় উপলক্ষে একটি বিদায় ভোজের আয়োজন করে। বহু সংখ্যক দরিদ্র কাঙ্গালীকে ভোজন করান হইয়াছিল, এবং সহরের রাজপথ বঙ্কিমচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। (বঙ্কিম-জীবনী ; পৃঃ ১০৮-৯)

১৮৭৫ সাল : স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা।

ব্যর্থ হইয়া সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রত্যাগমন এবং স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ।

শিশিরকুমার ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান লীগ'-এর প্রতিষ্ঠা।

হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' প্রথম খণ্ডের প্রকাশ।

প্রিন্স অব ওয়েলস্ (সপ্তম এডওয়ার্ড)-এর ভারত আগমন।

বোম্বাই মিলমালিক এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৬ সাল : হার্বার্ট স্পেন্সারের Principles of sociology vol. 1 এর প্রকাশ।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ।

ভবানীপুরের সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের যুবরাজ সম্বর্ধনার কাহিনী ; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজিমাৎ' কবিতা রচনা ; রঙ্গমঞ্চে 'গজদানন্দ' প্রহসনের অভিনয়। অভিনয় বন্ধের জন্য বড়লাটের অর্ডিন্যান্স, এবং রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ আইন বলে রঙ্গমঞ্চের স্বাধীনতা সঙ্কোচন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক গোলযোগ ; বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ, এবং সঞ্জীবচন্দ্রের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের স্বত্ব ত্যাগ।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির 'ভারত-সভা' গঠন।

ডাঃ মহেন্দ্র সরকার কর্তৃক 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা' স্থাপন।

১৮৭৭ সাল : তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভিযান।

দিল্লীর দরবার ও রাজন্যবর্গের খেতাব লাভ। দক্ষিণ ভারত, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ। পঞ্চাশ লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু। সিবিল সার্বিস পরীক্ষার বয়স একুশ হইতে উনিশে কমান হয়। প্রতিবাদে ভারত-সভার উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা ও পার্লামেণ্টে স্মারকলিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত। সমগ্র ভারতে জনমত সংগ্রহের জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত ভ্রমণ। এই আন্দোলনের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর সহানুভূতি ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার A Nation in the Making গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়া ত্যাগ ও সপরিবারে চুঁচুড়ায় আগমন। বঙ্কিম-ভবনে সাহিত্য বৈঠক। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি যাতায়াত করিতেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এই সময়ে তাঁহার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রামগতি ন্যায়রত্ন, অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি ভূদেবের বাসভবনে সমবেত হইতেন এবং সাহিত্য আলোচনা করিতেন।

১৮৭৮ সাল : ভারত সরকারের আফগান অভিযান। দুর্ভিক্ষের জন্য সংগৃহীত অর্থ যুদ্ধ তহবিলে পরিণত করা হয়। ভারতীয় সংবাদপত্রে সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা, বাংলায় শিক্ষিত সমাজে সরকার-বিরোধী আন্দোলন। 'সোমপ্রকাশ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'সাধারণী' প্রভৃতি পত্রে গবর্ণমেণ্টের কার্যকলাপের কঠোর আলোচনা।

ভার্ণাকুলার প্রেস আইন পাশ এবং দেশী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ।

১৮৭৯ সাল : হার্বার্ট স্পেন্সারের Principles of Sociology Vol. II, এবং Data of Ethics গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশ।

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করার জন্য রুশ নিহিলিষ্টদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।

ভারতে ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে 'আর্মস্ এ্যাক্ট' পাশ।

১৮৮১ সাল : স্বতন্ত্র আয়ারল্যাণ্ড আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ও বিভিন্ন সংঘের উপর সরকারী উৎপীড়ন।

নিহিলিষ্ট আততায়ীর হস্তে জার আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু।

লর্ড রিপণ কর্তৃক প্রেস আইন প্রত্যাহার।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারত-সভা কর্তৃক স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার দাবী ও আন্দোলন।

ভারতীয় চা-কর এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার মৃত্যু। "১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী হইতে হাবড়ায় আসিলেন। আসিবার পরেই সি, ই, বক্‌লণ্ডের সহিত বঙ্কিম-চন্দ্রের ঘোরতর বিবাদ বাধিল। তখন সাহেব, হাবড়ার কালেক্টর। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কেন না, বঙ্কিমচন্দ্র পুলিশ-চালানী মোকর্দ্দমাগুলি প্রায় ছাড়িয়া দিতেন,—পুলিশের কোনও আব্দার রক্ষা করিতেন না। সুতরাং পুলিশের কর্তা ম্যাজিষ্ট্রেট, বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না।" (বঙ্কিম-জীবনী ; পৃঃ ১১৭) দাহ্য পদার্থ দ্বারা গৃহ আচ্ছাদন করা যাইবে না, মিউনিসিপ্যালিটির এই নোটিশ সংক্রান্ত একটি মামলাকে কেন্দ্র করিয়া এই বিরোধ পাকাইয়া ওঠে এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই বিরোধের মীমাংসাও হয়। পরবর্তীকালে বাকল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার Bengal under the Leiughtenant Governors গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দপ্তরে অস্থায়ী এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন, কিন্তু অল্পকাল পরেই এই পদ লুপ্ত করা হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে তৎকালীন 'ষ্টেট্‌সম্যান' পত্রে লেখা হয়,

> "Babu Pankim Chandra Chatterjee is a man of high character and attainment......We agree... in regretting that it has been deemed expedient to take away this important appointment from a native, and we confess our inability to understand the reasons that justify the step."

হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যয়ন ও আলোচনা। তাঁহার বউবাজারের বাসভবনে যথারীতি সাহিত্য আড্ডা বসিত। চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাকুমার কবিরত্ন, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মিতভাবে আড্ডায় যোগদান করিতেন।

পজিটিভিজম সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার আলোচনা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথও মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আলোচনা করিতেন।

১৮৮২ সাল : নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

'ইলবার্ট বিল'কে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপীয় সমাজের আন্দোলন। লর্ড রিপণকে বিলাতে ফেরৎ পাঠনোর জন্য ইউরোপীয়দের চক্রান্ত। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গাত্মক কবিতা :

"গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান
ডাক ছাড়ে ব্রানশন কেশুয়িক, মিলার—
"নেটিভের কাছে খাড়া, "নেভার—নেভার!"
"নেভার" সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিভে পাবে সন্ধান আমাদের জানানা?
বিবিজান! দেহে প্রাণ, কখনো তা হবে না।" ইত্যাদি।

বাৎসরিক পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের কলহ।

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে হেষ্টি সাহেবের সহিত তাঁহার বিতর্ক।

১৮৮৩ সাল : আদালত অবমাননার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই মাস কারাদণ্ড ; ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘট।

কলিকাতায় ভারত-সভার নেশানাল কনফারেন্স ; প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা পরিষদ গঠন, জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন, অস্ত্র আইন রহিত করণ, উচ্চ রাজ-পদে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগের দাবী জানাইয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়বার হাবড়ায় বদলি হন। কার্যভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট সাহেবের সঙ্গে তাঁহার কলহ বাঁধে। এই কলহ এমন ঘোরতর আকার ধারণ করে যে, অল্পকাল পরে ওয়েষ্টমেকট সাহেব বদলি না হইলে সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রকে পদত্যাগ করিতে হইত।

১৮৮৪ সাল : হার্বার্ট স্পেন্সারের Man Versus the State গ্রন্থ প্রকাশ।

'প্রচার' এবং 'নবজীবন' পত্রের আবির্ভাব ; তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিতর্ক।

১৮৮৫ সাল : নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ।

হেনরি কটনের New India গ্রন্থের প্রকাশ।

শশধর তর্কচূড়ামণির কলিকাতা আগমন; বঙ্কিমচন্দ্রের মাধ্যমে কলিকাতার সুধী সমাজের সহিত তর্কচূড়ামণির পরিচয়, এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁহার বক্তৃতা।

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য হন।

১৮৮৬ সাল : কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কি আনন্দ আজি ভারত-ভুবনে—ভারত জননী জাগিল!" ইত্যাদি গানটি সম্মেলন উপলক্ষে রচিত হয়।

১৮৮৭ সাল : শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের তীর্থপর্যটন।

১৮৯১ সাল : চকুরি হইতে অবসর; 'সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন' (বর্তমান ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট) প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য শাখার স্থায়ী সভাপতি পদে নির্বাচন।

১৮৯২ সাল : রায়বাহাদুর খেতাব।

১৮৯৪ সাল : মৃত্যুর (৮ই এপ্রিল) পূর্বে জানুয়ারীতে সি, আই, ই, খেতাব।